সময় অসময়

মণীন্দ্র ঘটক

১বি, রাজা লেন
কলিকাতা-৯

স্বত্ব : চন্দন ঘটক

প্রথম প্রকাশ :
২৩ জানুয়ারী, ১৯৫৯

প্রকাশক :
কে. মিত্র
গ্রন্থমিত্র
১বি, রাজা লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
আর. রায়
সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী :
দেবদত্ত নন্দী

আমার দুই দিদি

পারুল ঘোষাল

ও

রেণুকণা চক্রবর্তীকে

নিবেদন

সময় অসময়

এক

…বঙ্গোপসাগরে এক প্রবল ঘূর্ণিঝড় ওঠায় আগামী ছত্রিশ ঘণ্টা পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যার উপকূলবর্তী অঞ্চলের আবহাওয়া অস্বাভাবিক থাকবে। আবহাওয়া অফিসের এক জরুরী বার্তায় বলা হয়েছে, ঘণ্টায় একশো কিলোমিটার বেগে এক ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় এগিয়ে আসছে। চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর এবং উড়িষ্যার উপকূলবর্তী কয়েকটি এলাকায় বজ্র-বিদ্যুৎ-বৃষ্টি সহ প্রবল ঝড়ের সম্ভাবনা।

সুতরাং কালকের প্রোগ্রাম কি বাতিল করতে হবে? ভাবনায় পেয়ে বসে বিকাশকে। রেডিও শোনে না বিকাশ। বাবা শোনে, খবর আর ভক্তি-মূলক গান। বাবাই শুনছিল খবর। বিকাশ বেরুনোর জন্যে তৈরি হচ্ছিল। আকাশ অবশ্য গত রাত থেকেই কেমন মেঘলা হয়ে আছে। শেষরাতে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি শুরু হয়েছে, আর থামে নি, এখনও চলছে। তবে, তা আর কতক্ষণ? বেলা হলে মেঘ কেটে যাবে ভেবেছিল।

রেডিওর খবর আচমকা কানে আসায় থমকে যায় বিকাশ। কনকনে শীত লাগছে। অঘ্রানের শেষ তো! তার ওপর এমন আবহাওয়া। আবার তারও ওপরে এই ভয়াবহ সংবাদের চাপান। ফুলহাতার গরম সুয়েটার পরতে পরতে বাবার দিকে তাকায় একবার বিকাশ। বুড়ো হয়ে গেছে বাবা। একমনে খবর শুনছে। এই ফাঁকে বেরিয়ে পড়া ভাল। নয়তো খবর শেষ হলেই রেডিয়োর চাবি বন্ধ করে মুখের চাবি খুলবে। সামনে যাকে পাবে তাকে ফের রিলে করতে থাকবে, বঙ্গোপসাগরে এক ভয়ংকর ঝড় উঠেছে। ঝড় এগিয়ে আসছে…। তারপর যেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সেই আকুতি, ওগো, যাস নে, তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।

ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বিকাশ। কিন্তু আকাশের যা অবস্থা! যাবে কোথায় এখন? সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কয়েকবার ভাবলে। পর পর কয়েকজনের মুখ মনে এল। কাজল, প্রণব, নিহাল, কল্যাণ—নুনাঃ! এই এক গোয়ালের গরুদের সঙ্গে আর ভাল লাগে না। নিচে নেমে এসেও মন স্থির করতে পারলে না বিকাশ। কিন্তু আব-হাওয়ার হালটা বুঝলে হাড়ে হাড়ে। ঝিরঝিরে টানা বৃষ্টি, তার সঙ্গে একটু হাওয়ার মিশেল খেয়ে যে শীত পৌষের শেষে পড়ার কথা, সে

শীত যেন এখনই এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ঘরের মধ্যেই ঘাপটি মেরে বসে থেকেছে সে। খবরকাগজ থেকে সিনেমা-পত্রিকার পাতা পর্যন্ত—খেয়াল-খুশি মাফিক উলটে-পালটে আর কত সময় পার করা যায়। এমন দিনে কেউ আসে না যে, তার সঙ্গে গল্প করা যাবে। বাকি থাকে বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি। সেখানেও ঘরে ঘরে দুয়ার বন্ধ। নিচের তলা থেকে চারতলা অবধি,—না, কোনো দরজাতে তার কোনও আকর্ষণ নেই। এখানে সকলে যেন কী রকম। যার-যার তার-তার। আলগা হাসি, আলগা আন্তরিকতা। কি, কেমন আছেন গোছের প্রশ্নটা কোনমতে উচ্চারণ করতে পারলেই খুশি। যাকে বলা হচ্ছে, সত্যি সে কি রকম আছে বা জিজ্ঞাসাটা সে শুনতে পেল কিনা, অথবা কি জবাব দিলে, কি বললে সেটা জানতে বা শুনতে কেউ অপেক্ষা করে নেই। যে যেমন আছে তাই নিয়ে নিজের সীমায় নিজে নিজে তুষ্ট।

উঠে গিয়ে একটা ছাতা নিয়ে আসবে? ভাবতে হয়। না, থাক্। কোথায় শেষে হারিয়ে ফেলবে। বাবা খিচ্‌খিচ্ করবে। দাদা হয়তো শুনিয়ে দেবে, কুড়ি টাকা গচ্চা! বিকাশের অবশ্য গায়ে লাগার কথা উভয়ত—হারানোর লজ্জা, গচ্চার টাকা, দুটোই তাকে বিঁধবে। বাবাও বুঝবে না, দাদাও বুঝবে না।

বৃষ্টির ভেতরই ছুট লাগায় বিকাশ। সামনে কেয়ার-টেকারের অফিস। তার বারান্দায় কে যেন বসে আছে চাদর গায়ে। ছুটে এসে সেখানেই দাঁড়ায়।

আরে নিহাল! তুই?—অবাক লাগে বিকাশের।

চাদরে ঢেকেঢুকে গুঁড়ি মেরে বসে আছে নিহাল সিং। বলে, হুঁ! যাবি কোথাও?

কোথায় আর যাই! বেরুলাম—

চল্, থি্র এ-তে লাস্ট স্টপ, তারপর আবার ফিরে—

ধুর!

কেন?

কি হবে? তা' বাসও তো চলছে না ঠিক মত, শুনেছি। সকাল থেকেই এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা পর নাকি আসছে যাচ্ছে।

কে জানে!

তুই কি করছিলি বসে বসে?

কি করব? রূপ দেখছি। ঐ দ্যাখ, দুইয়ের-সাতের জানালাটা খোলা।

শালা, তোমার হয়ে গেছে।

তারপর ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে দুজনে। ফিস্ ফিস্ করে বলে

বিকাশ, কি হয়েছে রে ওদের ?
কিছু না, সব ফেকলু।
তাই বল! তা তুই কি দেখছিলি ?
কিছু না। দেখব আবার কি। দেখে দেখে চোখ পচে গেছে। এখন আর তাকাতে ইচ্ছে হয় ? জানালাটা খুলে রেখেছে কিনা। কি আর করি, ওদিকেই চোখ ফেলে বসে আছি। এখানে বসে আর তাকাবো কোন দিকে ?
থাক তুই বসে, আমি চলি!
যা!
বিকাশ আবার এক ছুট লাগায়। এবার লম্বা ছুট। সি. আই. টি. বিল্ডিংয়ের ফাঁকা চত্বর পেরিয়ে ফাঁকা মাঠ, তারপর ভি. আই. পি. রোড পার হয়ে থি-এ বাস গুমটি, তারও পরে হারুর টি স্টল। ছুটে আসতে আসতে প্রায় ভিজেই গেল বিকাশ। হারুর স্টলে ঢুকে পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ-হাত-চুল মুছে, বুকপকেট থেকে চিরুনি বার করে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ভেতরটা একবার দেখে নিলে। জনা পাঁচেক বসে আছে বেঞ্চিতে। যেন বিক্ষিপ্তভাবে ওৎ পেতে আছে লোকগুলো। দেখলে হাসি পায়। কিন্তু চেনামুখ একটাও নয়। তাই হাসিটা মনে মনে হেসে একটা বেঞ্চিতে কেনার ঘেঁষে বসে পড়ে বিকাশ।
আগামী কাল তাদের সল্ট লেকের প্রোগ্রামটার কথা ফের মনে আসে। আকাশের যা অবস্থা, রোদ উঠবে কাল ? কালও যদি এরকম থাকে সব তা' হলে তার এত দিনের প্ল্যানটাই বরবাদ। ভাবতে বড় খারাপ লাগে। যাক গে! স্টলের ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে, হারু কই রে ?
ছেলেটা গুটিশুটি হয়ে বসে ছিল উনানের ধারে। বললে, কোথা গেল। আসবে এখনই।
খদ্দের নেই। তাই হয়তো ছেলেটা নির্বিকার। গায়ে একটা দোভাঁজ ময়লা কাপড়। পরনে হাফপ্যান্ট। খালি পা। বয়স হবে বছর দশ-বারো। মুখের দিকে তাকালে কষ্ট হয়। বিকাশ ডাকলে, শোন!
কাছে এল ছেলেটা। বিকাশ বললে, খুব ভাল করে একটা চা কর দেখি, কড়া করে।
আর কিছু দেব না ?
নাঃ!
অন্য যারা বসে আছে, বোধ হয় খদ্দের নয়। বৃষ্টির দিন। না-ঘরে, না-বাইরে—কোথাও হয়তো তাদের নির্দিষ্ট ঠাঁই নেই। ভাবলে বিকাশ। এদেরও হয়তো তারই মতো অবস্থা। জনা পাঁচেক লোক। কিন্তু সবাই

মধ্যবয়সী। কি রকম আবছা অন্ধকার সারাদিন ধরে। লোকগুলোকে দেখায় ভূতের মত। টেবিলের ওপরে একখানা খবরকাগজ। উল্টাপাল্টা পাতা ভাঁজ করা পড়ে আছে। বিকাশ টেনে নেয় কাছে। পড়া যায় না। এদিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে দোকানের ছেলেটাকে, লাইট অফ নাকি রে ?
বসা পাঁচজনের একজন গোঁজা মাথা উচু করে বলে, যায় নি এখনও। যাবে—
আবার মাথা গুঁজল লোকটা। আজ শনিবার। সকাল-সন্ধ্যা কয়েক ঘণ্টা করে লোডশেডিং চলার কথা। সকালে তত খেয়াল করে নি বিকাশ কারেণ্ট ছিল কিনা। জিজ্ঞেস করলে, সকালে অফ ছিল কারেণ্ট ?
না, আজ এখন পর্যন্ত অফ হয় নি।—মাথা গোঁজা অবস্থায় বলে সেই লোক। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যায় দোকানের ঝাঁপের তলায়। একটু ক্ষণ দাঁড়িয়ে আকাশ বা রাস্তা দেখে নিয়ে মাথা নিচু করে বৃষ্টির মধ্যে হাঁটা ধরে দ্রুত।
সেই দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিল যেন বিকাশ। ছেলেটা চায়ের গ্লাসটা ঠক্ করে টেবিলের ওপর রাখায় খেই হারিয়ে ফেলল।
ছেলেটা বলে, লাইট জ্বালব ?
কি হবে আর ! থাক।
কাগজ পড়বেন।
না।
ছেলেটা আর কিছু না বলে চলে যায় উনানের ধারে। উনানের আঁচেও যেন সারা দিনের ঝিমুনি ধরেছে। গনগনে নয়। ঐ দিকে তাকিয়ে বিকাশ চায়ে চুমুক দিলে।
চা-টা ভাল করেছে। মনে মনে ছেলেটার তারিফ করে বিকাশ। ভাল করার অবশ্য আরেকটা কারণও হয়তো আছে। স্টলের খোদ মালিক হারুর সঙ্গে বিকাশের হৃদ্যতা। রোজ দু'চার বার এখানে সে আসে, বসে, আড্ডা মারে। অন্তত সন্ধ্যার সময় তো আসবেই। ছেলেটা তাই ভালোই চেনে তাকে। তা ছাড়া. তাদের এটা একটা কমন সেণ্টারও বলা যায়। বিকাশ সে কথাই ভাবছিল। এমন দিনে, অসময় হলেও কারো না কারো দেখা পাবে এখানে ভেবেছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ এল না। হারুটা পর্যন্ত দোকান ফেলে কোথায় উধাও।
হাতের ঘড়িটা দেখল। সাড়ে তিন। আরো আধ ঘণ্টা দেখা যেতে পারে। তারপর ভাবা যাবে কোথায় যাবে, কি করবে।
আরো দু'জন উঠে দাঁড়াল। বসে থাকা বাকি দু'জনের একজন

ছেলেটাকে ডেকে বললে, দুটো চা দেবে।

ছেলেটার যেন এতক্ষণে সাড় এল শরীরে। এতক্ষণ কি রকম আড়ষ্ট আড়ষ্ট মনে হচ্ছিল। এবার সে যেন কিছুটা চঞ্চল, কিছুটা উদ্যোগী হয়ে উঠল।

চা খেতে খেতে দেখছিল বিকাশ। দাঁড়ানো লোক দু'জন পকেট থেকে পয়সা বার করে ছেলেটার হাতে দিয়ে বেরিয়ে গেল। বোঝা গেল, এরা দু'জন চা খেয়ে বসে ছিল। আগের লোকটা তবে ফালতু!

হৈ হৈ করে একদল ছোকরা এসে ঢুকল স্টলে। বিকাশ এদের প্রায় সকলকেই চেনে মুখচেনা। সবাই তার পরবর্তী দলের। হায়ার সেকেণ্ডারি ফেল মারা, বা সবে কলেজে এ্যাডমিশন নেওয়া ছেলের দল। বিকাশকে বসা দেখে একটু থমকে গেল দলটা। বুঝল বিকাশ, সে বসে থাকলে ওদের অসুবিধা হবে। দাঁড়িয়ে প্যাণ্টের পকেট থেকে পয়সা বার করে ছেলেটার হাতে দাম মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসে। পাশের স্টেশনারী দোকানের ঝাঁপের তলায় এসে দাঁড়ায়।

ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা চলছেই। এখন দিনটা পুরোপুরি তৈরি যেন অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার জন্যে। মনে হতেই বিকাশের কি রকম লাগে। কবিতার মত। একেই তো কবিতা বলে। কবিতা লেখে বিকাশ। বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে তারিফ পায়। স্কুলে থাকতে বাংলার টিচার হেরম্ববাবু উৎসাহ দিতেন। কিন্তু আজকাল যেন কি হয়েছে। কবিতা কেন লিখব—এমনি একটা চিন্তা তাকে ভয়ানক অকেজো করে দেয়। তখন মনে হয় এসবের কোন মানে নেই, পাগলামি।

ভি. আই. পি. রোডের দিক থেকে হন্ হন্ করে আসছে হারু। ওর সেই চিরাচরিত পোশাক—পাজামার ওপর ফুল সার্ট। ফুল সার্টের তলায় নিশ্চয় গরম সুয়েটার বা গেঞ্জি আছে একটা। নইলে এই শীতে—

বিকাশকে দেখে হেসে হাঁকলে হারু, কি রে?

হারু কাছে আসতেই বলে বিকাশ, দোকানটা বেওয়ারিশ ফেলে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস? পাক্কা দেড়ঘণ্টা ধরে দেখলুম তুই বেপাত্তা।

দোকানেরই ধান্দায় বাবা। হাসতে হাসতে বলে হারু, চিনির দাম জানিস তো? কিছু সস্তার রেটের খবর পেয়ে—চল, বসে বলব।—বলে, বিকাশের হাত ধরে টানে হারু।

অনেকক্ষণ বসেছি। আর না।—হাতটা ছাড়িয়ে বলে বিকাশ, ওদের কারো দেখা নেই, কি ব্যাপার বলতো!

আমার মত সব চিনির ধান্দায় বেরিয়েছে হয়তো।—বলে খুব একচোট হেসে ওঠে হারু।

বিকাশও হাসে। বলে, ঠিক বলেছিস।
তুমি হাঁদারাম, তোমার চিনি-গুড় কিছুই জুটছে না।—বলে আরেক দমক হেসে দোকানে ঢুকে যায় হারু।
এতক্ষণে খুব একা একা লাগে নিজেকে। সঙ্গীদের প্রত্যেকের মুখ এক এক করে গুণতে থাকে মনে মনে। না, মুখগুলো যেন কী রকম বেঢপ হয়ে যাচ্ছে, কিছুতেই ঠিক ঠিক আদলে আসছে না। কেবল নাম—নামগুলোই যা মনে আছে। আর সব গুলিয়ে যাচ্ছে। বিশ্রী লাগে বিকাশের। হারুর স্টলে খুব হৈ-হুল্লোড়ের সাড়া। ছেলেগুলো খুব মেতেছে। এক সময় সেও কম মাতামাতি করে নি বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে। এখন আর ভাল লাগে না। এখন দলটা আছে ঠিকই, কিন্তু ধীরে ধীরে দলীয় সুরটা কেটে গেছে অনেক।
হারুটা কথা বলতে জানে। ঐ জন্যেই ভাল লাগে। বেশ আছে হারু। স্টলটা নিয়ে বেঁচে আছে। ভাগ্যিস ওর বাবা বুদ্ধি করে এখানটায় চালাটা তুলেছিল। হারু তখন বাউণ্ডুলে।
হারুর কথা মনে মনে আওড়াচ্ছিল বিকাশ। তখনই দেখল সুমি যাচ্ছে। সুমিতা। যথারীতি গীটার বাঁ বগলে। বৃষ্টির জন্যে হয়তো, কোনদিকে না তাকিয়ে একমনে হেঁটে যাচ্ছে। লাল নক্সা কাটা ছাতা মাথায়। সুমিতা দেখতে ভাল নয়। কালো। রোগা, লম্বাটে। কিন্তু এখন মন্দ লাগছে না যেন।
বিকাশ ডাক দিলে, সুমি! এই সুমি!
বিকাশ যেন তার সমবয়সী কোন ইয়ার-বন্ধুকে ডাকছে, এমন ডাক তার গলা থেকে বেশ জোরেই বেরিয়ে এল। সুমিতা বৃষ্টিতে জড়োসড়ো হয়ে চলছিল, তেমন তাকাচ্ছিল না কোন দিকে। বিকাশের বেমক্কা ডাকটা কানে আসতেই ছাতাটা একটু উচু করে তাকাল। তারপর লজ্জার সঙ্গে এক ঝলক হাসি এসে তাকে হঠাৎ থমকে দিলে।
বৃষ্টিতে ভিজেও এক টক্কনে এগিয়ে এল বিকাশ। সামনে এসে সুমিতার হাত থেকে ছাতাটা টেনে নিয়ে বললে, চল্, আমিও ওদিকেই যাবো।
এই ব্যাপার! সুমিতা হাসলে মনে মনে। তবু একটা কিছু বলতে না পারলে অস্বস্তি। বললে, কোথায় যাচ্ছিস?
কোথায় যে যাবো—! কথাটা বলতে বলতে ভাবনায় পড়ে বিকাশ! আটকে যায়।
হাসি পায় সুমিতার। ফিক্ করে একটু হেসে বলে, তুই বড় বাউণ্ডুলে হয়ে গেছিস।
মেয়েরা নাকি সেরকম পছন্দ করে!

সঙ্ দেখতে কার না পছন্দ !
কেন ? সঙ্-এর কি দেখলি তুই। আমি লম্বা জুলফি রাখি নি, চুল বাবড়ি করি নি, পোশাক তো যখন যেমন জোটে। তবু আমাকে সঙ্-এর মত দেখতে লাগে বলছিস ?
হাবভাবগুলো।
কেন ?
কেন আবার ? তুই যেভাবে আমাকে ডাকলি, যেভাবে আমার ছাতার তলায় চলে এসে এখন আমার গা ঘেঁষে হাঁটছিস, তুই ভেবেছিস, লোকে তা দেখে কিছু মনে করবে না ! তোর সঙ্গী-সাথীদেরই কেউ দেখলে দেখবি কি রকম করে !
তোর নিজের কিছু মনে হচ্ছে ?
আমার কি মনে হবে ! তোকে আমি চিনি না ?
তবে আর অতো ভাবনা কিসের তোর ?
আমি ভাবছি না, তুই ভেবে দ্যাখ।
ধুর ! যত্তো ঝঞ্ঝাট। কে কি ভাবলে, তা নিয়ে এখন জ্যাম হয়ে থাকি আর কি। দিব্বি আছিস তো, আজেবাজে কথা ভাবার মন আছে তোর !
বৃষ্টিটা একটু তেড়ে এল। সুমিতা তা লক্ষ্য করে মুখে নিঃশব্দ হাসি টেনে বলে, আর কত দূর যাবি তুই ?
কথা বলতে বলতে বিকাশের তত খেয়াল ছিল না। সুমিতার কথায় বৃষ্টির তোড়টা লক্ষ্য করে মুহূর্তেক ভেবে নিলে, এদিকে কোথায় যাবে। তারপর বললে, তোর তো এসে গেছে। যা—
তুই ?
দেখি, রবীনের খোঁজে যেতে হবে।
ভিজে ভিজে ?
তোর আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখবি আমার মাথাটা ?
ইস্ ! বয়ে গেছে। যা—
বিকাশের হাত থেকে ছাতাটা তুলে নিয়ে মানিকতলা কো-অপারেটিভের বাড়ির চৌহদ্দির ভেতরে ঢুকে গেল সুমিতা। বিকাশ ছুট লাগালো সামনের দিকে। নইলে ভিজতে হবে পুরোপুরি।

দুই

ঘোষ বাগানের এই বাড়িটা নতুন। ছোট ছিমছাম। খুঁতখুঁত লাগে চার ধারের পরিবেশ নিয়ে। কপাট বন্ধ করলেও রক্ষে নেই। একটু বৃষ্টি

হলেই জল জমে, দুর্গন্ধ ছড়ায়। রোদ উঠে সব শুষে না নেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাওয়া যায় না। দরজা-জানালা এঁটে দিন আর কাটতে চায় না সুধার।

দুপুরে জোর ঘুম লাগিয়ে যখন উঠেছে তখন সাড়ে চার। সুধা অবাক হল। না রবীন না তার বাবা, বাড়ি ফেরে নি এখনও। রবীন ফিরলে অবশ্য ঘুম আর হত না সুধার। কিন্তু শ্বশুর পুলিনবাবু এসে ছেলের বৌকে ঘুমুতে দেখলে টু শব্দটিও করত না। শাশুড়ি হয়তো এক সময় এসে মৃদুস্বরে ডাকতো, বৌমা, ওঠো! বিকেল হয়ে গেছে। তা শাশুড়িরও যখন কোন সাড়া পাওয়া যায় নি, সুধার বুঝতে অসুবিধে নেই যে, অফিস থেকে কেউ ফেরে নি এখনও।

সামনের জানালাটা খুলে বাইরের অবস্থা একবার পরখ করে মন খারাপ হয়ে যায় সুধার। সারা সপ্তাহে শনিবার সন্ধ্যা আর রবিবারের মুখ চেয়ে বসে থাকে। কিন্তু এ সপ্তাহে সে প্রতীক্ষা নিষ্ফল। যা শুরু হয়েছে। অদিনে এমন বৃষ্টি সুধা দেখে নি তার জীবনে।

অবশ্য সুধার জীবন আর ক'দিনের। সবে উনিশে পা দিয়েছে। দেখতে বুঝতে কত বাকি এখনও! ঘোষ বাগান বলে এমন একটা অনাসৃষ্টির জায়গা যে আছে কলকাতায়, তাই তো জানতো না সে। অথচ জন্মাবধি কলকাতায় সে।

কথা ছিল, রবীন অফিস থেকে ফিরে এসে কোথাও যাবে আজ, কিছু দূরে, যতদূর সম্ভব। রাত করে ফিরবে। সুধা ক'দিন থেকে সেকথা ভেবে ভেবে তন্ময় হয়ে আছে।

আসল কথা হল, এখানে সে সহজ হয়ে উঠতে পারে নি। কি রকম বাঁধ-বাঁধ লাগে। যেন অদৃশ্য একটা দড়ি সব সময় তাকে বেঁধে ফেলার ভয় দেখাচ্ছে। অথচ সত্যি সত্যি তেমন সংসার নয় এটা, তেমন মানুষ নেই কেউ এ বাড়িতে, বলবে যে, সুধা, তুমি এই করো না, ওদিকে তাকিয়ো না, ওদিক মাড়িও না, এভাবে চলো, ওভাবে করো। বরঞ্চ বিয়ের আগের দিনগুলোই ছিল সে রকম। বাবা, মা, দাদা, বৌদি মায় আশপাশের দশ জনার চোখ যেন সদা-অনিদ্র থাকতো তার দিকে। তা সত্ত্বেও ওখানকার বাতাস এমন ভারি মনে হত না।

এসব ভাবতে ভাল লাগে না। বড় বিশ্রী ধরনের কষ্ট তার চোখে ফুটে ওঠে। তখন দু'চোখ ফেটে জল আসে। রবীন একদিন দেখে ভয়ানক ভড়কে গিয়েছিল। শ্বশুর-শাশুড়ি দেখতে পেয়ে তাকে কত কি বলে সহজ করতে চেষ্টা করেছে। সুধা আড়াল থেকে তাদের কথা-বার্তা শুনেছে। শুনে হাসি পেয়েছে, মায়াও লেগেছে এই বুড়োবুড়ির জন্যে।

তারা বলে, সুধা ছেলেমানুষ। তারা বলাবলি করে, মা-বাবা-ভাই-বোনের টান। তারা নিজেদের স্মৃতি ঘেঁটে সব পরখ করে। কুঁড়িটি ছিঁড়ে এনে ভালবাসার বেদনা অনুভব করে। বলে, হবেই তো! কি আর অভিজ্ঞতা, কত আর বয়স। ছেলেমানুষ।

তবে হ্যাঁ। বিয়েটা সাত তাড়াতাড়ি হয়ে যাবার কারণ যে তার ছেলেমানুষী তা বুঝেছে সুধা। একেক সময় অবশ্য প্রশ্ন আসে। ছেলেমানুষী? কি জানি? ঠিক ছেলেমানুষী নয় যেন। কেমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার। সে নিজে কিছু বুঝে উঠতে না উঠতে অন্য সবাই সজাগ হয়ে গেল। যেন মুহূর্তে প্রহরীর সতর্কতা সকলের। মা, বাবা, দাদা—এমন কি, ছোট ভাইটা পর্যন্ত প্রহরীর ভূমিকায় অষ্টপ্রহর। অথচ সুধা তখনও ঠিক ঠিক সব জানে না কিছু।

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিভেজা বাইরের আসন্ন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে এখন ভাল লাগছিল সুধার। কি রকম আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে সে তার একান্ত নিজের অস্পষ্টতার মধ্যে। এখন বৃষ্টির জন্যে, রবীন সময়মত না আসার জন্যে বা দীর্ঘ সপ্তাহের শেষ দিনটিতে বাইরের হাওয়ায় বেরোতে না পারার জন্যে খুব একটা দুঃখ হচ্ছে না তার।

একটা গাছের মরা ডাল বেয়ে জলের ফোঁটা অবিরাম পড়ে যাচ্ছে। মরা ডালটার কালচে ভেজা গায়ে রাস্তার আলো চিক্ চিক্ করছে। সুধা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছে জানালা দিয়ে।

ম্যাজিক? একটা রঙিন খালি বাক্স। তা থেকে জাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় বেরিয়ে এল একটা জ্যান্ত পায়রা। পায়রা নয়, সুধা নিজে। এখন তাকে দিয়ে আবার কি ম্যাজিক লাগানো হবে তা সে জানে না।

কেউ কিছু বুঝল না, বুঝতে দিলও না সুধাকে। এটাই একেক সময় খচ্ করে বেঁধে তাকে। আর বেঁধার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা নিষ্ঠুর ইচ্ছা পেয়ে বসে। ইচ্ছা হয়, পারে তো সে নিজেই এক ম্যাজিসিয়ান হয়ে তাক লাগিয়ে দেবে সবাইকে। সবাই হাঁ হয়ে দেখবে খেলা।

বাইরে খুব জোরে কড়ানাড়ার শব্দের সঙ্গে ডাক, মা, দরজা খোল।

মুহূর্তে সুধা ফিরে এল নিজের মধ্যে। এখন সে এ বাড়ির নয়া বউ। ঝট্‌পট্ ছুটে এসে দরজা খুলতেই তার চোখ বড় হয়ে গেল। রবীন, তার পেছনে বিকাশ। দুজনেই ভিজে একসা। রবীন অবশ্য দরজা খুলতেই এক টক্কনে সুধার পাশ কেটে ভেতরে ঢুকে গেল। বিকাশ থমকে আছে। সুধা না সরলে তার ঢোকার অসুবিধা। খেয়াল করে নি। বিকাশ হেসে বলে, সরুন!

ওঃ!—বলে সুরুৎ করে অন্দরে পালায় সুধা। ভয়ানক লজ্জা পেয়েছে

সে। কি বোকা! ভাবল মনে মনে।

বিকাশ উঠে এসে ধপ করে বসে পড়ে সামনের বেঞ্চিতে। দরজা পেরুলে ঢাকা বারান্দা মত হাতায় একটা বেঞ্চি। ঘরের দোসর বলা যায়। রবীনের বন্ধু-বান্ধবরা এলে এখানেই বসতে অভ্যস্ত। বিকাশ তো বটেই।

রবীন গামছা দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বিকাশের সামনে এসে বলে, জামা ছাড়বি?

নাঃ! আবার তো ভিজতেই হবে।

ছাতা নিয়ে যাবি। নে, মাথাটা মুছে ফেল।

গামছাটা বিকাশকে দিয়ে জামা-প্যাণ্ট ছাড়তে ভেতরে যায় রবীন। মাথায় একবার আলতো করে হাত বুলিয়ে বুঝলে বিকাশ, চুল সব ভিজে ঢোল। একটু ইতস্তত করে মুছেই ফেলে মাথা। চুলগুলো এখন খড়ের গাঁদা হয়ে গেল। যাক্! কি আর করা যাবে। ওদিকে কি নিয়ে ভেতরে একটা হাসি উঠেছে। সুধা আর রবীনের হাসির গলা শোনা যাচ্ছে। বেশ আছো বাবা! ভাবলে বিকাশ। অর্ধেক নয়, পুরো রাজত্ব সহ রাজকুমারী তোমার আয়ত্তে। এই বাজারে চাক্‌রি একটা পুরো রাজ্যের অধিকারের মত ছাড়া আর কি? ওপরি পাওনা সুধার মত একটা বৌ। দেখলেই যাকে ভালবাসতে ইচ্ছা হয়। রবীনটার কপাল বটে একখানা!

ভেতর থেকে হঠাৎ ডাক পাড়ে রবীন, বিকাশ, ভেতরে আয়!

বিকাশ উঠে যাচ্ছিল, কিন্তু দাঁড়াতে হল। বাইরে রবীনের বাবা পুলিন-বাবুর গলা। এগিয়ে দরজাটা খুলতেই ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি? রবীন ফেরে নি?

রবীনের মা-ও পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাড়া লাগিয়ে বলে, আগে উঠে এসো তো।

পুলিনবাবু উঠে এসে বিকাশকে বললে, বসো! রবীনের মা'র দিকে তাকিয়ে বললে, আগে একটা কাপড় দাও। কি বৃষ্টি বাবা! ভিজে কুকুর বনে গেলুম!

রবীনও বেরিয়ে এল। লুঙ্গি পরেছে। গায়ে গেঞ্জির ওপর চাদর। বাবাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার এত দেরি হল কেন?

সারাদিন বৃষ্টি! বাস-টাস ঠিক মত চলছে না। তা' ছাড়া ভোলার ওখানে যেতে হল।

কি বললে ভোলা দা?

পুলিনবাবু বিকাশের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে রবীনের মুখে অর্থপূর্ণ নজর ফেলে বলে, কি আর বলবে? সেই ধানাইপানাই এক-

কাহন।
তুমি যাও কেন ?—রবীনের মুখে হাসি ফুটে উঠল একটু।
যাব না ? ছেড়ে দেব ?—তেতে উঠল রবীনের বাবা।
বিকাশের অস্বস্তি লাগে। কি এক অপ্রিয় বিষয় নিয়ে বাপ-ব্যাটার কথোপকথন। তার মাঝে নিজের অস্তিত্বটা বড় বেঢপ। ভেজা জামা-প্যাণ্ট এখন লেপটে বসেছে গায়ে। রীতিমত শীত লাগছে। ঝট্‌পট্‌ কাজটা সেরে পালাতে পারলে বাঁচে।
রক্ষা করলে সুধা। সে এসে শ্বশুরকে হুকুম করলে, বাবা, আপনি ভেতরে যান। চা হয়ে গেছে।
মুহূর্তে সব পালটে গেল। শ্বশুর-শাশুড়ি একদিকে আর রবীন-বিকাশ একদিকে—সুধা মাঝখানে থেকে তার একটা নিজস্ব মাটিতে দাঁড়িয়ে যেন।
রবীন বিকাশকে বললে, আয়!
বিকাশ রবীনের পেছনে ভেতরে ঢুকে গেল। আর রবীনের মা পুলিন-বাবুকে বললে, তুমি কাপড় ছেড়ে ভেতরে যাও। সুধাকে বললে, চল মা কি করলে দেখি।
রবীনের মা চললো সুধার পেছনে।

তিন

রবীনের ওখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরুবে ভেবেছিল বিকাশ। তা' হল না। বেশ কয়েকবার ডায়াল করেও শংকরের লাইন পাওয়া গেল না।
রবীন বললে, কিসের তাড়া তোর? বোস না! যাবি খন। আর দু'একবার দেখ, পেয়ে যাবি। বৃষ্টির দিনে ফোনের লাইনে গোলমাল থাকে বড়।
আর ভাল লাগছিল না বিকাশের। জামা-প্যাণ্ট যদিও শুকিয়ে এসেছে। খুব গরম চা, তার সঙ্গে ডালডায় ভাজা পরোটা আলুভাজা দিয়ে খেয়ে যদিও একটা সুখ লাগছিল, কিন্তু বার বার কি একটা অস্পষ্ট অস্বস্তিতে ঠিক যেন সহজ হতে পারছিল না কিছুতেই।
বিকাশ বললে, ভাল লাগছে না। শংকরকে পেলে ভাল হত।
কি রকম আলগা আলগা ভাব বিকাশের। লক্ষ্য করলে রবীন। বললে, ব্যাপারটা কি বল দেখি। শংকর কে?
তুই দেখিস নি। এম. এ.-তে ভর্তি হয়েছিলাম না? তখনকার বন্ধু।
জরুরী দরকার ওর সঙ্গে?

জরুরী ?—প্রশ্নের সুরে কথাটা উচ্চারণ করে একটু হেসে বলে বিকাশ, তা, জরুরীই তো। কাল আমাদের একটা প্রোগ্রাম আছে। আজ যা গেল দিনের অবস্থা, কালও যদি এই থাকে—তাই শংকরকে দরকার। ওদের সল্ট লেকের নতুন বাড়িতে আমরা সারাদিন কাটাব কথা ছিল।
খুব ভাল প্রোগ্রাম। বৃষ্টির দিনে আরো মজার।
বৃষ্টির জন্যে ভয় হচ্ছে। ওরা যদি না বেরোয় !
বড়লোক ?
তা বলা যায়। বাবা বড় চাকুরে।
শংকর কিছু করে না ?
না। করবে—সেই জন্যেই কালকের প্রোগ্রাম।
রবীন কিছু বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকল। কিন্তু বিকাশের আর কথা বলতে ভাল লাগছিল না। ভাবছিল, যদি সুধা একবারও এঘরে আসে বা রবীনের বাবা বা মা কেউ একবার রবীনকে ডাকে তা' হলে বেঁচে যায়, সে বেরিয়ে যেতে পারে অনায়াসে। তা হল না। রবীন ছাড়ার পাত্র নয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করে।
গোপন করার কিছু নেই। বিকাশ বললে সব। বলেটলে শেষে রবীনকে একটা খোঁচা মারলে—
তুমি তো বেশ আছো বাবা ! নিশ্চিন্ত—
রবীন একটু মুচকি হাসলে। বিকাশের খোঁচার ধারও মাড়ালে না ! বললে, নে. আরেকবার ডায়াল কর তুই। আমি আসছি ওঘর থেকে।
বিকাশ বুঝলে, আড়াল থেকে নিশ্চয় সুধার ইশারা পেয়েছে রবীন। তাই ইওর মোস্ট ওবিডিয়েণ্টলি কোন দিকে না ঝুঁকে সোজা সুরুৎ। দোষ তারই। এমন একটা সন্ধ্যা বিফলে দিতে কার সয় ? বিকাশ ঠিক করলে আর তিনবার ডায়াল করবে। পায় ভাল, না পাবে তো কাল সকালে আবার চেষ্টা করবে।
তিন বার কেন, কতবার যে চেষ্টা করল, বিকাশ গোনে নি। শংকরকে পেল না, রবীনেরও পাত্তা নেই। আজ বৃষ্টির জন্যে সব কিছুতেই গোলমাল। মনে মনে হাসে বিকাশ। টেলিফোনের লাইন থেকে নব-দম্পতির লাইন পর্যন্ত—সব কিছুরই হদিশ পাওয়া ভার।
বিকাশ হাঁক দিলে, রবীন !
রবীন তার বাবার ঘর থেকে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, দাঁড়া, আসছি।
বিকাশ উঠে দাঁড়ায়। আটটা বেজে গেছে। এখানে আর দেরি করা ঠিক হবে না।
রবীন এসে জিজ্ঞেস করে, পেয়েছিস তোর বন্ধুকে ?

না।
যাবি ?
থেকে আর কি করবো। ফোন করতেই এসেছিলাম। ভাবলাম তোর এখান থেকে ফোন করলে পয়সাটা বাঁচবে। তা' হল না। কাল সকালে আবার দেখতে হবে। চল্লিশ পয়সা গচ্চা।
তোদের বিল্ডিংয়ে ফোন নেই কারো ?
আছে। পয়সা লাগে। যাচ্ছি—বলে, বিকাশ দরজার দিকে এগিয়ে যায়। পেছনে রবীন। বিকাশকে যেতে আর বাধা দিলে না সে। তার মাথায় এখন বাবার অস্ফুট কথাগুলো। বিকাশ চলে যাক, এটা সেও চাইছিল এখন। কেননা, বাবা প্রশ্ন তুলেছে, বন্ধু বলে সময় অসময় নেই ? যখন তখন আসবে ? এর চেয়েও গুরুতর আরেকটা প্রশ্ন। সেটা সুধাকে নিয়ে। বন্ধু বলে কি হয়েছে ? তুমি বিয়ে করেছ। বৌমার কথা ভাবতে হবে না তোমাকে ? বাবার কথার ইঙ্গিতটা ভাল না। প্রতিবাদ করতে পারতো রবীন। করে নি। ইচ্ছা হয় নি। বাবা আজকাল বেকার ছেলে-দের দুচক্ষে দেখতে পারে না। অথচ রবীন নিজেও তো ছ'মাস আগেও বেকার ছিল। ছ'মাস আগে প্রায় রোজই বিকাশ আসতো এ বাড়িতে যখন তখন। বাবা কিন্তু তখন অন্য ব্যবহার করে নি। আজ আকস্মিক ভাবে বাবার ওসব কটুকাটব্য তাকে ভয়ানক ঝাঁকানি লাগাচ্ছে। কি হল হঠাৎ ? সুধা কিছু বলেছে ? রবীনের সঙ্গে বিকাশের ঘনিষ্ঠতা সুধার কি পছন্দ নয় ? হতে পারে। সেকথা সুধাও বলতে পারতো তাকে।
বিকাশ বেরিয়ে গেলে বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে রবীন তার নিজের ঘরে এসে বসলে গুম হয়ে। বাবার কথাগুলো নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে থাকল। বাবাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আজকাল সকলেই ওরকম ভাবে, বিরক্ত হয়। তবুও ভাল লাগে না। তার বিয়ের পর এখন বিকাশ বড় একটা আসে না তাদের বাড়ি। এলেও নেহাৎ কোনও দরকারে এসে দেরি করে না। বরঞ্চ সে-ই বিকাশকে দেরি করায়। সুধার পছন্দ না ? অসুবিধা হয় ? রবীনের মন ভারি হতে থাকে।
সুধা বেশ হাসিখুশি মুখে এঘরে ঢুকতেই রবীনের তর সইল না! জিজ্ঞেস করে, আমার বন্ধুরা এলে তোমার অসুবিধা হয় ?
কেন ?—সুধা অবাক।
না, বাবা বলছিল—
কি ?
বাবা বিকাশকে পছন্দ করে না।

যাঃ! কেন অমন মনে করছো তুমি? কি বলেছে বাবা?
বিশেষ কিছু না! মনে হল, বিকাশ আমাদের বাড়ি আসে এটা বাবার ভাল লাগে না।
বাবার কথা ছাড়ো। হয়তো মন ভাল না। বিকাশবাবুকে দেখে তার ওপরই মনের ঝাল মিটিয়েছে।—সুধা হাসতে থাকে।
সুধার যুক্তিটা রবীনের মনঃপূত হল। বাবা আজও ভোলাদার কাছ থেকে ফিরে এসেছে। হয়তো সেই জন্যেই ওভাবে সব বলছিল। রবীনের মন হালকা হয়ে আসে। বলে, এখন কি করবে তুমি?
কিছু না।
কোন কাজ নেই?
না।
দরজাটা বন্ধ করে দিই?
ধ্যেৎ!
কেন? ঠাণ্ডা ছাঁট আসছে না?
আসুক।
অসুখ করবে।
করুক। বিকাশবাবু কি করে?
বেকার। দাও না তোমার কোনও বন্ধুকে জুটিয়ে। আমার মত বিয়ের সঙ্গে একটা চাকরি পেলে আর চাইবে না কিছু।
তুমি চাও নি আর কিছু?
কি চেয়েছি আর?
কিছু না?
স্থির দৃষ্টিতে সুধার মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটার মানে বুঝে খুব হেসে উঠল রবীন।
সুধা ধমকে দিলে, এই, চুপ! কি ভাববে বাবা-মা ওরা।
কিছু ভাববে না।
রবীন আচমকা উঠে গিয়ে সুধাকে জড়িয়ে ধরে বার দুই চুমো খেয়ে ছেড়ে দিলে। সুধা রবীনের বুকের ওপর ঝট্‌পট্‌ করে ছাড়া পেয়ে ছুটে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলে, তুমি কি?
রবীন এবার বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে হাসে।
সুধা বলে, বাবা কার কথা বলছিল?
কখন?
ঐ যে, তুমি জিজ্ঞেস করলে না, ভোলাদা না কে যেন—
ভোলাদা! আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। টাকা ধার নিয়েছিল।

এখন দিতে পারছে না।
কেন ?
দেবে কোত্থেকে ? যা রোজগার তাতে তার নিজের সংসারই চলে না, ধার শুধবে কি দিয়ে ! বাবার যখন হাত টানাটান চলে তখন খামকা গিয়ে বেচারাকে তাগিদ দেবে, গালমন্দ করবে। কিন্তু জানে, ও টাকাটা কোন দিন শুধতে পারবে না ভোলাদা। বাবার ঐ স্বভাব।
বাবা ভালমানুষ—
ভালমানুষ নিশ্চয় ! কিন্তু বড় অবুঝ। এই তো দ্যাখ না ! বিকাশকে দেখে ক্ষেপে গিয়ে আমাকে শোনালে দু'চার কথা। ভাল লাগে ? আমি ভাবলুম, তুমি বুঝি কিছু বলেছ।
আমি ? আমি কি বলব ?
না, বাবা বলছিল, আমার বন্ধুরা যখন তখন আসে, ঘরে সোমত্থ বৌ, আমার নাকি এসব বোঝা দরকার।
ওঃ !—সুধা খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলে, তোমার মনে হয় না কিছু ?
কথা বলতে বলতে রবীনের শিয়রে এসে দাঁড়ায় সুধা। সুধার একটা হাত টেনে নিয়ে আঙুলের ফাঁকে তার নিজের আঙুল চালিয়ে দিয়ে বলে রবীন, আমার মনে হবে কেন ?
মনে আছে, আজ কথা ছিল বেড়াতে যাবার ?
এই বৃষ্টিতে ?
না। তা কেন ? কাল বৃষ্টি থাকবে না। যাবে তো ?
কোথায় যাবে ?
চলো কোথাও।
তোমার ভাল লাগে না বুঝি এখানে ?
সারাদিন একা একা। ভাল লাগে ?
পড়াশোনা করবে ?
আরে ব্বাস্ ! আমার আর হবে না। দু'বারে স্কুল-ফাইন্যাল পাশ করেছি। আর ওপথ নয় বাবা।
তাতে কি ? পরে হয়তো দেখবে কেমন সোজা—
না বাপু ! আমার ভাল লাগে না।
বিয়েতে তো অনেক বই পেয়েছ। পড়তে পারো।
ঐ তো করি। সব শেষ হয়ে এল।
তবে কি করবে ?
আমিও তাই ভাবি। জানো, আমার কিছু একটা করতে ইচ্ছা হয়।

কি রকম ? চাকরি ?
পেলে মন্দ হত না। আমার বন্ধুরা অনেকে করে।
দেশে কত বেকার জানো ?
জানি।
তোমাকে আমার বিয়ে করতে হল কেন জানো ?
চাকরির জন্যে। নইলে কাকে বিয়ে করতে ?
আর যে মেয়ের বাবা চাকরি দিত।
তুমি এসব কথা আর বলবে না। কত দিন বলেছি না ! চাকরিটা তোমার যেমন দরকার ছিল, বিয়েটাও আমার দরকার ছিল। তাই না ?
হয়তো।
হয়তো কেন, নিশ্চয়। কত সম্বন্ধ এসেছিল আমার জানো ? বাবা বিশেষ কিছু দিতে পারবে না, তাই হয় নি।
ওঃ, তাই ! শেষমেষ আমার মত একটা বেকার ছেলেকে চাকরির লোভ দেখিয়ে হাবা-গোবা মেয়েটাকে চালিয়ে দিলেন ভদ্রলোক !
ইস্ ! —বলে রবীনের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সুধা।
রবীন বোধ হয় এটাই চেয়েছিল। বুকের ওপরে সুধাকে দুই হাতে-পায়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলে রবীন। সুধা চুপ। মাথা গুঁজে দিয়েছে রবীনের থুঁতনির তলায়।

চার

বাড়ি ফেরার পথে সুমিতাকেও ভিজতে হল। জোর হাওয়া উঠেছে। ছাতা মেলে রাখা যায় না। ছাতা গুটিয়ে ভিজতে ভিজতে ছুটছে সে। নিজে ভিজছে বলে খুব একটা আফশোস ছিল না, কিন্তু গীটারটা— ভাবতেই মন খারাপ লাগে। এবার ট্যুইশনির মাইনে পেয়ে একটা প্লাস্টিকের ঢাকনা কিনবে গীটারের জন্যে, ভাবলে।
বাস স্টপ দু'তিন মিনিট। কিন্তু বাস পেতে কত সময় যাবে বলা অসম্ভব। দাঁড়াবার জায়গাও নেই কাছেপিঠে। চৌমাথা পেরিয়ে ওপারের স্টপে পাকা ছাদের ছাউনি আছে যাত্রীদের জন্যে। এদিকে নেই। এক সারি দোকান এদিকে। নানা ধরনের জনমানুষ বৃষ্টির জন্যে ঝাঁপের তলায়, দোকানের ভেতর মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে-বসে। সুমিতা এক নজরে সব লক্ষ্য করে চৌমাথা পেরিয়ে এগিয়ে এল ছাউনির দিকে। আরে ব্বাস্। এখানেও ভিড়। বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে সব। সুমিতা

সেঁধিয়ে যায় ভিড়ের মধ্যে। আবছা আলোয় চেনা যায় না কাউকে। সুমিতা দেখল মেয়েছেলে নেই একজনও। একটা কোন্ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে। কম বয়েসী একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করে, বাস আসছে না ?
দেখছি না তো ! কুড়ি মিনিট হয়ে গেল—
পাশের এক মধ্যবয়েসী ভদ্রলোক বললে, আমি তো প্রায় ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে। কোথায় বাস ?
সুমিতা অপেক্ষা করবে কিনা ভাবলে। দেরি করে বাস এলে আর ওঠা যায় না। আগে থেকে ঠাঁসা বোঝাই হয়ে আসে। বৃষ্টি থামলে সুমিতা বাসের কথা ভাবতই না। মাত্র দুই স্টপ গিয়ে নামতে হবে। বৃষ্টি, তার ওপর হাওয়া। হাওয়াটার জন্যেই বিশ্রী লাগছে। শাড়ি-ব্লাউজ গায়ে জলপটির মত এঁটে বসেছে। একটা শিরশিরে শীত হাড়ে-মজ্জায় কাঁপুনি ধরাচ্ছে। তাই হেঁটে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কিন্তু দাঁড়াবে কতক্ষণ ?
তবু বাস এই আসে এই আসে ভেবে দাঁড়াতেই হয় কিছুক্ষণ। একটা এলোও ঠিক, দাঁড়াল না। মোড় ঘুরেই স্পিড বাড়িয়ে ঝট্ করে বেরিয়ে গেল। দাঁড়ানো লোকগুলো রাস্তায় নেমে গেছিল চঞ্চল হয়ে। একজনও উঠতে পারল না। বাসে ভিড়। দু'দরজায় এমনভাবে ঝুলে আছে সব যে আর কারো সেখানে সেঁধোনোর কথা ভাবাই যায় না। তবু বাসটা দাঁড়াল না বলে প্রায় সবাই হৈ হৈ করে উঠল। সুমিতার মনে হল যেন কি একটা মহামারী ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু না, বাসটা কেটে বেরিয়ে যেতেই আবার ছাউনির তলায় উঠে এল সবাই। এখন কেবল কাটা কাটা বিভিন্ন স্বরের ক্ষুব্ধ উচ্চারণ—
শালা ! এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি—
এই জন্যেই স্টেট বাসের এই হাল। হত প্রাইভেট বাস, সবাইকে তুলে নিয়ে যেত।
ঠিক ঠিক ওষুধ পড়লে সব ঢিট—
ছেচল্লিশ নম্বর প্রাইভেট বাস একটা মোড় ঘুরছে দেখে সবাই চুপ হয়ে রাস্তায় নেমে এল ফের। এখন বৃষ্টিটা আরো ঘন হয়ে এসেছে। কয়েক সেকেণ্ডেই ভিজে গেল অনেকে। বাস কিন্তু দাঁড়াল না। একই হাল। আগে যে স্টেট বাসটা ঠাঁসা ঝুলন্ত যাত্রী নিয়ে যেভাবে বেরিয়ে গিয়েছিল, এটাও সেভাবেই বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এবারও হৈচৈ উঠল। কিন্তু দু'চার জন আর অপেক্ষা না করে হাঁটা ধরলে ভিজতে ভিজতে।
সুমিতা ঘড়ির দিকে তাকালে একবার। ছোট ঘড়ি, আবছা আলোয় সময় ভাল বোঝা যায় না। মনে হল আটটা পেরিয়ে গেছে। সুমিতাও হাঁটা

ধরলে। হাঁটতে হাঁটতে বিকাশের কথা মনে এল। বিকাশ সঙ্গে থাকলে তাকে ছাতা হাতে নিয়ে ভিজতে হত না। যে করেই হোক সুমিতা যাতে না ভিজে বিকাশ সে চেষ্টা করতো। ছাতাটা মেলে ধরে এই হাওয়া আর জলের সঙ্গে বেশ একটা লড়াইয়ের মত কাণ্ড বাধিয়ে হাঁটতে থাকতো নিশ্চয়। তখন ভিজে গেলেও কিছু মনে হত না। বিকাশটা ঐ রকম। মনে মনে বেশ একটু হেসে নেয় সুমিতা।

ভিজেই গেল, পুরোপুরি ভেজা। ভেতর থেকে একটা কাঁপুনি উঠছে। রেলব্রিজের কাছাকাছি এসে তবু ভরসা। তাদের গলির মুখের লাইট পোস্টটা নজরে পড়ে একটু কাঁপুনি কমে। কিন্তু জায়গাটা বড় নির্জন। গা ছম্‌ছম্‌ করে। পিছনে একবার তাকায়, তারপর সামনে। এক-আধ-জন অবশ্য ছাতার তলায় মাথা গুঁজে অন্ধের মত ছুটছে সামনে বা পেছনে। সেদিকে তাকিয়ে সুমিতা যেন তার জীবনে এই প্রথম বুঝলে যে, সে একজন নারী অর্থাৎ যুবতী মেয়ে। কিন্তু বিকাশ ওরা এমন ব্যবহার করে, সুমিতা তখন ভুলেই যায় যে সে মেয়ে।

আজ সন্ধ্যের কথা মনে এল। বিকাশের জন্যে মায়া লাগে। কেননা, বিকাশটা বড় ভাল ছিল, বড় চৌকশ ছেলে। আর দশটা ছেলের মত নয়। কে জানে, হয়তো সেটাই হয়েছে কাল। সুমিতা দেখেছে, বিকাশের কবিতা ছাপা হয় লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিনে। কি একটা কবিতা একবার পড়েও শুনিয়েছিল সুমিতাকে। সুমিতা বোঝে নি। বিকাশ ঠাট্টা করে বলেছিল।

কবিতা হয়েছে বলেই তুই বুঝিস নি সুমিতা।

সুমিতা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই একটা ওঃ শব্দ ছুঁড়ে ফুঁসে উঠেছিল, যা যা! যা বোঝা যায় না তার আবার দাম কি? কার জন্যে তবে

বিকাশ হেসে বলেছিল, তুই মিথ্যে ভাবিস নি! তোর জন্যে নিশ্চয় আমি কবিতা লিখব না।

তখন মনটা সত্যি একটু খারাপ হয়েছিল। কিন্তু বুঝতে দেয় নি বিকাশকে। বলেছে, তোমাদের ছেলেদের কত যে ঢঙ, কত যে রঙ! তুই বিকাশ আচার্য কবিতা লিখছিস আজ, আর কালই হয়তো সব ছেড়ে-ছুঁড়ে শুরু করে দিবি সুদের কারবার। আমরা মেয়েরা তা পারি না বাবা। আমরা যা ধরব আঁকড়ে ধরব, যা করব প্রাণ দিয়ে করব—

কেন? ছেলেরা আঁকড়ে ধরে না, প্রাণ দিয়ে কিছু করে না?

না।

কে বললে তোকে?

আমি বলছি।
কটা ছেলে দেখেছিস ?
এই তো তোকে, তোর বন্ধুদের দেখছি।
বিকাশ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল সুমিতার কথা শুনে। তারপর বলেছিল, যাক গে! তুই যা ভেবে খুশি থাকবি তাই ভাল!
না, তাই ভাল নয়, সুমিতা জানে। খুব দ্রুত তার এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে সব বিশ্বাস, সব ধারণা মিথ্যে মনে হয়। হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হচ্ছে সে যেন দৌড়াচ্ছে। অথচ রাস্তা ফুরোয় না। গলির মুখটা এখনও কতদূর। বৃষ্টির অজস্র ঝির-ঝির ফোঁটায় ঝাপসা দেখলেও মনে মনে সে তাদের গলির ফাঁকা হাঁ-করা মুখটা দেখতে পায়। সে কাছাকাছি গেলেই গলিটা তাকে গিলে ফেলবে। ঐ হাঁ-করা শূন্যে মুখ এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা নেই তার।
গলির মুখে এসে এদিক-ওদিক তাকালে একবার। সাড়ে আটটাও হয় নি এখন। কিন্তু মনে হচ্ছে কত রাত। বৃষ্টির জন্যে! এত শীগ্‌গির তারও ফেরার কথা নয়। বৃষ্টির জন্যে। বিকাশটার কথাও বার বার আসছে, সেও বৃষ্টির জন্যে। বিকাশরা এ গলিতেই থাকতো, তাদের পাশের চালায়। বাইরে থেকে ভেতরে ঢোকার দরজা আলাদা। ভেতরে ঢুকলে ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটা ঘর—এক বাড়ির মত। বিকাশ আর তার জন্ম এই বাড়িতেই। মা'র মুখে শুনেছে, বিকাশের যেদিন মুখে ভাত, সুমিতা সেদিন মাটিতে পড়ে। সেই সুবাদে বিকাশ আগে আগে খুব বলতো, এই সুমি, আমি তোর বড় না ? যা বলবো, সব শুনতে হবে।
সুমিতা বুড়ো আঙ্গুল নেড়ে বলতো, কাঁচকলা।
কি আশ্চর্য! সুমিতা যেন বুড়ি হয়ে গেছে। যেন সেই একটাই গান এখন তার সম্বল, ফেলে আসা দিনগুলি মোর··· । কিন্তু না। তার গীটার আছে। সমঝদার লোকেরা বলে, গীটারে তার হাত খুব ভাল। রেডিওতে দু'বার বাজাবার সুযোগ পেয়েছিল। ব্যস্, তার পরই এ তল্লাটে তার নাম। জলসায় ফাংশানে তার ডাক। কম হলেও কিছু টাকাপয়সা হাতে আসেই। এখন তিনটে ট্যুইশনি করে। মোটামুটি ভাল রোজগার।
বিকাশটা এমন ফাজিল! রেডিওর প্রথম প্রোগ্রামটা শুনে সেইদিনই এসে বলেছিল, কি খবর, মিস্ রেডিও ?
হাসিও পেয়েছিল, রাগও ধরেছিল। রাত তখন ন'টা। তবু সুমিতা বললে, চা খাবে ?
আমি কিছু খাব না, তোকে খাওয়াতে এসেছি। বলেই প্যাণ্টের পকেটে

হাত ঢুকিয়ে ক্যাডবেরি চকোলেট এক প্যাকেট বার করে বললে, এই নে। তোর যে গীটারের এমন হাত, কে জানতো! তাই খেতাবটাও আমি দিলাম, মিস্ রেডিও। চালু করে দেব, দেখবি।

দূর! তুই পাগল না মাথাখারাপ? আমার শত্রুতা করে কি লাভ তোর?

কেন? শত্রুতা কিসের? দেখিস নি, জলসার প্রোগ্রামে ছাপে না, অমুক. ব্রাকেটে সিনেমা, তমুক, ব্রাকেটে রেডিও। আমি ব্রাকেট তুলে দিয়ে সোজা বলতে চাই, সুমিতা রায়, মিস্ রেডিও।

দ্যাখ্ বিকাশ, ঠাট্টারও সীমা থাকবে তো?

ঠাট্টা ভাবছিস তুই?

কেন ভাববো না? তুই তো পাগল নস্!

ঠিক আছে। চলি—

বিকাশের ঐ স্বভাব। ওর পাগলামীতে সায় না পেলে ও কেমন মনমরা হয়ে যায়। যেন কোথায় ডুবে যায় একেবারে।

পাগলামী তার নিজেরও আছে। গলির মুখ পেরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মনে হল তার। দু'পাশে কাঁচা নর্দমায় নোংরা জলের স্রোত। দুর্গন্ধ আর ডাইনে-বাঁয়ের সারবন্দী খোলার বাড়ির অপরিচ্ছন্নতা— সুমিতার বারবার মনে হয়ে আসছে, গীটার বগলে সে এখানে বেমানান। বিকাশরা এখান থেকে উঠে গিয়েছে, বেঁচেছে।

সামনেই ডান দিকে পথের ধারে একটা শিউলি গাছ। শীতের ছোঁয়ায় গাছটা ন্যাড়া হয়ে এসেছে। মনে পড়ে, বিশ-পঁচিশ দিন আগেও যেন দেখেছে তলায় শিউলি ফুল ঝরেছে, কাছাকাছি আশ্চর্য ঘ্রাণ। আর সেই ঘ্রাণ বুকের তলায় সেঁধিয়ে গিয়ে সব ঘুমিয়ে থাকা বিষয়-আশয় ছুঁয়ে-ছেনে জাগিয়ে দিতে চায়। সুমিতা কেবল ভয়ে মরে। পাছে জেগে ওঠে, সেই ভয়ে সে যেন হাতের মৃদু চাপে সব আবার ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়।

শিউলি গাছটার তলায় এলে এই গলিটা ভুলে যেতে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা হয় না আর গলির অন্ধকারে পা বাড়াতে। ইচ্ছা হয় না সেই খোলার চালার তলায় গিয়ে দাঁড়াতে—যেখানে তার আজন্মের জ্ঞান আর ঘৃণা পাশাপাশি মুখ বাড়িয়ে থাকে।

পেছন থেকে একটা রিক্সা আসছে ঠুন ঠুন করতে করতে। পথে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। রিক্সাওলা নিশ্চই তাকে দেখেই ঠুন ঠুন করছে। একবার পেছন ফিরে তাকাল সুমিতা। ঘেরাটোপের ভেতরে কে আছে কে জানে। রিক্সাটা সুমিতাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল।

এতক্ষণে সুমিতার মনে হল, একটা রিক্সা নিলে আর তাকে ভিজতে হত না। কত আর লাগতো! টাকাখানেক। কি সব আবোল তাবোল ভাবনায় টালমাতাল হয়ে সে ভিজল যে! সে যে এমন বোকা, সে নিজে ছাড়া আর কেউ বোঝে না তা। কিন্তু গোটা একটা টাকাও যেত তার। তারই! যাকগে, রিক্সার কথা মনে না হয়ে ভালই হয়েছে। একটু ভিজলে, সামান্য শীতে কাঁপলে কি আর হবে এমন। একটা টাকা বেরিয়ে গেলে—ভাবাই যায় না কিছু, কত অসুবিধা হতে পারে। কত সময় যায়, চার আনা পয়সার অভাবে দেহ-মনে এক অস্বাভাবিক গ্লানি, ভয়ানক লজ্জা চেপে ধরে। সে কথা ভেবে কিছুটা তার আফশোস কাটে।

বিকাশরা যখন এখানে থাকতো, সুমিতার বাবা মাঝে মাঝে ধার চাইত বিকাশের বাবার কাছে। বেশি না, কখনো এক-দেড় বা দু'তিন টাকা। তাও ভয়ানক দায়ে না পড়লে নয়। বিকাশের বাবা তা খুব সহজে নিত কিনা বোঝা যেত না, বা পরিবারের অন্য কেউ—বিকাশের মা, ভাই-বোন-বৌদি কে কি ভাবতো কে জানে! কিন্তু সুমিতা মরে যেত। এত যে ঘনিষ্ঠতা বিকাশের সঙ্গে, তবুও কি রকম ছোট ছোট মনে হত নিজেকে বিকাশের কাছে। কেবল নিজেকে নয়, মনে হত, বাবা ছোট, মা ছোট, তাদের পরিবারের সবাই ছোট আর সেই ছোটত্বের যত লজ্জা, যত গ্লানি তা কেবল সুমিতার মধ্যে জড় হয়ে ভারি বোঝা হয়ে উঠছে।

সুমিতার রাগ হত। বাবার ওপর প্রথমে, তারপর মায়ের ওপর, সবশেষে সারা পৃথিবীর ওপর। এখনও রাগ হয়। তবে ঠিক সে ধরনের উগ্র নয়, কিন্তু আগের চেয়ে বেশি জ্বালা তাতে—নীরবে তা সে এখন সয়ে যেতে চেষ্টা করে। আগে পারতো না। বাবাকে বক্‌তো, মাকে যা-তা শোনাতো, দাদাকে গাল পাড়তো, ছোট ভাই-বোন দুটোকে চড়চাপড় মারতো, তবে সে শান্ত হতো। কিন্তু এখন আর শান্ত হবার মত কোন পথই নেই। বুঝেছে, বাবাকে বকে, মাকে যা-তা শুনিয়ে, দাদাকে গাল পেড়ে, ভাই-বোনকে মেরেধরে সে নিজে শান্ত-ক্লান্ত হলেও সমস্যা ঠিক তার জায়গামত আসন জুড়ে ঘাপটি মেরে বসে আছেই।

মাঝখানে কেবল কদিনের জন্যে সব ভুলে ছিল সুমিতা। সে এক স্বপ্ন। তারপর স্বপ্ন ভঙ্গও হয়েছে। আর এখন স্বপ্ন দেখেই না সুমিতা, স্মৃতিচারণ করে। স্মৃতি তাকে ক্রমাগত বুড়িয়ে দিচ্ছে। এখন সে আশার কথা, স্বপ্নের কথা, সুখের কথা ভাবে না। মনেই আসে না। টুঁটি চেপে ধরেছে তার বর্তমান।

স্বপ্ন না বিদ্রূপ? আশা না যন্ত্রণা? সুখ না অশান্তি? সুমিতা যেন আজও ঠিক বোঝে না। স্বপ্ন যাকে বলো, বিদ্রূপ তার জন্য অপেক্ষা

করছে। আশা যাকে বলবে, যন্ত্রণা তার জন্যে তৈরি। সুখ যাকে বলছো, অশান্তি তার দোসর হয়ে আসছে। তবে?

কে রে?—একদিন খুব সুরেলা স্বরে জানতে চেয়েছিল সুমিতার বন্ধু কল্পনা। কল্পনার ধারণা আর কি হবে? কি-ই বা ভাববে? মেয়েরা এ বয়সে নিবিড় করে কোন ছেলের কথাই তো ভাববে। তাই তো নিয়ম। সুমিতাও ভেবেছিল। তবে একটু অন্য ভাবে। আর কল্পনা যা জানতে চেয়েছিল, সুমিতার তখন সে রকম খবর কিছুই নেই। কল্পনাকে অবস্থাটা বললে বুঝতো না, ভাবতো সে কিছু বলতে চাইছে না। তাই একটু হেসে বলেছিল, সময় মত দেখবি।

আর যায় কোথা! কল্পনা তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, বল না, কে?

সুমিতা আবার হেসেছে। কি বলবে? হঠাৎ একটা দুষ্টুমি এসেছিল মাথায়। বললে, তোর কথা বল।

আশ্চর্য! কল্পনা যেন সুমিতার এই কথা শোনার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। কার সঙ্গে কি করে বেড়াচ্ছে সে-সব গল্প ফেঁদে বসেছিল কল্পনা। গল্প আর শেষ হতে চায় না। দুপুরে এসেছিল কল্পনা, আর যখন উঠল, রাত হয়ে গেছে। কল্পনাকে বাসে তুলে দিতে বড় রাস্তা অবধি এসেছিল সুমিতা। ওরা থাকে শ্যামবাজার, বনেদী পাড়ায়। অবস্থাও ভাল। পড়াশোনায় তেমন না হলেও চালিয়ে যাচ্ছে। বি.এ. পড়ছে তখন। বলে গিয়েছিল, সম্বন্ধ দেখা হচ্ছে। কিন্তু বিয়ে করবে না কল্পনা।

কল্পনার গল্প শুনে সুমিতা অবাক হয়েছিল। অতো কাণ্ডের মধ্যে জড়িয়ে থেকে বেশ আছে যেন কল্পনা। সুমিতাও যদি চালিয়ে যেতে পারতো পড়াশোনা, তারও হয়তো বলার মত কত কথা জমে যেতো। তাকেও হয়তো সে-সব বলতে ছুটে যেতে হতো কল্পনার কাছে। স্কুল-ফাইনালের পর কলেজের কথা ভাবার সময় পেল না সে।

কিন্তু কলেজে কি কেবল, কল্পনা যা বলল, তাই হয় নাকি? পড়াশোনা—এসব কিছু না? কেবল ছেলে-মেয়েতে মাখামাখি? অন্তত কল্পনার গল্প যে শুনবে, তার মনে হবে, কলেজে কেবল প্রেম-পীরিত আর গল্প-গুজব। তখনই সন্দেহ হয়েছিল, কল্পনাটা গেছে। তারপর শুনেছে সুমিতা, কল্পনার কি অসুখ করেছিল। পরে ধরা পড়েছে, মাথার দোষ। তারপর কবে একদিন বাড়ি থেকে উধাও। কল্পনাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।

মাঝে মাঝে সুমিতার মনে হয়, তারও যেন মাথার দোষ হলে ভাল হত। একেক সময় ইচ্ছা হয়, কেউ তাকে খুঁজে না পাক। এখন যেমন মনে

হচ্ছে, এ বাড়িতে আর ঢুকতে না হলেই ভাল হত, বাঁচত সে। সে যেন মরতে এগিয়ে যাচ্ছে। বাড়ি নয়, মরণ-কূপ। তবু, তাকে বাড়ির দরজা পেরিয়ে ভেতরে যেতে হচ্ছে। ভেতরের উঠান পেরিয়ে তাদের ঘরের দাওয়ায় উঠে ডাকতে হল, মা!

বেরিয়ে এল ছোট ভাইটা।

সুমিতা বললে, আলনা থেকে আমার শাড়িটা নিয়ে আয় তো।

ততক্ষণে বাবা উঠে এসেছে। সুমিতার দিকে তাকিয়ে কি রকম ভীরু গলায় বললে, ইস্, ভিজে গেছিস! শীগ্গির জামাকাপড় ছাড়—

বাবার ঐ ভীরু স্বর, ম্লান অস্তিত্ব সুমিতাকে কেমন একটা হ্যাঁচকা টান মারে। এখন মনে হচ্ছে, এতক্ষণ সে যেন কি সব আবর্জনা ঠেলে ঠেলে সাঁতরে যাচ্ছিল। এখন সামনে সমুদ্র বিশাল, ভয়াবহ, কিন্তু কী যেন এক আকর্ষণ তার।

বাবার কথায় হাঁ হুঁ কোন সাড়া দিতে পারল না সে। ছোট ভাইটাকে চিৎকার করে বললে, কই রে নান্টু, কাপড়টা আনলি?

পাঁচ

বিকাশ কেন, অনেকেই ভেবেছিল রবিবার সকালে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। হল না। বরঞ্চ আরো ঘন মেঘের তলায় সবকিছু আবছা বিষাদ-ময় হয়ে এল। ঝিরঝির বৃষ্টির শেষ নেই। কলকাতার জনজীবন যেন থমকে থেমে গেছে।

কিছুক্ষণ ভাবতে হল বিকাশকে। তারপর সে প্যাণ্ট-জামা পরে তৈরি হল। জামার নিচে গরম সুয়েটার পরে নিলে। ঠাণ্ডা লাগতে পারে, সাবধান থাকা ভাল। বৌদির সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। তার ফোল্ডিং ছাতাটা নেবে। দামী ছাতা। হাওয়ার তোড়ে না ভাঙে। সতর্ক থাকতে হবে। ভাঙলে কেলেঙ্কারী। সখ করে কেনা, ভাঙলে সইবে না বৌদি। মা বাবা দাদা—আর সবাই রাগ করবে। তার নিজেরও কি ভাল লাগবে? আসলে বাড়িতে একটাও ভদ্রমত ছাতা নেই যে শংকরদের মত সচ্ছল পরিবারের লোকজনের সামনে হাতে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ানো যায়। তাই ঝুঁকি নিতে হচ্ছে তাকে।

বৌদি হেসে বলেছে, লেডিস ছাতা নিয়ে বেরুবে, লজ্জা করবে না?

কেন? আজকাল তো অনেকেই ওরকম ছাতা নিয়ে বেরোয়। সুবিধা। ট্রামে-বাসে ডাণ্ডাওলা ইয়া এক ঢাউস ছাতা নিয়ে চলা যায়?—বলেছে বিকাশ। আসল কথটা বুঝতে দেয় নি বৌদিকে।

যাক গে! সখের জিনিস, ভেবেছিল, বৌদি বুঝি আপত্তি করবে। করে নি। মাঝে মাঝে ছোটখাটো নানা তুচ্ছ বিষয়ে লক্ষ্য করেছে বিকাশ, বৌদিটা খুব সহজ, খুব সরল। মনে হয় তার, মেয়েটা তাদের সংসারে এসেই যেন গুলিয়ে ফেলেছে সব। একেক সময় বৌদিটার কেমন একটা মমতা-মাখা স্বভাব বেরিয়ে এসে সব দোষ, সব বিচ্যুতি মুহূর্তে 'কিছু না' বলে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায় যেন। কিন্তু পারে না। না পারার কারণ, বিকাশের মনে হয়, বৌদি নয়, বিকাশদের নিজেদের পরিবার—তারাই মেয়েটার স্বাভাবিকতা বিকল করে দিচ্ছে ক্রমাগত।

বিকাশ চুল আঁচড়াচ্ছিল। বৌদি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে এসে বললে, এবেলা ফিরবে না?

না! —বিকাশ আয়নার দিকে চোখ রেখে বললে।

বৃষ্টির দিন। বাবা বললে খিচুরি হবে। তুমি থাকবে না। মা বলছিল তুমি খুব ভালবাস--

কত কিছুই তো ভালবাসি, জোটে কই?—বৌদির দিকে ঘুরে বলে, দাও।

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে এক চুমুক গিলতে গিলতে বলে, তোমার ছাতাটা—

বাইরের ঘরে টেবিলের ওপর রেখেছি। —এক পলক বিকাশের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে নিয়ে বলে, কি ব্যাপার বল দেখি? যাচ্ছ কোথায়?

দেখি! কোথাও যাচ্ছি তো বটেই—

বিকাশের ভাব দেখে হেসে ফেলে মিনা। মিনা বিকাশের বৌদি, কিন্তু মাঝে মাঝে কি রকম ছেলেমানুষ হয়ে যায়। বলে, সে তো দেখছি। কিন্তু কোথায়?

তোমায় বলি, আর শেষে লাগাবে গিয়ে দাদার কানে, মায়ের কানে, বাবার কানে। ওরে ব্বাস—

চা-টা শেষ করে ঝট্‌ করে বেরিয়ে আসে বিকাশ। বাইরের ঘরের টেবিলের ওপর থেকে বৌদির ছাতাটা হাতে নিয়ে হন্‌হন্‌ করে ব্যালকনি ছাড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে টকাস্‌ টকাস্‌ জুতোর আওয়াজ করতে করতে। আর মনে মনে খুব একচোট হেসে নেয় বিকাশ। বৌদি এবার কি না কি ভেবে মরবে সারাদিন।

বৃষ্টি চলছেই। অদ্ভুত। ভাবলে বিকাশ। আকাশের এমন একখানা অবস্থা মাথায় করে শংকর ওরা শেষ পর্যন্ত বেরুবে কিনা এখন সে এক ভাবনা। সি. আই. টি.-র কেয়ার-টেকারের অফিসে ঢুকে কয়েকবার ডায়াল করে দেখলে। লাইন খারাপ। মনও খারাপ হয়ে যায় বিকাশের।

কি করবে এখন ?
যাক্ গে ! অতো ভেবে লাভ নেই। হন্ হন্ করে ছুটতে ছুটতে তিনের-এ বাস-স্ট্যাণ্ডের গুমটির নিচে এসে দাঁড়ায় বিকাশ। সব ফাঁকা। গুমটি ঘরের ভেতরে তিনজন নির্বাক মানুষ তাকিয়ে আছে ভাবলেশহীন। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখটা মুছে ফেলে। এদিক ওদিক তাকিয়ে বড় হতাশ হয়ে পড়ে। যেন কি রকম, একেবারে অচিনপুরী—কাঁকুড়গাছি, বাগমারী, ভি. আই. পি. রোড সব কী হয়ে গেছে ক'দিনের বাদলায়। এমন কি হাবুর স্টল, তারপর সারবন্দী এক লাইনে দাঁড়ানো ছোট ছোট দোকানপাট, তাও যেন অন্য রকম হয়ে গেছে, ডাইনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে মনে হল বিকাশের।
না এদিক, না ওদিক—কোন দিক থেকে কোন বাসের টিকিও দেখা যাচ্ছে না। কেবল একটা-দুটো প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি, ট্রাক যাচ্ছে-আসছে, রাস্তার খানা-গর্তের জল ছিটিয়ে তীব্র গতিতে তারা যেন ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইছে হালফিলের এই অবস্থা থেকে।
বাস চলছে ?—গুমটির ভেতরের লোক তিন জনের দিকে জিজ্ঞাসাটা ছুঁড়ে দিয়ে তাকিয়ে থাকল বিকাশ।
যাবেন কোথায় ?—একজন জানতে চাইলে।
সল্ট লেক।
পাবেন। চৌদ্দ নম্বর চলছে একটা-দুটো। সল্ট লেকের সাট্ল বাসও কিছুক্ষণ আগে গেছে মানিকতলার দিকে।
তা হলে দাঁড়ানো যায়। ভাবলে বিকাশ। এখানেই দাঁড়াবে, না ওপার গিয়ে ঠিক ঠিক স্টপেজে দাঁড়াবে। ওখানে দাঁড়াতে হলে ছাতাটা খুলতে হবে। কিন্তু খুলতে ইচ্ছা হয় না তার। এখন যে-রকম বৃষ্টি, তাতে ছাতাটা ভেজাবার খুব একটা দরকার পড়ে না। কিন্তু ঠাঁয় ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে হলে ভিজে যাবে। ছাতা হাতে নিয়ে ভেজার কোন মানে হয় না।
বিকাশ নড়ল না। তিনের-এ একটা এসে দাঁড়াল। পাঁচ-সাত জন যাত্রী নেমে তিড়বিড় করে দৌড়ে পালাল। চুয়াল্লিশ, ছেচাল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ —এরা প্রাইভেট বাস, বেপরোয়া। মনে হচ্ছে, তারাও আজ ঘায়েল। হবে না ? বিকাশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুমটির ভেতরের লোকগুলোর কথা-বার্তায় মন দিলে। এখন তারা ছ'জন। যে বাসটা এসে দাঁড়াল তার ড্রাইভার আর দু'জন কণ্ডাক্টার এসে ঢুকেছে ভেতরে। তারাই রাস্তা-ঘাটের খবর বলছে।
পথঘাট ডুবে একাকার সব। আর যদি ঘণ্টা দুয়েক এমনি চলে, সারা

দিনের মনে নিশ্চিন্তে ভেবে রাখতে পারো সব বন্ধ। সব অচল হয়ে যাবে। ওরা বলাবলি করছে, ড্যালহৌসি থেকে বৌবাজার-শেয়ালদা এখন সমুদ্র। নারকেলডাঙ্গা মেন রোড ছোটখাটো নদী। বেহালা? তিন হাত জমি পেরোতে না পেরোতে তিন মাইল জল। আর এদিকে?

বিকাশ জানে, ভি. আই. পি. রোডের ধারে কবরখানা থেকে উল্টাডাঙ্গা বাজার আর এদিকে রেল লাইনের ওপারে বাগমারী থেকে মুরারিপুকুরের বিস্তীর্ণ এলাকা এখন গলাজলে মগ্ন। জল? জল বলা যায় না। এই জলের তিনভাগ পচা-গলা নোংরা জঞ্জাল আর এক ভাগ জল। জলের অস্তিত্ব, জলের স্বভাব—যা মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, সে জলের কথা কে ভাববে কলকাতায়? এ জল দেখলে মানুষ বিষণ্ণ হয়, গা ঘিন্ ঘিন্ করে।

গুমটির ভেতরে একজন ফোনে কথা বলছে চিৎকার করে। বিকাশের কানে এল,

হ্যাঁ, হ্যাঁ! থ্রি-এ গুমটি বলছি। কে? চক্রবর্তী?....না। আটকে গেছে? কোথায়? বৌবাজার? কি করবো তবে?...ছাড়ব না? আচ্ছা।

ফোন রেখে অন্য তিন জনের দিকে তাকিয়ে বলে লোকটা, শেয়ালদা থেকে বলছে, বাস যেন না ছাড়ি। থাকুন বসে!

কথাগুলো কানে যেতেই বিকাশ সজাগ হল। তবে? তবে কি করবে সে এখন? বাগমারী বাজারের কাছে নিশ্চয় এখন ডুব-জল। বাস আর চলবে না। ...ন্না! ঐ আসছে—স্টেট বাস একটা। দেখল বিকাশ। কিন্তু সল্ট লেক যাবে কিনা কে জানে! তবু টপ্‌কে টপ্‌কে ভি. আই. পি. রোডের ওপরে গিয়ে দাঁড়াল।

বিকাশ একা নয়, আরো ছ-সাতজন ছিট্‌কে-ছুট্‌কে এসে জড়ো হল। কোথায় ছিল এরা এতক্ষণ? মনেই হয় নি যে কাছেপিঠে আর কেউ আছে।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির বিরাম নেই। বিকাশ ছাতাটা খুলল না। বাসটা যদি সল্ট লেকগামী হয়, খুলতে হবে না এখন। হাঁ, সল্ট লেক! মোড় ঘুরে দাঁড়াল এসে বাস। ছুটছাট উঠে পড়ল দু'-তিন জন। ভেতরে জনা দশেক বসে। এমন ফাঁকা বাস কোন দিন দেখে নি বিকাশ। অদ্ভুত লাগে।

সব পেছনের সিটের মাঝখানটায় আলগা হয়ে বসে বিকাশ। বাস ছেড়ে দিয়েছে। স্পিড বেশি। কবরখানা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কতক্ষণ আর? মিনিট পনেরোর মধ্যে গিয়ে পৌঁছবে।

আরে ব্বাস! জল? এখন জলে পড়েছে বাস। ডাইনে-বাঁয়ে জলের পাখনা

ছড়িছে ছুটছে। ছুটছে নয়, ছোটার চেষ্টা করছে। যত এগোচ্ছে তত চাকা ডুবছে, তত গতি কমছে। বিকাশ হতাশ হল। ভেবেছিল কতক্ষণ আর! কিন্তু এভাবে চলতে থাকলে সল্ট লেকের সীমানা ছুঁতেই আধ-ঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিট চলে যাবে।

এখন ঠিক ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে, না বেরুলেই হত। কিন্তু শংকর ওরা? কি ভাববে, সে একটা চিন্তা। তার চেয়েও বড় কথা, তার নিজের তাগিদ। কথা আছে, শংকর তার বাবার কাছে বিকাশের হয়ে উমেদারী করবে। যদি কিছু হয়! হতে পারে। শংকরের বাবা বিড়লার কি এক ইণ্ডাস্ট্রির ডাইরেক্টর। ইচ্ছা করলেই একটা ভাল চাকরি করে দিতে পারে। শংকর বলে, আমার জন্যে বাবা কিছু করবে না। বলে, লেখাপড়া শিখিয়েছি। এবার নিজে নিজের পথ কেটে নাও। তোর কথা অবশ্য আলাদা।

বিকাশ বলেছিল, তুই কি করবি তবে?

ভাবছি।

ভাবছিস তো কয়েক বছর। তোর বাবা কিছু বলে না?

কি বলবে?

কিছু করছিস না, বেকার সময় কাটাচ্ছিস—

ধুস্! বাবার ওসব ভাবার সময় কই? বাবা তার নিজের উন্নতি মান-মর্যাদা নিয়ে ব্যস্ত। মা বলে। মা মাঝে মাঝে খোঁচা দেয়। আর কথা শোনায় দিদি। বলে, ধেড়ি হয়েছিস, করবি তো একটা কিছু।

তোর দিদি কি করে?

কলেজের লেক্চারার।

মেয়েদের কলেজ?

হ্যাঁ, হোম সায়েন্স পড়ায়। মজার কথা হল, দিদি কিন্তু পুরোপুরি মেমসাহেব। কুটোগাছটা হাতে তুলে ফেলতে জানে না।

তবে পড়ায় কি করে!

বই পড়ে।

এসব শুনে বিকাশের অবশ্য কিছুই মনে হয় নি। শংকরের দিদি বা শংকরের মত আরো দু'চারজনের কথা জানে বিকাশ। তাদের অন্য ভাবনা নেই। মাথার ওপরে ছাতা ধরে আছে বাবা বা দাদা বা বিষয়-সম্পত্তি বা এমন কিছু, যার জন্যে তাদের আর কাকতাড়ুয়া হয়ে ফিরতে হয় না। বিকাশ শংকরের বাবাকে দেখেছে দু'একবার। আলাপ-পরিচয় হয় নি। ভদ্রলোক কি রকম ভাবলেশহীন গম্ভীর। শংকর অবশ্য অন্য কথা বলে। বলে, না রে! বাবা মোটেই গম্ভীর নয়, খুব আমুদে। হো

হো করে হাসে, মজার মজার কথা বলে। বোঝাই যায় না যে ইন্ডাস্ট্রি লাইনের লোক।
কে জানে! হবে বা। সে ভরসাতেই বিকাশ আজ ছুটছে। বলা যায় না, কিছু একটা হয়ে যেতেও পারে। শংকরের মা, বাবা, দিদি মায় বাড়ির চাকর, শংকর বলেছে, দিদির ফিয়াঁসে অবধি আজ আসবে তাদের সল্ট লেকের বাড়িতে। উদ্দেশ্য, কিছুক্ষণ খোসগল্প এবং আহারাদি এবং নিরুদ্বেগ সময় যাপন। প্রস্তাবটা শংকরের বাবা দত্তসাহেবের। প্রধান সমর্থক শংকর আর তার দিদি এষা। বিকাশ ঠিক জানে না শংকরদের এই পারিবারিক দিন যাপনের মধ্যে তার আমন্ত্রণ কেন। এষার ফিয়াঁসের আমন্ত্রণের মানে হয়, কিন্তু বিকাশ? শংকর বলেছে, হয়েছে কি? আয়, বাবার সঙ্গে ভাল করে আলাপ-পরিচয় কর। তারপর আমি বুঝব।
অর্থাৎ, বিকাশ ধরে নিয়েছে, শংকর চায়, দত্তসাহেক বিকাশকে চিনুক এবং তার জন্য একটা কিছু যদি করে দেয়।—এ ধারণাটাই তার কাছে মুখ্য। এ ধারণার বশেই আজ, এমন দিনে সবকিছু তুচ্ছ করে ছুটছে সল্ট লেকে। কিন্তু বাসটা ক্রমশ যেভাবে জলের মধ্যে স্পীড কমাতে শুরু করেছে—বিকাশের ভয়, বলা যায় কি, এও একটা রূপক, একটা রহস্য। তার কল্পনাটা শেষ পর্যন্ত হয়তো জলেই যাবে।

ছয়

বৃষ্টিটা শুধু বালিগঞ্জে হলে কথা ছিল। তা তো নয়, বাংলা, মায় বিহার-উড়িষ্যা জুড়ে দাপট চলছে সমানে। মানুষ বেরোয় এর মাঝে?—বলে, গম্ভীর মেজাজে উঠে গেল শংকরের বাবা শিববাবু। শিবকালী দত্ত।
শংকর নেতিয়ে পড়ল তাদেব বসাব ঘবের শোফাতে। আর দীপক—শংকরের দিদির ফিয়াঁসে, কি যেন ভেবে এতটুকু হয়ে গেল ভেতরে ভেতরে। অথচ এখনই তো বেরিয়েও যাওয়া যায় না।
শংকর বললে, তোমরা না যাও, আমাকে যেতে হবে। বিকাশ যাবে, তনুদিকে বলেছি—
দীপক তনুকে চেনে না। জানতে চাইলে, তনুদি! কে?
তুমি চিনবে না, দিদির বন্ধু।—শংকর বলে।
ওরা বেরুবে এর মধ্যে?
কথা আছে যখন বেরুবেই। আমিই তো তাদের বলেছি। দায় আমার—কেমন একটা অভিমানের স্বর শংকরের গলায়।

সেই মুহূর্তে শংকরের দিদি এষা কল কল করে এসে ঘরে ঢুকল। দীপককে দেখে আটখানা। বললে, তুমি এসেছ ? কী বিষ্টি ! ভাবলুম, কী জানি বাবা, হয়তো ফোনে দুঃখ জানিয়ে টানা ঘুম দেবে সারা দিন।
দীপক বললে, এসে লাভ হল না, প্রোগ্রাম বাতিল।
কেন ?
শংকর বলে, বাবার ইচ্ছা।
বাবা যাবে না ?
না।
মা ?
জানি না।
আমরা যাবো !
এবার দীপক বলে, দূর, তাই হয় নাকি ? তোমার বাবা যেখানে—
দাঁড়াও, আমি দেখছি।—এষা বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।
শংকর আর দীপক মুখোমুখী বসে চুপচাপ। জানালা দিয়ে দু'জনেই আকাশ দেখছে। কিন্তু দু'জনের আকাশ এখন দু'রকম। শংকর গাল পাড়ছে বেদম, মনে মনে, শালার ওয়েদারকে। আর দীপক আরামে গা এলিয়ে ভাবছে, যাক গে সল্ট লেক। এমন দিনে কিছুক্ষণ এষাকে কাছে পাওয়ার একটা সুযোগ প্রায় হাতের মুঠোয়। ফসকে না যায়।
এষা এল মনমরা হয়ে। মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল শংকর। বললে, দেখলি তো ?
তোরা যেতে পারিস, বাবা বলল।
তোমরা কেউ যাবে না—কি ভাববে তনুদি ! বিকাশের কথা না হয় নাই ধরলাম।
তনু বেরুবে তুই ভেবেছিস ? এর মধ্যে কোন মেয়ে বেরুতে পারে একা ?
তোর বন্ধু, সে তুই বুঝবি ভাল। আমার বন্ধু বিকাশ কিন্তু যাবেই। ও কথার খেলাপ করে না।
দীপক এষার মতপরিবর্তনটা লক্ষ্য করে খুশি হল। বললে, কি আর করা যাবে ! এমন অবস্থা দাঁড়াবে সে তো জানা ছিল না কারো !
বাবাও তাই বললে।—এষা একটা শোফাতে বসে পড়ে।
ভাবটা এমন দেখাচ্ছিলি, যেন বাবাকে নিয়ে বেরিয়ে আমাদের ডাকবি, আয়। এখন দেখছি তুইও বাবার দলে। যাক্ গে। আমি বেরুব—
অন্যমনস্ক হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় শংকর। গাড়িটা নেবে কিনা ভাবলে। এই জল-ঝড়ে গাড়ি নিয়ে বিপদে পড়তে হতে পারে।

অস্বস্তি এবং স্বস্তি দুটোই একসঙ্গে লেগে দীপককে কিছুটা চঞ্চল করলেও মুখে একটুকরো হাসি টেনে বলে, আমিও আসবো নাকি তোমার সঙ্গে ?
যেতে যেতে বললে শংকর, তুমি যাবে কেন ?
আসলে শংকর এখন চাইছে না দীপক তার সঙ্গে থাক। দীপক হয়তো পুরো ব্যাপারটা জানেই না। সব ভেবে এত খারাপ লাগছে এখন ! অবশ্য না-ও যেতে পারে তনুদি। কিন্তু বিকাশ ? এর মধ্যে বেরুবে ? এমন ঝড়-বাদলা দেখে ভাবতেও পারে যে কেউ যাবে না ! তবু শংকরের কেমন লাগে। যদি ওরা যায়—তারপর ? কথাটা মনে হতেই শংকর এক নিমেষ ভেবে নিলে কি করবে ! বেশি কিছু টাকা সঙ্গে নেওয়া ভালো। তার কাছে যা আছে তাতে হয়তো কুলাবে না।
শংকর ফিরে এল। দরজায় দাঁড়িয়ে এষাকে ডাকলে, দিদি, শোন !
এষা বললে, ফিরে এলি যে !
শোন্ না তাড়াতাড়ি !—শংকর তাড়া দেয়।
এষা সামনে এসে বলে, কি, বল।
একশোটা টাকা দে।
একশো টাকা ! কেন ?
আমি সল্ট লেকে যাচ্ছি। যদি ওরা এসে থাকে, দরকার হবে। দুপুরে ওদের খাওয়ার কথা—
তুই খাবার নিয়ে যাবি ?
তা কেন ? টাকা সঙ্গে থাকবে। দরকার হলে—
এষা খুব তাড়াতাড়ি করেই টাকাটা এনে দিলে।
বেরিয়ে এসে শংকর বুঝলে, বেরিয়ে না আসাই ভাল ছিল। বাবা ঠিকই বলেছে। কিন্তু এখন ফিরেও যাওয়া যায় না। দীপক হাসবে মনে মনে, দিদি চালাবে যুৎসই কথার খোঁচা। বাস স্টপে এসে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। পাত্তা নেই বাসের। গড়িয়াহাটার মোড় থেকে সল্ট লেকে যাবার একমাত্র বাস পঁয়তাল্লিশ নম্বর। না যাচ্ছে, না আসছে একটা। লোকজনও তেমন নেই পথে। শংকর এখন কি করবে বুঝে উঠতে পারলে না। জামা-প্যান্ট প্রায় সবটাই যখন ভিজে গেল, তখন বুঝলে শংকর, একটা ঝড়ো হাওয়ার দাপট চলছে—সে সবকিছুই যেন তছ্‌নছ্‌ করে ছিঁড়ে-ছিটিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাইছে। কিন্তু বাড়ি ফেরা যাবে না এখন। মনে মনে একটা সিদ্ধান্তে এসে স্থির হল শংকর। অন্তত বিকেলের আগে ফিরবে না সে।

ক'দিন বাদে রাতে বাড়ি ফিরে বিকাশ শুনলে শংকর এসেছিল বিকেলে। বার বার করে বলে গেছে যেতে। খেতে বসে শুনছিল সব। বৌদি বলছিল,

ভয় নেই! তোমার বন্ধুকে চা-মিষ্টি খাইয়ে দিয়েছি। নিন্দে করবে না।

বিকাশ বললে, আর কিছু বললে শংকর?

কি বলবে আর? তোমাকে যেতে বললে।

আমাদের বাড়ি চিনলে কি করে?

কেন? তুমি বলো নি ঠিকানা?

কি জানি!

বিকাশ ঠিক জানে, শংকরকে সে তাদের ঠিকানা বলে নি কখনো। কেবল বলেছে, কাঁকুড়গাছি সি. আই. টি. বিল্ডিং-এ থাকে তারা। এটুকুন জেনে কেউ এসে খুঁজে বার করবে এটা ভাবা যায় না। বিশেষ করে শংকর। কিন্তু শংকরের নামটা মনে এলেই বিকাশের এখন মেজাজটা কি রকম হয়ে যায়। বিকাশ যাবে আর শংকরের খোঁজে? শংকর খুঁজে বেড়াক সারা জীবন বিকাশকে। পাবে না।

বৌদি বললে, তোমার বন্ধুটি খুব বড়লোক বুঝি?

বিকাশ এক পলক বৌদির মুখে চোখ ফেলে বললে, হুঁ! কেন?

গাড়ি করে এসেছিল।—আলগোছে কথাটা রাখলে বৌদি। বললে, ড্রাইভার নয়, নিজেই চালিয়ে—

মনে মনে বললে বিকাশ, শুয়োর! বৌদিকে বললে, ওর বাবার গাড়ি, ও ড্রাইভ জানে।

ওর বাবাকে ধরে একটা চাকরি-বাকরি দেখ না।

হাসি পেল বিকাশের। হাসলেও। বিকাশকে তার বৌদি বুদ্ধি দেবে, সেই বুদ্ধি নিয়ে চলবে! বিকাশ যেন কোন দিন ভাবে না কিছু। বললে, তুমি তো বলতে পারতে শংকরকে!

এবার বৌদিও হাসে। বললে, যাঃ! তা হয় নাকি!

কেন হবে না! আমার চাকরির জন্যে আমার চেয়ে তোমাদের মাথাব্যথা বেশি যখন—

খাওয়া হয়ে গেছিল। কথাটা শেষ না করে জলের গেলাশ টেনে এক চুমুকে জলটা শেষ করে উঠে পড়ল বিকাশ। আর তাকালেও না বৌদির দিকে। ঝট্‌পট্ বাথরুমে ঢুকে হাত-মুখ ধুয়ে বাইরের ঘরে তার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লে চাদর মুড়ি দিয়ে।

বৌদি নির্ঘাৎ রাগ করবে। কেননা বিকাশ জানে, তার কথাগুলো

ভাল মনে নেবে না বৌদি। তা' না নিক। কাল সুযোগ বুঝে বৌদির রাগ ভাঙানো যাবে। কিন্তু তার নিজের রাগ? ঠিক রাগ নয়, উষ্ণ একটা যন্ত্রণা। শংকর গাড়ি নিয়ে এসেছিল জেনে সে যন্ত্রণা ভেতর থেকে বাইরেও ছড়িয়ে পড়তে চাইছে।

রাত হয়েছে। রান্নাঘরে এখন মা, বৌদি, আর দুই বোন রমা, উমা। এঁটো বাসন মাজবে, রান্নাঘরের মেঝে ধোবে। ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে অনুচ্চ কথাবার্তা, তর্কবিতর্ক, হাসি-ঠাট্টা—রোজই শোনা যায়। আজও কানে আসার কথা। কিন্তু আসছে না। ভেতরের ঘরে কেবল বাবার অস্তিত্ব—থেকে থেকে কাশির আওয়াজ। বোঝা যাচ্ছে বাবা ঘুমোয় নি। দাদা মেঝেতে বোনেদের বিছানায় এতক্ষণে এক ঘুম সেরে নিয়েছে নিশ্চয়। রোজই নেয়। তারপর রান্নাঘরের পাট চুকে গেলে বৌদি সেখানে বিছানা পাতবে। মা দাদাকে ঠেলে তুলে বলবে, যা, বিছানা হয়ে গেছে।

কিন্তু আজ কেমন একটা ব্যতিক্রম লাগছে। শুয়ে শুয়ে ভাবছিল বিকাশ। রান্নাঘরের সময় বড় নীরবে অতিক্রম করছে যেন মা, বৌদি, রমা, উমা।

থাক গে! পাশ ফিরে শুলে বিকাশ। ছোট ভাই দু'জন উজ্জ্বল আর মণি কুঁকরে শুয়ে আছে বিছানার এক প্রান্তে। ঘুমিয়ে পড়েছে কখন কে জানে?

চট্ করে ঘুম লাগে না কোন দিন বিকাশের। আজ তো লাগবেই না। বার বার শংকরের ব্যবহারটা মনে আসছে। এমন অভদ্রতা মানুষে করে? পুরো প্ল্যানটা শংকরের পরামর্শ মতো। আর সে-ই কিনা ঝড়-জল বলে ফুট কাটলে। এদিকে বিকাশ কি করলে সে খবরটা নেবার কথা মনে পড়ল চার দিন পর! রবিবারের ঘটনা। আর আজ শুক্রবার। বিকাশ অবশ্য ভেবেছিল শংকর নিশ্চয় তার পরদিনই যোগাযোগ করবে। পরদিন গেল, তারও পরের দিন গেল। কাজেই বিকাশের ক্ষোভটা যন্ত্রণা হয়ে উঠল। যন্ত্রণাটার কারণ অবশ্য মিশ্র। বিকাশের কি রকম একটা ধারণা হয়েছিল, এবার নিশ্চয় একটা কাজ-কর্মের সন্ধান পেয়ে যাবে। শংকরের বাবা দত্ত-সাহেব একটা হিল্লে করে দেবেন। অন্ততঃ শংকর সে ইঙ্গিত দিয়েছিল। তার যন্ত্রণার এটাই প্রধান অংশ। আর এই যন্ত্রণার সঙ্গে যে বিষয়টা মারাত্মক জ্বালা ধরাচ্ছে সেটা হল মর্যাদা। শংকর ভেবেছে কি? গাড়ি করে বাড়ি এসে ইনিয়ে বিনিয়ে বুঝিয়ে গেলেই বুঝবে সব বিকাশ? তা হয় নাকি? সারাটা দিন ঠায় উপোশ করতে হয়েছে তাকে। বাড়ি ফিরে লজ্জায় বলতে পারে নি

কাউকে কিছু। লজ্জাটা বন্ধুত্বের, ঘনিষ্ঠতার, সান্নিধ্যের। বড় গলায় শংকরের নামটা সে বরাবর ঘোষণা করে এসেছে সকলের কাছে। আর সেই শংকর যেচে সেধে বলে বেপাত্তা। এখন অবশ্য আগাগোড়া সব দেখলে বিকাশের নিজের বুদ্ধি-শুদ্ধির কথা ভেবে নিজেরই হাসি পায়। কিন্তু সে যদি শংকর হত, কি করতো ? যে করেই হোক আসতো সে। যত অসুবিধা থাক, যত বাধা পড়ুক, সময়মত সে আসতোই।
শংকর এখানে চলে আসবে ভাবে নি বিকাশ। ভেবেছিল, কফিহাউস বা টেমার লেন-এর 'হালচাল' পত্রিকার আড্ডায় খোঁজ নেবে। এ ক'দিন রোজ এ দু'জায়গায় গিয়েছে সে। খবর নিয়েছে শংকর এসেছে কিনা। আসে নি। সে কারণেই মাথার ভেতর একটা ঘুণ পোকা রী রী শব্দে যন্ত্রণা তীব্র করে তুলেছে। শংকরের গাড়ি নিয়ে সোজা বাড়িতে চলে আসাটা বিকাশের মোটেই স্বাভাবিক মনে হয় না, ভাল তো লাগেই না।
অস্বাভাবিক। কেবলই অস্বাভাবিক ধাক্কা।
সেদিন বাস থেকে নেমে ভিজতে ভিজতে শংকরদের সল্ট লেকের নতুন বাড়ির দাওয়ায় উঠেও ভাবে নি বিকাশ, ওরা কেউ আসবে না। কেননা, বাড়ির সামনের চত্বরে তখন একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। বিকাশ ভেবেছে শংকরদের গাড়ি। বারান্দায় উঠে যেতেই যে এগিয়ে এল, তাকে চেনে না বিকাশ। পরে জেনেছে সে-ই শংকরের দিদির বন্ধু তনিমা। শংকরের মুখে নাম শুনেছিল, দেখা এই প্রথম। তনিমাই তাকে জিজ্ঞেস করলে, এষা ওরা সব কোথায় ?
বিকাশ অবাক হয়েছিল। কথার ধরনটা এমন যেন তাকে কত চেনে এই মহিলা। আমতা আমতা করে জানতে চেয়েছে, আসে নি ওরা কেউ ?
ওঃ! আপনি শংকরের বন্ধু নিশ্চয়! আমি ভেবেছি ওরাও এসেছে। ভেতরে আসুন।—বলে, দরজা ছেড়ে দাঁড়িয়েছে তনিমা।
বিকাশ ভেতরে গেল বটে কিন্তু মনে মনে ভীষণ দমে গেল। ওরা কেউ এখনও আসে নি, কখন আসবে কে জানে!
তনিমা বললে, ওরা আসবে তো ?
বিকাশ একটু হেসে বললে, সে কথা আমিও ভাবছি।
ঘরটা সাজানো নয়, মেঝের মাঝখানে একটা বড় নীচুমত চৌকো টেবিল। তার দুপাশে সোফা। দেয়ালে ছবি নেই। কিন্তু ছবি টাঙানোর হুক চোখ ফুটিয়ে দিচ্ছে। সবে রঙ করা হয়েছে। বাসোপযোগী করার একটা উদ্যোগের ছাপ ঘরটাতে।
বিকাশ একটা সোফাতে বসে পড়লে। তার তখন প্রশ্ন, একা এই মহিলা এলেন কি করে ? অথচ কথাটা জিজ্ঞেস করতে বাধে। এখন এছাড়া

আর কি-ই বা বলা যায়। কিছুটা ভেবে বলেই ফেললে কথাটা। তনিমা ওপাশের সোফাতে বসেছে তখন। মুখোমুখী তারা। মাঝখানে চৌকো টেবিলটার ব্যবধান।
তনিমা বললে, গাড়ি থাকলে আবার অসুবিধা কি? আমি ড্রাইভিং জানি।
আপনার গাড়ি ওটা?
হ্যাঁ! কেন?
আমি ঠিক কিছু ভাবি নি! মনে হয়েছিল ওটা শংকরদের—
ওঃ! কেন, গাড়ি থাকতে নেই আমার?
তা কেন? আপনি একা এই ঝড়জলে গাড়ি চালিয়ে আসবেন ভাবা যায় না।
তবেই বুঝুন। আপনারা অনেক কিছুই ভাবতে শেখেন নি এখনও।
তনিমার জবাবে বিকাশের আড় আড় ভাবটা কেটে গেল। বললে, অভাবনীয় কিছু করার দিকে আপনার বুঝি খুব ঝোঁক।
না! তা হবে না কেন? তবে আমাদের মত বয়সের মেয়েরা যা ভাবে করে না, আমার তাই করতে ভাল লাগে।
কি রকম?
এই তো দেখছেন। এই ঝড়জল মাথায় করে আমার বয়সের কোন্ মেয়ে এমন একা নির্জনে চলে আসতে ভরসা পাবে বলুন! তারপর এতক্ষণ ধরে একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে—
মাঝপথে থামতে হল তনিমাকে। শিউশরণ এসে দাঁড়িয়েছে। বিকাশ ভ্রূ কুঁচকে তাকালে লোকটার দিকে। তনিমা বললে, শিউশরণজী! কি করি বল তো এখন।
হাম তো কুছু বুঝতে পারছে না দিদি।—সবিনয়ে বলে শিউশরণ, আপনারা যদি বলেন, হামি রোটি পাকাই, আলুকে চোখা বানাই---
তনিমা হেসে ফেলে। বলে, না বাবা! তোমার আর কষ্ট করে দরকার নেই। আমরা আর আধঘণ্টা দেখব, কি বলেন?
তনিমার সিদ্ধান্তটা তাকে ভয়ানক বিষণ্ণ করে তোলে। শেষ পর্যন্ত ওরা তবে আসবেই না? বিষণ্ণতা চেপে তনিমার কথাতেই সায় দিতে হয় তাকে।
শিউশরণ বললে, আপনারা যাবার আগে ডাকবেন। হামি ভেতরে আছি।
শিউশরণ ভেতরে চলে গেল। তনিমা বললে, বাড়িটা এখন এর হেফাজতে। পরশু দিন দত্তসাহেব এসে একে বলে গেছেন সব। বেচারা

তার সাধ্যমত সব আয়োজন করে রেখেছে।
অত খবর জানলেন কি করে?
কেন? আপনার অনেক আগে আমি এসেছি। বাড়ি খুঁজতে হয় নি, আরো একবার আমি আর এষা বেড়াতে বেড়াতে এসেছিলাম এখানে। সোজা বাড়ির দরজায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে এসে দেখি দরজা বন্ধ। কড়া নাড়তে হয়েছে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর ভেতর থেকে শিউশরণজীর আবির্ভাব। প্রথমটায় একটু ধাক্কা খেয়েছি ঠিকই। আমি ভেবেছিলাম এষা বা মাসী—এষার মাকেই দেখব। এমন দিনে কন্ট্রাস্টটা কল্পনা করুন।
খিল খিল করে হেসে উঠল তনিমা। খুব একটা হাসির ব্যাপার কিনা বুঝলে না বিকাশ। অনুমান করলে, অগত্যা শিউশরণজীর সঙ্গেই কথোপকথনে সময় পার হচ্ছিল তনিমার।
এসব কথা ভাবতে ভাবতে বিকাশের হয়তো কিছু ঘোর লেগে এসেছিল। তা কেটে গেল ভেতরের ঘরে দাদার হুমকিতে। রমাকে ধমকে দিলে দাদা, যা, তোরা শো গে। বিরক্ত করবি না। বোঝা গেল দাদা-বৌদিতে কিছু একটা হয়েছে। কি হবে, কি হতে পারে! এ ধরনের ভাবতে গিয়ে এগোতে পারে না বিকাশ। বাবা উঠে বসেছে মনে হয়। বলছে, কি শুরু করলি তোরা। ঘুমোতে দিবি!
এবার ঠিক উঠে যাবে দাদা, ভেবেছিল বিকাশ। কিন্তু না, দাদার দিক থেকে না উঠে যাওয়া, না হুঁ হাঁ কোন সাড়া। বাবা বিরক্ত। রমা আর উমাকে বললে, তোরা বৌদির কাছে ঘুমো গে যা। যার যা খুশি করে চলেছ তোমরা সব—
বাবা এবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়বে, বুঝলে বিকাশ। কিন্তু তার ঐ শেষের কথাগুলো, কোথায় যেন লাগে, বড্ড লাগে। গা ঝাড়া দিয়ে কিছুতেই ফেলা যায় না। অন্য সব কিছু বিকাশ পারে মুহূর্তে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে। কিন্তু ক্বচিৎ-কদাচিৎ বাবার এ ধারার ক্ষোভের সংক্ষিপ্ত শব্দ-গুলোকে কিছুতেই কিছু না বলে উড়িয়ে দিতে পারে না। কি করা যাবে? ব্যাপারটা কি জানতে একবার উঠে যাওয়া যায়, কিন্তু ওদিকে আর সাড়াশব্দ উঠছে না। কিছুটা পরে আলো নিবে গেল। ঘুমের রেশটা কেটে যাচ্ছে বিকাশের। এমনিতেই ঘুম আসে না। তার ওপর এসব বিতিকিচ্ছিরি বিষয়-আশয় মাথায় ঢুকলে সাবানের ফেনার মত একটা মিলিয়ে যায় তো দশটা ফুলে-ফেঁপে ওঠে।

আট

সকালে ঘুম ভাঙার পর মনে পড়ে বিকাশের, অনেক রাত অবধি জেগে ছিল। আলতু-ফালতু কথা সব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুম এসেছিল কে জানে। এখন ঘুম ভাঙার পর তাকিয়ে দেখে সবে ফর্সা হয়ে এসেছে, রোদ ওঠে নি এখনও। কবে সে জেগেছে এত ভোরে? এত শীগ্‌গির জেগে ওঠার কথা নয় তার। সাতটা সাড়ে-সাতটার আগে বিছানা ছেড়েছে কোন্ দিন সকালে, মনে পড়ে না। আর আজ—অতো রাত্তির অবধি জেগে থাকার পরও—হ্যাঁ, দু'টো তো হবেই, এখন সাড়ে-পাঁচে জেগে গেল বিকাশ! এখন কি করবে? চোখ বুজে পড়ে থাকবে? বাথরুমে জলের শব্দ। নিশ্চয় বাবা। বাবার আগে কেউ ওঠে না। দাদা উঠবে চা হয়ে গেলে। বাবা আর দাদার মাঝামাঝি সময়ে মা, বৌদি, রমা, উমা তারপর উজ্জ্বল আর মণি উঠবে একে একে। এদের কেউ না উঠলে বড়ো যে আগে উঠেছে সে এসে ডাকবে, ঠেলবে, তুলে দেবে। কিন্তু বিকাশকে কেউ ডাকবে না, ঠেলবে না। পারৎপক্ষে তার ধার মাড়াবে না কেউ। বড়জোর বৌদি এক ফাঁকে এসে হেঁকে বলবে হয়তো, ঠাকুরপো, আর দেরি করলে চা পাবে না কিন্তু! ওঠো!—এটা বৌদির নিজেরই তাগিদ, বিকাশকে চা দেবার করুণা নয়। কেননা, বাবা আর দাদার অফিসের তাড়া। সাড়ে ন'টার মধ্যে রান্না শেষ না হলে বিপদ। চায়ের জন্যে অফিসের রান্নার দেরি কে সইবে? তার নিজের অফিস থাকলে সেও সইতো না।

কিন্তু না, বাথরুম থেকে বেরুলে দাদা। বিকাশ অবাক। একা সে নয়, দাদাও আজ জেগেছে কাকভোরে! তবে সত্যি সত্যি দাদা-বৌদি কাল এক বিছানায় শোয় নি। তা হলে রান্নাঘরে বিছানা ছেড়ে শোবার ঘরের মেঝেতে মায়ের বিছানায় শুয়ে আর এক ঘুম লাগাতো এতক্ষণে। রোজ তাই করে। বাবার ওঠার সাড়া পেয়েই দাদা উঠে আসে বৌদির পাশ থেকে। ততক্ষণে মা উঠে যায়। মায়ের বিছানায় শুয়ে পড়ে দাদা। আর ওদিকে রান্নাঘরের বিছানাটা তড়িঘড়ি তুলে ফেলে বৌদি। বিকাশ আর পড়ে থাকতে পারলে না বিছানায়। ব্যাপারটা কি দেখা দরকার।

উঠে সোজা বাইরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায় বিকাশ। ঘুম ভাঙার দৃশ্য চারদিকে। আকাশ ফর্সা হতে হতে কি রকম হয়ে যাচ্ছে চারদিক। সব চেনা, সব সেই গতানুগতিক। সূর্যটা যদি একদিন ভেঙে গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তবে কোথায় কে? কেউ আর কারো নয়। কিন্তু তার

আগে, বেঁচে থাকলে বা বেঁচে থাকতে হলে নিত্য-নিয়মিত বিবিধ জ্বালা-যন্ত্রণাময় বিশাল এই সংসারটি তোমাকে কুরে কুরে খাবেই। কে রোধ করবে ?
তোর শরীর খারাপ করেছে ?—মায়ের গলা। একেবারে পাশে। লক্ষ্য করে নি বিকাশ, মা এসে দাঁড়িয়েছে। বুঝলে, সাত-সাড়ে-সাতে যার জাগরণ, সে এই সাত সকালে জেগে তাবৎ সংসারের দিকে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে থাকলে মায়ের প্রাণে শংকা লাগবেই। তাই মাকে নিশ্চিন্ত করতেই বলে বিকাশ, রাতে ঘুম হয় নি ভাল—
মা বলে, কাল আমারও ঘুম হয় নি। তোর বাবাও ঘুমোয় নি বোধ হয়। এখন ঘুমোচ্ছে।
কি হয়েছিল কাল ?
কি আবার হবে ! বৌমার সঙ্গে খোকার ঝগড়া।
কেন ?
কি জানি ! রমাকে জিজ্ঞেস কর।
মা চলে গেল ভেতরে। বিকাশ বুঝলে, মা জানে কিন্তু বলবে না। ঐ স্বভাব মা'র। সব বোঝে, সব জানে, কিছু বলে না। অভিযোগ না, অনুযোগ না, সুখ না, দুঃখ না—কোন কিছু নিয়েই মা'র কোন মত নেই, বক্তব্য নেই, প্রকাশ নেই। মা'র এই স্বভাবটা একেক সময় বড় খারাপ লাগে। আবার একেক সময় অবাক করে দেয়—মনে হয়, কি করে সয়, কি করে পারে ?
বিকাশ ভেতরে চলে এল। সামনেই বৌদিকে পেয়ে জিজ্ঞেস করলে, দাদার সঙ্গে ঝগড়া করেছ কেন ?
তোমার দাদাকেই জিজ্ঞেস করো—
পাশ কেটে বাথরুমে ঢুকে গেল বৌদি। বিকাশ হাসলে মনে মনে। নয়া দম্পতির একটু ঝগড়া-টগড়া নাকি স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ। বাবা বুড়িয়ে গেছে বলে অত আফশোস-আস্ফালন। বাবাও বোধ হয় তত বোঝে না কিছু।
রমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, মেজদা, তুই দুধটা নিয়ে আয় না। রোজ দাদা আনে—
আজ কি হল ?
কি আবার হবে ! তুই তো একদিনও আনতে পারিস !
দুধের বোতল, কার্ড সব দে—
গায়ে জামা চাপিয়ে বিকাশ তৈরি হয়ে নিলে। রমার কথার ধরনটা বড় লেগেছে তার মনে। সত্যি, সে বাড়ির কোন কাজকর্মে থাকে না কখনো।

তবে দুধ আনাটা একটা কাজের পর্যায়ে পড়ে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু না, দুধের লাইনে দাঁড়িয়ে মনে হল, তার ধারণা ঠিক নয়। দুধ তুলে নেওয়াও একটা কাজ বটে, কেননা, আধ ঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে সরকারী দুধের বোতল হাতে পাওয়া সত্যি বিচিত্র! অবশ্য এ দৃশ্য সে প্রায়ই দেখতে পায়। কিন্তু যেহেতু সে দর্শক, সে কেবল ছবি দেখেছে। ছবিটির মর্মান্তিকতা বোঝে নি। আশ্চর্য ব্যাপার! লাইন আর এগোতে চায় না যেন। মনে হয়, অনন্তকাল ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে বুঝি।

যা হোক তা হোক করে দুধটা শেষ পর্যন্ত তুলে নিয়ে এল বিকাশ। নিহাল সিং তার কিছুটা আগে দাঁড়িয়েছিল লাইনে। বিকাশকে দেখে কার্ড আর বোতলটা নিয়ে নিলে, তাতে অন্তত পনের মিনিট সাশ্রয় হল। কিন্তু কায়দাটা ঠিক নয়, ভাবছিল বিকাশ। তবু, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা— তাও তো ভয়ানক ব্যাপার। নিহালই ঠিক বলেছে, দূর দূর! অতো ভাবলে চলে নাকি? কাজটা হাঁসিল হল, ব্যস!

নিহালের বাক্য শুনতে মন্দ লাগে নি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তা বড় অসার ঠেকে। বাড়ি ফিরে এলে উমা যখন বললে, 'খুব তাড়াতাড়ি এলি তো! আজ তো খোলা দুধ, দেরি হবার কথা।' তখন কি রকম ছোট ছোট মনে হতে থাকে নিজেকে। কোথায় একটা সূক্ষ্ম হেরফের। অতশত মনে রেখে চলা যায় না ঠিক। কিন্তু মনে লাগেও যে।

যাগ গে! এখন চা খেয়ে বেরুতে পারলে বাঁচে। অন্ততঃ বাবা আর দাদার উপস্থিতিতে নিজের অস্তিত্বটা অস্বস্তিকর ঠেকে তার নিজের কাছে। কিন্তু চা দেবে কে? বৌদি বোধ হয় আজ চায়ের পাটে নেই। উনুনে ভাত টকবগ করছে। ঐ ভাত নামবে তারপর চা—তা আর অনুমান করতে অসুবিধে নেই।

একটুক্ষণ ভেবে বেরিয়ে পড়ল বিকাশ। হারুর স্টলেই গিয়ে বসবে ভেবেছিল। চা খাবে, কাগজ পড়বে। ইতিমধ্যে দু'এক বন্ধু জুটে যাবে। ব্যস, তখন আর সময় নিয়ে ভাবনা নেই। কিন্তু চারতলা থেকে নিচে নেমে এসে মনে পড়ল শংকরের কথা। যাবে নাকি? ওদের বালিগঞ্জের বাড়ি চেনে সে। মনে মনে ভাবলে একবার। যত রাগই হয়ে থাক, শেষ পর্যন্ত তা রাখা যায় কি? ঐ যে দাদা-বৌদিতে কি হয়েছে কাল, আজ কি আর তা থাকবে? দেখা যাবে হয়তো দাদা অফিসে না গিয়ে বৌদিকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমা দেখবে। মানুষের মন! না, সেই তনিমার বাড়ি গিয়ে কড়া নাড়বে। অনেক করে বলেছিল, আসবেন কিন্তু।

রবীন বিকাশকে খুঁজছে, পাচ্ছে না। কাছেপিঠে সম্ভাব্য জায়গাগুলোতে গিয়ে গিয়ে বেলা করে ফেলল। অফিস যাচ্ছে না দু' দিন। আজ তিন দিন হবে। তা হোক। অফিসে যদি আর কোন দিন যেতে না হয় তাহলে বাঁচে। অফিস কেন, কোথাও ভাল লাগছে না। বাড়ি না, বন্ধু না, আড্ডা না, কিছু না।

সবটা ভাবতে গেলে মাথা গুলিয়ে যায়। কি যে এখন করা যাবে—এমন একটা অবস্থায় কি যে করতে পারে মানুষ, রবীন ভেবে পাচ্ছে না। তাই বিকাশের খোঁজে সকাল থেকে ঘণ্টা কয়েক ধরে এখানে-ওখানে ঘুরেছে। কিন্তু কোথায় বিকাশ? যাদের সঙ্গে দেখা হবার কথা নয়, তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে, একমাত্র বিকাশ ছাড়া।

বিকাশটা বাউণ্ডুলে ঠিকই। কিন্তু দরকারের সময় হদিশ পাবে না, এমন হবার কথা নয়। আসলে তার বরাত, নইলে শালার এমন দশায়ই বা পড়বে কেন সে? কে ভেবেছে সুধা, তার স্ত্রী—তাকে নিয়ে এমন একটা সমস্যা দেখা দেবে যার সমাধান পাওয়া যাবে না!

সুধা কি সত্যি কথা বলেছে? শুনলে সত্যি বলে মনে হবার কথা। কিন্তু সুধার কথা সব সত্যি হলে ঘটনাটার জন্যে কে তবে দায়ী? ঐ ছেলেগুলো?

মাথা গুলিয়ে যায়। আজ তিন দিন ধরে মাথায় কিছু ধরছে না। এক চিন্তা, এক দৃশ্য, এক সমস্যা—মাথায় আর কিছু আসছে না।

হারু বোধ হয় তার অবস্থাটা লক্ষ্য করেছে। বিকাশকে খুঁজতে হারুর স্টলে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল রবীন।

হারু রবীনকে দেখে একগাল হেসে বললে, বাড়িঘর অফিস সব ফেলে এখানে তুই!

বিকাশকে দেখেছিস? এসেছিল—

কাল এসেছিল। আজ দেখি নি।—রবীনের মুখচোখ হয়তো হারুকে অন্য কথা ভাবিয়েছে। হারু বললে, কি হয়েছে তোর?

কি আর হবে। বিকাশকে দরকার।—বলে, আনমনা হয়ে বেরিয়ে এসেছে।

কিন্তু হারুর স্টলে বসে যে ছেলেগুলো গুলতানি করছিল তাদের দেখে দৃশ্যটা আবার তাকে তাড়া করলে।

ঠিক ওদেরই মত কয়েকজন। কিন্তু সুধা বলেছে ঐ একজন ছাড়া আর

কাউকে চেনে না। অথচ সুধার চেনা সেই একজনই—নাঃ, ভাবা যায় না। ঠাট্টা? ছেলেগুলো কিন্তু হো হো হাসি ছড়িয়ে পালিয়েছিল। যেন কিছু না, যেন ইয়ার-বন্ধুদের মস্করা।
সেই মুহূর্তে রবীন খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। পরে মনে হয়েছে, রুখে দাঁড়াবার কথা ছিল তারই সবার আগে। কিন্তু তা হয় নি। রুখে উঠেছিল সুধাই প্রথম।
হেমন্তের বিকেল, শীতল বাতাস, কি রকম এক বিষণ্ণ রোদ। ক'দিন বৃষ্টির পর সেই রোদটাই হয়েছিল কাল। নইলে সুধা বলত না, কি সুন্দর রোদ উঠেছে, তাই না?
রবীনেরও তাই মনে হয়েছে। সুধা বলেছিল, চলো আজ কোথাও যাই। অফিস? অফিসের কথা এমন দিনে এমন সময়ে মনে এলেও আমল দেবে কে?
সুধারই জয়, সুধারই জিৎ—এমন একটা ভাব নিয়ে সুধা বলেছিল, অফিস যাও, যাবে। কিন্তু তিনটের মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে। আমি তৈরি হয়ে থাকবো। তুমি এলেই, এই ট্যাক্সি—বুঝলে?
সুধার সেই ভঙ্গিটা এমন, যেন আচমকা রোদে শিশিরে মাখামাখি এক সুরম্য দৃশ্য—সব ভুলিয়ে দেয়, ভুলে যেতে হয়।
অফিসে গিয়েছিল রবীন। ঘণ্টা দুয়েক দায় সেরে বেরিয়ে এসেছে। সুধার সময়সীমার অনেক আগেই। সুধা তখন সবে খেয়েদেয়ে নিজের ঘরে এসেছে।
রবীনকে দেখে খুব খুশি সুধা। বললে, বাব্বা, অতো আমার সইবে তো? ক'টা বাজে?
রবীন ঘড়ি দেখলে। সবে দুটো। বললে, অফিসে ভাল লাগল না—
বাড়িতে বুঝি ভাল লাগে?—মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলে সুধা।
মুশকিল! কি জবাব দেবে ভেবে পেলে না রবীন। হাসতে হাসতে যা মনে এল বললে। বললে, বাড়ি থেকে বেরুতে ভাল লাগে।
এখনই বেরুবে নাকি?—সুধার ভুরু কুঁচকে গেল।
তুমি তৈরি হবে, তারপর—
তুমি?
আমি তো তৈরি।
অফিসের জামা-প্যাণ্ট ছাড়বে না?
কেন?
কেন আবার? এমনি। আমি সব নামিয়ে রেখেছি।
সুধার জন্যে রবীনকেও একটু সেজেগুজে নিতে হয়েছিল। কিন্তু সে

সাজগোজ যে যাত্রার পালার রাজার মত তা কে কল্পনা করেছিল? এখন মনে হচ্ছে আর হা হা হাওয়া উঠছে ভেতরে। স্টেজের রাজা পালার শেষে একেবারে উদোম নটবর। বিড়ি ফুঁকছে আর ধোঁয়া ছাড়ছে। ধোঁয়া, কেবল ধোঁয়া।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠে আসতে আসতে রবীন জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় যাবে?

যেখানে খুশি!—আসলে সুধাও ঠিক বুঝতে পারছিল না কোথায় যাওয়া যায়, কোথায় গেলে মনের মত হবে।

ট্যাক্সিতে চেপে রবীন জিজ্ঞেস করেছিল, সিনেমা দেখবে?

না, সিনেমা না। কোথাও চলো।

কোথায়?

সে তুমি বলবে।

কারো বাড়ি?

না।

ঠিক আছে। চলো দক্ষিণেশ্বর।

সুধাও নেচে উঠেছিল। কেননা, তার স্মৃতিতে দক্ষিণেশ্বর অনুজ্জ্বল নয়। বিয়ের আগে বার দুয়েক মা-বাবার সঙ্গে গিয়েছে পুজা-পার্বণ উপলক্ষে। ভাল লেগেছে। রবীন নামটা উচ্চারণ করায় সেসব স্মৃতি তাকে টান দিলে। সুধা বললে, তাই চলো।

রবীন আনমনা হাঁটছিল। মাথার ওপরে চনমনে রোদ। সকাল থেকে বিকাশের খোঁজে হন্যে হয়ে এখন ক্লান্তি লাগছে। বাড়িই ফিরে যাচ্ছিল। ভাবছিল হোক দেরী, অফিসেই যাবে এখন। কি হবে আর অতো ভেবে। যা হবার হোক, এসপার ওসপার। আসলে কুক্ষণে গিয়েছিল সেদিন দক্ষিণেশ্বরে। নইলে এমন একটা ঘটনা ঘটে!

রবীন!—পেছনে ডাহা চিৎকার। দাঁড়াল রবীন। তাকাল। বিকাশ! শালা, তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান আর তুমিই এখন ডাকছো আমাকে। পরিহাস। বিকাশ রবীনকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসছে। রবীন স্থির। বিকাশ কাছে আসতেই বললে, কোথায় ছিলি?

আগে তোর খবর বল। আজ সকালে নাকি দু'বার আমাকে খুঁজে এসেছিস বাড়িতে! কি ব্যাপার?

হ্যাঁ। চল, পার্কে বসি। অনেক কথা—

রামকৃষ্ণ সমাধি রোডের ওপরে পার্কটা নতুন। বেশ বড়। ইতস্তত গাছ-গাছড়া আছে। তার ছায়ায় বেঞ্চি। কিন্তু এ সময়ে বেকার ভবঘুরেরও পার্কে এসে বসার কথা নয়। সব বেঞ্চিই ফাঁকা! পার্কও ফাঁকা। দু'চার

জন শুধু পথ-সংক্ষেপ করতে কোণাকুণি এদিক থেকে ওদিক বা ওদিক থেকে এদিকে যাচ্ছে আসছে।

রবীনের সঙ্গে বিকাশ এসে ঢুকল পার্কে। চারদিকে তাকিয়ে একটা কোণের গাছের ছায়ায় এসে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসল দুজনে।

বিকাশ বললে, বল এবার—

বলব। —বলে রবীন কি একটু ভেবে নেয়। তারপর বলে, আমার সব কথা শুনে তোকে বলতে হবে তুই হলে কি করতিস।

ব্যাপারটা বলবি তো

ট্যাক্সি করে এসে দক্ষিণেশ্বরে নেমে পঞ্চবটীর একটা গাছের আড়ালে গঙ্গার ধারে বসেছিল তারা দু'জনে। তখন প্রায় সাড়ে চার। রোদ মজে এসেছে। সামনে হেমন্তের গঙ্গা। বালি ব্রিজের ওপর দিয়ে গাড়ি, লোক-জন যাতায়াত করছে। পঞ্চবটীর এদিকে-ওদিকে লোকজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে—কেউ বসে, কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেলা যত পড়ছে লোকজন তত বাড়ছে। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে। তারা বসেই ছিল। হঠাৎ তাদের সামনে বাইশ-তেইশ বছরের একটি ছেলে এসে দাঁড়িয়ে বললে, এই যে সুধা, কি খবর ?

সুধা কি রকম একটা খুশি আর সংকোচের মিশ্র হাসি নিয়ে ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ঝণ্টু দা !

হুঁ ! চলো।—বলে ছেলেটা সুধার একটা হাত ধরে টান লাগালে।

পলকে উঠে দাঁড়াল রবীন। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা বললে, আপনি আসবেন না, বসে থাকুন।

ব্যাপারটা যে কি রবীন ভাবতে পারছিল না।

সুধা চিৎকার করে উঠল, ছাড়ুন বলছি। কি ভেবেছেন আপনি ?

চেঁচাচ্ছ কেন ? তোমাকে আজ ছাড়ছি নে !

কেন ?

সব ভুলে গেলে ? যাক গে। এমনি হয়ে থাকে। তোমাকে আজ যেতেই হবে।

হাতটা ছাড়াতে সুধা ধস্তাধস্তি শুরু করে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপণ চেঁচাতে থাকলে, ছাড়ুন !

রবীন দিশেহারা। কি যে করবে কিছু বুঝতে পারছিল না।

সুধার চেঁচানি শুনেই হয়তো কয়েকজন এদিকে ছুটে এল। সুধা তখন হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে। কাঁপছে থরথর করে। লোকজন দেখেই হয়তো ঐ ছেলেটার সঙ্গী আরো ক'জন এগিয়ে এসে বললে, কিছু না. কিছু না। আপনারা যান। আমাদের নিজেদের ব্যাপার।

ততক্ষণে রবীন সম্বিৎ পেয়েছে। সুধাকে এক ঝটকায় টেনে নিয়ে বললে, চলো!
পেছনে হাসি। ছেলেগুলো হাসছে।
আবার ট্যাক্সি। বাড়ি পর্যন্ত কেউ কোন কথা বলে নি! বাড়িতে ঢুকে সারা রাত কেঁদেছে সুধা। আর রবীন ছটফট করেছে কি করবে ভেবে।
সব শুনে বিকাশও থ বনে যায়। রবীন বিকাশকে চুপ থাকতে দেখে বলে, তুই হলে কি করতিস?
বিকাশ একটু নড়েচড়ে বসে খুব ধীরে বলে, কিছু না।
একেবারে চুপ করে থাকতিস?
হয়তো না, ঐ ছেলেগুলোকে এক হাত দেখার চেষ্টা করতাম।
আর সুধা?
সুধার দোষটা কি?
তুই কিছুই বুঝিস নি!—ভয়ানক অসহায় মনে হয় রবীনকে।
বিকাশ হাসলে মনে মনে! বললে, ঘটনাটা এমন কিছু নয়, যা বুঝতে অসুবিধা হবে। তোকেই আমি বুঝতে পারছি না এখন।
মানে?—বিকাশের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে রবীন।
তোর খটকা কিসের সেটা বল।
ঐ ছেলেটা কে, সুধার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক—
তোর সঙ্গে সুমির কি সম্পর্ক, তুই সুমির কে, বল?—বিকাশ হঠাৎ তেতে ওঠে। বলে, তুই তো সুমিকে বিয়েও করবি ভেবেছিলি।
ওসবের সঙ্গে এ ঘটনার তুলনা দিচ্ছিস কেন?
কেন নয়? বিয়ের আগে, হতে পারে, সুধার সঙ্গে ঐ ছেলেটার ঘনিষ্ঠতা ছিল। এখন বিয়ে হয়ে যাবার পর সুধাকে জব্দ করার একটু সুযোগ কাজে লাগালে ছেলেটা!
সুধা অন্য কথা বলেছে।
কি কথা?
সে ঘটনাও যে বিকাশকে বলতে হবে তা ভাবে নি রবীন। এখন কথার মুখে তা এসে পড়ায় কি ভাবে বলবে ভেবে পাচ্ছে না। হুবহু সব বলা যায় না। তবু বিকাশকে বোঝাতে হবে ব্যাপারটা।
রবীনের বিয়ের পর সুধাকে দেখে বিকাশ বলেছিল, বড্ড ছেলেমানুষ সুধা! এত কম বয়সের মেয়েদের আজকাল বিয়ে হয় না।
একটা বুড়িকে বিয়ে করলে ভাল হত তুই বলছিস?—বলে রবীন খুব হেসেছিল।
বিকাশ রবীনের সেই হাসির তোড়ে অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল, মানে,

আরো দু'চার বছর পরে বিয়ে হলেই যেন মানাত সুধাকে।
আমাকে মানাত কি? পেটের রোগ—মাথায় টাক, চুলে পাক ধরতো। সুধা পাওয়া যেত না…
সে-সব কথা মনে পড়ে রবীনের। মনে হচ্ছে, বিকাশের ধারণাটাই বোধ হয় ঠিক। বিয়ের আগেই কথাটা ভেবে দেখলে…
চুপ করে আছিস যে! বল—।—বিকাশের চোখে-মুখে একটা সন্দেহের দাগ।
রবীন আর তাকাতে পারছে না বিকাশের দিকে। সমস্যাটা বিকাশ বুঝতে পারছে না। ওকে না বোঝাতে পারলে রবীনও যেন সুস্থির হতে পারবে না।
সুধা সেদিন সারারাত কেঁদেছে। রবীন গুম হয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে কখনো সুধাকে দেখেছে, কখনো চোখ বুজে ভেবেছে। ছাইভস্ম সব ভাবনা, কারো সঙ্গে কারো মিল নেই।
শেষ রাতে চমকে উঠেছিল রবীন। সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সুধা তাকে ঠেলে জাগালে। রবীন দেখলে, সুধার মুখে তখনও কান্নার দাগ।
সুধা ডাকলে, শোনো!
রবীন তাকালে। স্বর খুঁজে পাচ্ছে না যেন।
তুমি আজ আমাকে নিয়ে যাবে আমাদের বাড়ি।
কেন?
আমি ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া করব।
কাদের সঙ্গে?
ঝন্টুদের সঙ্গে—দক্ষিণেশ্বর যাবা—তুমি থাকবে আমার সঙ্গে—। কান্নায় জড়িয়ে যায় সুধার গলা।
রবীন কি রকম কঠিন হয়ে ওঠে। বলে, তুমি যেতে পার। আমি যাব না।
তুমি যাবে না?
না।
তবে আর আমি গিয়ে কি করব!
আমাকে নিয়ে গিয়ে কি করতে চাও তুমি?
আমি জিজ্ঞেস করব, ওরকম ইতরামো করলে কেন ঝন্টু।
ঝন্টুর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?
পাড়ার ছেলে।
তোমাকে ভালবাসে?
কথাটা শুনে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সুধা। রবীন এভাবে

বলবে বা বুঝবে এটা বোধ হয় তত ভাবে নি। এবার সজাগ হল। বললে, জানি না।
তুমি ?
আমি কি ?
তুমি ওকে ভালবাসতে ?
হ্যাঁ !
অ্যাঁ !
তোমার ভয় পাবার কিছু নেই ! সে ভালবাসা কাল ঝন্টু গলা টিপে মেরে ফেলেছে।
আমি কি বিশ্বাস করবো তবে ?
তুমি বিশ্বাস করো বা না করো, আমার ভালবাসাটা সত্য ছিল। আমি সে ভালবাসা তোমার জন্যে বুক ভরে নিয়ে এসেছিলাম।
রবীন বুঝল না। ক্ষেপে গেল মনে মনে। সব ঝুট্, বরবাদ ! মনে মনে ওয়াক থু করে চুপ মেরে চোখ বুজল রবীন।
সুধা বলে চলেছে, বিশ্বাস না হয়, হবে না। কিন্তু সত্যি যা তা সত্যি। ঝন্টু আমাকে বার কয়েক চিঠি লিখেছিল। আমি ভেবে পাই নি কি করব। ও ভালবাসার কথা লিখত। আমি বুঝতামই না ভালবাসতে গেলে অত ঝক্মারি হবে কেন। ওকে দেখতুম, দূর থেকে আমাকে দেখত চোরের মত। আমার হাসি পেত। ওর লেখা চিঠিগুলোর কথা মনে পড়ত। আমার মনে হত, আমি যেন একটা অজানা গন্ধে উতলা হয়ে উঠছি—কি সুন্দর তার ঘ্রাণ ! তারপর কি হলো জানো ? বাড়ির সবাই সজাগ হয়ে গেল। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পাকা হল। তোমাকে দেখলুম। মনে হল, আমার সেই সুন্দর ঘ্রাণের ভাণ্ডার আসলে তুমি, ঝন্টুটা বোকা। কিছু বোঝে না। আর আমার সে ধারণা যে সত্যি তা কালকে ওরা প্রমাণ করলে।
রবীন চোখ বুজেই থাকল। চুপচাপ। ভাবলে, সুধা বোধ হয় গল্প বানাতেও পটু।
বিকাশকে মোটামুটি সব শোনালে রবীন।
বিকাশ বললে, তুই সুধাকে নিয়ে গেলে পারতিস।
নিজের বৌয়ের প্রেম-কাহিনী শুনতে ?
রাস্কেল।—ভয়ানক চটে উঠল বিকাশ। উঠে দাঁড়াল। বললে, যা খুশি কর, তোর কথা আর শুনছি না।
হন হন করে পার্ক থেকে বেরিয়ে এল বিকাশ। রবীন উঠে দাঁড়ায় নি। বসেই আছে। তাকিয়ে দেখছে। জানে, বিকাশ পেছু তাকাবার পাত্র

নয়। তবু রবীন ভাবলে, বলা যায় না, তাকে বসে থাকতে দেখে হয়তো ডাক দেবে, আয় রবীন।

দশ

তনিমা একদিন গাড়ি নিয়ে শংকরদের বাড়ি এল। বিকেল তখন। এষা সবে কলেজ সেরে ফিরেছে। তনিমা এসেছে এষাকে দু'কথা শোনাতে। পেলে শংকরকেও ছাড়বে না, এমনি একটা মন তখন তনিমার।

বেল টিপতেই দরজা খুলে দাঁড়াল এষা।

আরে, তুই? আয়, ভেতরে আয়!—বলে, হাত ধরে টেনে ভেতরে নিয়ে বসায় তনিমাকে।

এষা বলে, আমিও এই এলাম। একটু বোস। বাথরুম থেকে আসছি।

আমি দেরি করব না।

তা' না করলি। একটু বসবি তো? মা ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই এখন। মাকে ডেকে দেব?

তুই যা, তাড়াতাড়ি সেরে আয়। আমিই বরং মাসীকে ডেকে নেব।

ব্যস্! তাই বল—! আমি ভাবলুম—বাব্বা, কী গম্ভীর হয়ে আছিস না।

গম্ভীর হব না?

কেন হবি না? গম্ভীরও হবি, আবার হাসবিও। যা, ভেতরে গিয়ে মা-র সঙ্গে গম্ভীর হয়ে কথা বল। আমি এলে তখন হাসিস। —বলে, মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল এষা।

তনিমা উঠলে না। আসলে তার উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না। বসে বসে ভেবে নিচ্ছে, সেদিনের ব্যাপারটা নিয়ে কি ভাবে এষাকে দু'কথা শোনাবে।

একটা শিরশিরে হাওয়া উঠেছে বাইরে। সামান্য শীত শীত লাগছে। জানালার সবুজ পর্দাগুলো কি রকম কাঁপছে। বাইরে তাকালে এক ফালি আকাশ নীল-নির্মল। আর কিছু নজরে আসে না। তনিমা উঠে চার দেয়ালের ছবিগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকল। দামী ফ্রেমে খ্যাতনামা শিল্পীদের আঁকা ছ'খানা ছবি। আধুনিক অ্যাব্স্ট্রাক্ট আর্ট। এষা বলে, "ওসব আমরা কিছু বুঝি নে। শংকরের পাগলামী। মা বোঝে ঠাকুর-দেবতার ছবি, বাবা বোঝে বিবেকানন্দ-পরমহংস-রবীন্দ্রনাথের ছবি, আমার ভাল লাগে নিজের ফটো। কিন্তু এঘরে সব নাকচ। শংকর বলে, তোরা সব সেকেলে।"

তনিমা ভাবলে, শংকর ছেলেটার সঙ্গে আজ পর্যন্ত আলাপই হল না ভাল করে। অথচ কতদিন এ বাড়ি আসা-যাওয়া তার। ঢুকেই চার দেওয়ালের ঐ ছ'খানা ছবি। তারপর এষা বা এষার মা, বাবা। তারপর চা-চানাচুর বা এটা ওটা খাবার আর তার সঙ্গে এই সেই গল্প। শংকরের গল্প এষার মুখ থেকে যা শোনা যায়। এই পর্যন্ত।

এষা দেরি করলে না। ভাবলে, তনু নিশ্চয় মা-র ঘরে ঢুকেছে। ঝটপট কাপড়-চোপর বদলে মা-র কাছে এসে অবাক।—তনু কই মা?

তনু! এসেছে নাকি?

হ্যাঁ, অনেকক্ষণ। আমি বাথরুমে ছিলাম।

অনেকক্ষণ এসেছে? কই, এঘরে তো আসে নি।

অপর্ণা খাটের ওপরে জানালার ধারে বসে কি এক উপন্যাস পড়ছিলেন। উপন্যাসের পৃষ্ঠাসংখ্যায় চোখ বুলিয়ে বইটা হাত থেকে রেখে খাট থেকে নেমে এলেন। বললেন, যা, হয়তো বসার ঘরেই কাগজ নিয়ে ডুবে আছে।

তনুকে অপর্ণার খুব ভাল লাগে না। কি করবেন, এষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। ছেলেমেয়ে এখন বড় হয়েছে। তাদের নিজেদের ভাল-মন্দ তারা এখন নিজেরা বুঝবে। তবু তনু যে আসে যায়, তাঁর মেয়ের সঙ্গে যে ভাব, তা নিয়ে না ভেবেও থাকতে পারেন না। আকারে-ইঙ্গিতে এষাকে বোঝাতে চেয়েছেন, এষা আমল দেয় না। বয়স হলে মানুষের এই এক কষ্ট, নিজের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত কি রকম দেখে, গ্রাহ্য করে না তত।

এষা আর দাঁড়ালে না। বসার ঘরে এসে দেখে তনু নেই। যাঃ বাবা! চলে গেল! ভাবতে ভাবতে ঝুল-বারান্দায় মুখ বাড়াতেই দেখে কোণে তনু। এষা খুশি হয়ে বলে, কী ব্যাপার তোর? একা, নির্জনে—

এষার গলা শুনে তনু পেছন ফিরে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসলে একটু।

এষা ডাকলে, আয়।

তনু চলে এল ভেতরে। সোফায় বসে পড়ে বললে, তোদের এই বারান্দা থেকে লেকের দিকটা ভারি সুন্দর দেখায়। দেখছিলাম।

আমি ভাবলুম পালালি বুঝি।

পালাব? তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছি।

জানি।

জানিস?

জানবো না? ঝগড়ার সুযোগ পেলে ছাড়বি তুই? চিনি না তোকে?

সেদিন ঐ কাণ্ড করলি কেন?

দিনখানা কেমন ছিল বাবা।
আমরা তো যেতে পারলুম।
তুই গিয়েছিলি, বুঝলুম। কিন্তু আর কাদের কথা বলছিস?
শংকরের বন্ধু, বিকাশ।
গিয়েছিল?
বাঃ, যাবে না? ব্যাপারটা উল্টা ঘটলে তোরা কি ভাবতিস? ধর, তোরা গিয়েছিলি, আমরা যাই নি। কি মনে হতো তোদের?
কিছু না। ভাবতুম জল-ঝড় দেখে বা অন্য কারণে—
এখন বলছিস। সত্যি অমন হলে, ও ভাবে ভাবতিস না।
এটা তুমি জোর করে চাপাচ্ছ। বুঝতেই পারছিস, একা আমার বা শংকরের ব্যাপার হলে কথা ছিল। কিন্তু মা বাবা, দীপক—এদের সকলের কথা ভাবতে হয়েছে আমাদের। তবু তো শংকর বেরিয়ে গিয়েছিল। বাস মেলে নি, ট্যাক্সি পায় নি। জল-ঝড়ে বাবার অমত গাড়ি বার করতে। আমরা ভেবেছি তোদেরও একই হাল, বার হতে পারবি না।

কথাগুলো এষা এমন ঢঙে এমন স্বরে ধীরে ধীরে বললে যে, তনুর ক্ষোভের ধার ভোঁতা হয়ে যায়। উল্টে এখন মনে হচ্ছে যেন সেদিন তার বেরোনোটাই লজ্জার বিষয় হয়েছে।
তনু চুপ আছে দেখে সুযোগটা নিলে এষা। বললে, সেদিন কি করে বেরুলি তুই? আগে কে গেল, বিকাশ?
আমি।
কতক্ষণ ছিলি?
অনেকক্ষণ।
বিকাশকে কেমন লাগল?
বোঝা যায় নি।
অতক্ষণ এক সঙ্গে থাকলি, কিছু বুঝলি না?
বিকাশকে বুঝার প্রোগ্রাম ছিল না সেদিন।
ওঃ!—এষা হেসে ফেললে। বললে, তুই এখনও রেগে আছিস দেখছি। থাক্, ওসব ছাড়। চল ভেতরে।
তনু উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তোদের পাড়া খুব নির্জন। গাড়িটা গেটের বাইরে রেখেছি। চল, ভেতরে নিয়ে আসি।
এষা খুশি হল। তনুর রাগটা পড়েছে। নইলে গাড়িটা ভেতরে এনে রাখার কথা ভাবত না। মানে, তার সঙ্গে এখন বেশ কিছুটা সময় কাটাবে তনু।

গাড়ি আনতে যেতে যেতে তনু জিজ্ঞেস করলে, বিকাশ কি করে রে ?
বেকার।
বেশ শিক্ষিত মনে হল !
গ্র্যাজুয়েট তো হবেই। আমি তত জানি না। শুনেছি, কবি। শংকর বলে।
তনু খুব অবাক হয়ে গেল তার নিজেরই এ ধারার কথোপকথনে। আজ সে বিকাশ প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলবে ভাবে নি। এষাকে কিছু কড়া করে শুনিয়ে পালাবে, এমনি ভেবেছিল। এখন কি রকম মিয়োনো লাগছে সব। তনু আর কথা বাড়ালে না। গাড়িটা এষাদের লন-মত ছোট্ট আঙ্গিনায় তুলে এনে নেমে এসে বললে, আয়, এখানটায় বসি।
তনু লনের ঘাসে আঁচল বিছিয়ে বসে পড়ে। এষা বলে, দাঁড়া, আমাদের চা-টা এখানে দিতে বলে আসি।
এষা ছুটল ভেতরে। আর তক্ষুনি তনু শুনতে পেল, আরে, আপনি !
বিকাশ। বিকাশ এসেছে শংকরের খোঁজে।
আমিও অবাক হচ্ছি, আপনি এ সময় ?—হেসে ফেলে তনু।
শংকরের খোঁজে এসেছি।
যেভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে কথাটা বলে বিকাশ, তাতে আরো হাসি পেল তনুর। চেপে গিয়ে বললে, আর কার কাছে আসবেন এখানে ? শংকর বোধ হয় বাড়ি নেই।
এষাও বেরিয়ে এসে অবাক।
তনু এষাকে বললে, শংকর কখন ফিরবে ?
বিকাশের দিকে তাকিয়ে এষা বুঝলে, শংকরের খোঁজে এসেছে। বললে, কি জানি। আমি ঠিক জানি না।
শংকরকে বলবেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে।
এষা ঘাড় দোলালে। বিকাশ চলে যেতে পা বাড়াতেই তনু বললে, আপনাকে সেদিন বললাম, কই, এলেন না তো !
যাবো।
মনে আছে তবে ?
দিনটা তো ভুলে যাবার মত নয়।
ও হোঃ !—তনু খুব হেসে উঠল।
এষার কোথায় যেন একটু খোঁচা লাগছিল। বললে, সেদিন এমন দুর্যোগ করল—
বিকাশ সে কথায় কান না দিয়ে বললে, আচ্ছা, শংকরকে বলবেন।

বিকাশ চলে গেল।

তনু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হল কিছুটা। ঘাসের ওপর এষার মুখোমুখী বসে বললে, তুই কি রে বাবা! একটু বসতেও বললি না!

শংকর না থাকলে ও দাঁড়ায় না।

তবু ভদ্রতার খাতিরে।

শংকরের বন্ধুর সঙ্গে শংকর ভদ্রতা করবে। আমার কি?

তনু চুপ করে গেল। জানে সে, এষাদের ধরন-ধারণ ঐ রকম। সব যেন কি রকম আলগোছ-আলগা।

এগার

বিকাশ শংকরদের গেট পেরিয়ে এসেই মত পালটে ফেললে। না, শংকরের সঙ্গে দেখা না করে ফেরা যাবে না।

শংকরদের গেট বরাবর রাস্তার ওপারে একটা বড় গাছের তলায় উট্‌কো এক চায়ের স্টল। ত্রিপলের চালা, বাখারির বেড়া। লেকে যারা ঘুরে ঘুরে বেড়ায় বা পথচারী মানুষের জন্যে এরকম অনেক চায়ের স্টল হয়েছে আজকাল বালিগঞ্জ লেকের এদিকে-সেদিকে। সামনে একটা বেঞ্চি। জনা তিনেক বসে বিড়ি ফুঁকছে। তারা শ্রমজীবী, দেখলেই চেনা যায়। বিকাশ তাদের পাশে এসে বসে পড়লে। স্টলওলা বিকাশকে দেখে ত্রস্তব্যস্ত এগিয়ে এল। ভাব দেখে মনে হয় যেন বিকাশের মত খদ্দের সাতজন্মে একটা জোটে। বিকাশ বললে, চা একটা। ভাঁড়ে।

পাশের লোক তিনজন নড়েচড়ে বিকাশকে আড়চোখে একবার পরখ করে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে থাকে। বিকাশ আর তাকালে না কোনদিকে। এখন তার দৃষ্টি শংকরদের গেটে। শংকর আজ যত রাত করেই ফিরুক, পেতেই হবে তাকে। প্যান্টের পকেটে হাত চালিয়ে চিঠিটা বার করলে বিকাশ। অন্তত পরশু তাকে রওনা হতেই হবে। নইলে সময়মত পৌঁছতে পারবে না। মাঝে কালকে একটা দিন। সব ভাবতে গেলে প্রথমেই ডাকবিভাগের মুণ্ডপাত করতে ইচ্ছে হয়। যে চিঠি আরো তিন দিন আগে পাওয়ার কথা, তা পেলে কিনা আজ সকালে। বন্ধু অমর কাছাড়ের এক চা-বাগানে চাকরি ঠিক করে লিখেছে সত্ত্বর যেতে। পয়লা তারিখ জয়েনিং। আজ তেইশ তারিখ। যেতে তিন দিন। খরচ প্রায় একশো। মাসখানেক চালানোর মত আরো একশো হাতে করে না নিয়ে গেলে একেবারে অনিশ্চিত অবস্থা। যদিও অমরও ঐ চা-বাগানেই আছে। কেরানী। তবু ভরসা কি? সঙ্গতি কিছু না থাকলে নিজেকে সহজ রাখা যায় না। তাই

শংকরের শরণ। বাবা বা দাদাকে বললে হয়তো যে-করেই হোক যোগাড় করে দেবে। কিন্তু বিকাশের অভিমানে লাগে। সে তো আর ছোটটি নেই! বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে। কেবল আর্থিক অসঙ্গতির জন্যে আজ পর্যন্ত যোগ্য বিবেচিত হতে পারে নি কারো কাছে। ভাবলেই জ্বালা ধরে। কারো মুখ দেখতে ইচ্ছে হয় না। একমাত্র বন্ধুগুলোই দুঃসহ নয়, তাদের কাছেই সহজ হওয়া যায়।

কি খেয়ালে অমরকে লিখেছিল মাস ছয়েক আগে, তোর চা-বাগানেই দে একটা জুটিয়ে। আর ভাল লাগে না কিছু। দেড়শ দু'শ যা হয় হোক। চাকরি তো। অমরের আর উত্তর নেই। প্রথম কিছুদিন অন্তত উত্তরটা আশা করেছিল। তাও যখন এল না, বিকাশ তখন অমরকে গাল পেড়েছে মনে মনে। শালা, দিনের নাগাল পেয়েছে, জবাব দেবে কেন? তারপর যখন ভুলেই গেছে সব, তখন এই অদ্ভুত চিঠি। বিকাশ অবাক হয়ে গেছে —অভাবিত ব্যাপার। অমরটার জাত-স্বভাব তবে পাল্টায় নি।

চায়ের ভাঁড় সামনে ধরে স্টলওলা বলে, বিস্কুট দেব?

বিস্কুট?—স্টলওলার মুখ থেকে চোখ সরিয়ে বিস্কুটের বয়ামের দিকে চোখ ফেরায় বিকাশ। বলে, দিন, থিন দু'খানা।

চিঠিটা পেয়েছে এগারোটায়। তারপর তার মাথায় খালি একটা চিন্তাই এসেছে—কিছু টাকার যোগাড়। সে চিন্তা নিয়ে সে তাড়াঘড়ি চান-খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়েছে একটা নাগাদ। প্রথমে মনে হয়েছিল রবীনকে ধরবে। কিন্তু সে ব্যাটা এখন বৌ নিয়ে কোঁদলে ডুবে আছে। তাকে বলা যায় না। তারপর আর কে আছে শাঁসালো তার বন্ধু বা জানাশোনা? চট্ করে মনে পড়ে না। নিহাল সিংদের অবস্থা ভাল। নিহালের নিজেরও টাকাপয়সা থাকে হাতে। কি সব ব্যবসা-ফ্যাবসা করে নিহাল, বিকাশ তত জানে না। তা নিহালকেই বললে। পাশাপাশি বিল্ডিং। দোতলায় উঠে দরজায় কড়া নাড়তেই নিহাল বেরিয়ে এল।

তুই? কি ব্যাপার! —নিহাল খুব অবাক!

বিকাশ হাসলে। বললে, তোকে দরকার।

নিহালকে নিয়েব্যালকনির কোণায় চলে এল বিকাশ। বললে সব। কিন্তু নিহালের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, না বললেই ভাল হত যেন।

নিহাল মুখ গম্ভীর করে বললে, এখন তো নেই। দেখি, কাল সকালে যদি পারি—তুই অন্য চেষ্টাও দেখ।

মনে মনে একটা কেন্নো হয়ে যায় বিকাশ। ছিঃ! নিহালকে না বলাই ভাল ছিল।

ঠিক আছে। দেখি—আনমনে চলে এসেছে বিকাশ। কিন্তু নিহালের

ওপর একটা প্রচণ্ড অভিমান আরোপ করে বার বার উচ্চারণ করেছে, তোরা এই ? নিহাল, তোর টাকাটা আমি মেরে দেব না। কিন্তু এখন আর কে আছে ? কার কাছে দুশো টাকা পাওয়া যাবে নির্দ্বিধায় !

শংকর পারে। আগেই ভেবেছিল কথাটা। কিন্তু তার কাছে চাওয়ার ইচ্ছা হয় নি। শেষ পর্যন্ত সাত-পাঁচ ভেবে আসতে হয়েছে শংকরের কাছেই। সল্ট লেকের সেই ব্যাপারের পর থেকে শংকরের ওপরে একটা বিরূপ চিন্তা সব সময় তাকে কষ্ট দেয়। শংকরের সেদিনের ব্যবহারটা কিছুতেই সহজে মেনে নিতে পারে না বিকাশ। তার দিকে যে-যুক্তিই থাক, সে তা শুনতে রাজি নয়। কিন্তু অবস্থাবিশেষে কত কিছু ঘটে. মেনে নিতে হয়। আজই প্রথম এটা সে সত্যি ধরতে পারলে। আর তক্ষুনি মনে হয়েছে, শংকরের ওপরে তার বিরূপ ভাবটা শংকরের অবস্থাটা সঠিক না জানার জন্যে হয়তো। সে কি ভেবেছিল, শংকরের কাছে তাকে হাত পাততে আসতে হবে ? নিহাল হারামজাদা ওরকম বিমুখ করবে ভাবলে হয়তো শংকরের কাছে আগে আসতো। তাতে তার মন অনেক বেশি সহজ থাকত। কিন্তু এখন যা দাঁড়াল—

চা শেষ। ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়। ঠক্ করে একটা আওয়াজ উঠল। সে আওয়াজটাই বিকাশকে সজাগ করে দিলে। জায়গাটা নির্জন, স্তব্ধ। পকেট থেকে সিগারেট বার করে ফস্ করে কাঠি জ্বালিয়েছে। পাশে বসা সেই মজুর তিনজনের একজন সামনে এসে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে ডান হাতে একটা বিড়ি এগিয়ে ধরে বললে. নেবাবেন না বাবু।

বিকাশ থমকে তাকালে। ব্যাপারটা বুঝে দেশলাইটা লোকটার হাতে দিলে। সে দ্বিধাগ্রস্ত কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু চট্‌পট্ বিড়িটা ধরিয়ে দেশলাই বিকাশকে ফিরিয়ে দিয়ে আর বসলে না। হাঁটা ধরলে।

বিকাশ সিগারেট ধরিয়ে আনমনে টানছে। স্টলওলা সামনে এসে বললে বাবু, দামটা—

কত হয়েছে ?

একুশে পয়সা।

বিকাশ প্যান্টের পকেটে হাত চালিয়ে কিছু খুচরো পয়সা বার করে গুনে গুনে দেখলে. সব পাঁচ আর দশ পয়সা।

স্টলওলা অবস্থাটা বুঝেই যেন বললে, তিরিশ পয়সা দিন।

বিকাশ দিলে। পয়সাটা দেওয়ার পরই মনে হল, এখানে আর এভাবে বসা ঠিক নয়। বেঞ্চটা স্টলের প্রয়োজন। স্টলের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে

গেলে বেঞ্চিটার দখলও ছাড়া উচিত। এসব ভাবতে ভাবতে উঠতে যাবে, গাড়ির আলোটা এসে চোখেমুখে পড়ল। কোয়ার্টার সেকেণ্ড। গাড়িটা গেট দিয়ে সোজা পথে নেমেই ডান দিকে মোড় নিয়ে একেবারে স্টলটার সামনে এসে দাঁড়াল। বিকাশ তত লক্ষ্য করে নি। পরে বুঝল, শংকরদের বাড়ির গেট দিয়েই বেরিয়ে আচমকা এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়িটা। অবিশ্যি এ সব কিছুই সে স্পষ্ট বুঝল তনিমাকে দেখে। গাড়িটা দাঁড় করিয়ে তনিমা নেমে এসেছে।
বিকাশ তো হাঁ। তনিমা কিছুটা সামনে এসে বললে, এখানে কি করছেন?
বিকাশ মনের অবস্থাটা সামলে বললে, শংকরের জন্যে অপেক্ষা করছি।
সেই তখন থেকে?
হ্যাঁ!
কখন আসবে শংকর?
জানি না।
খুব জরুরী ব্যাপার?
খুব জরুরী—
আসুন! কাল দেখা করবেন।
আজই যে দরকার—
আসুন না, শংকর রাত করে ফেরে। দরকার হয় আমি আপনাকে এখানে আর একটা ট্রিপ দিয়ে দেব। আসুন!
কোথায় যাবেন?
কোথাও না। আমার ফ্ল্যাটটা চিনে যাবেন। চলুন।
কি হল বিকাশের, পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। তনিমা গাড়ির সামনের দরজা খুলে দিয়ে ওপাশে ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসে দরাম করে তার দিকের দরজাটা বন্ধ করে এপাশে তাকিয়ে বললে, ভাল করে বসুন। দরজাটা ভাল করে এঁটেছেন তো!
বিকাশ দরজাটা ফের খুলে জোর হেঁচকা টানে এমনভাবে বন্ধ করলে যে, বিকট শব্দ তুলে তনিমাকে নাড়িয়ে দিলে। তনিমা বললে, রাগ করলেন নাকি? আপনাকে ইলোপ করছি না, ভয় নেই।
আবছা আলোয় স্পষ্ট বুঝলে বিকাশ, তনিমা হাসছে।

বার

সুমিতা খুব অবাক হল। এমন ভোরে বিকাশ—মনে পড়ে না ইতিপূর্বে এমন ঘটেছে কোনদিন। গীটারটা কোল থেকে নামিয়ে রেখে বললে, কি ব্যাপার ? আয় !

একটাই ঘর। ভাইবোনেরা পড়তে বসেছে একপাশে চৌকির ওপরে। সুমিতা আরেক পাশে। রোজই সকালে এসময়ে কিছুক্ষণ তার গীটারের রেওয়াজ আর ভাইবোনেদের চিৎকার করে পড়া মিলেমিশে সকালের বাতাসে একটা এলোমেলো সুর তোলে, একদিনও যা ঐকতান হয়ে ওঠে না। মেঝেতে কোণার দিকে সুমিতার মা কি সব খুটখাট কাজে ব্যস্ত, বাবা গেছে বাজারে।

বিকাশকে দেখে ভাইবোনেরাও পড়া থামিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। বিকাশের মা একপলক তাকিয়ে উঠে এসে বললে, বসো বাবা। তোমার মা ভাল আছে ? বাবা ?

বাবার শরীরটা একটু খারাপ যাচ্ছে। মা ভাল আছে।—বলে সুমিতার দিকে তাকায় বিকাশ। সুমিতার চোখে তখনও জিজ্ঞাসা। বিকাশের হাসি পেল। বললে, না আসাই ভাল ছিল দেখছি।

কাজ হল। সুমিতা কলকল করে উঠল, কেন ? সকালবেলাই ঝগড়া করতে এলি নাকি !

ঝগড়া ! না, না। সন্ধি !

মানে ?

মানে আবার কি ? একটা চাকরি জুটেছে, তোকে বলতে এলাম।

তাই নাকি !—খুব খুশি হয়ে উঠল সুমিতা। জিজ্ঞেস করলে, কোথায়, কি চাকরি ?

কেরানী। অনেক দূরে। কাল যাচ্ছি।

অনেক দূর মানে ?

অমরের কথা মনে আছে ? অমরই করে দিচ্ছে। কাছাড়ে।

কে অমর ?

বিকাশ ভুল করছে। সুমিতা দেখে নি অমরকে। তবে তার মুখে নাম শুনেছে হয়তো। তা সুমিতার মনে থাকার কথা নয়।

তুই বড় ভুলো।

ধ্যেৎ ! অমর বলে কাউকে আমি দেখি নি।

না দেখলেও আমার মুখে নাম শুনেছিস।

তোর মুখে তো অষ্টোত্তর শতনাম। কোনটা মনে রাখব ?
বিকাশ এবার হেসে উঠল জোরে। বললে, ফাইন বলেছিস ! তোর উন্নতি হবে।
ইয়ার্কি না। কাছাড় কোথায় ? কোন কোম্পানীর চাকরি বল।
কি একটা চা-বাগান। আসামে।
চা-বাগান ? আসাম !
হুঁ !
তুই যাচ্ছিস ?
কেন যাব না ?
টিকতে পারবি ?
এতদিন বেকার টিকে গেলাম ! আর এখন চাকরি পেয়ে ছটফট করবো, ভাবছিস তুই ?
তা না, চা-বাগানের চাকরি।
তাও মানুষেই করে তো। আমাকে তুই মানুষ ভাবিস না কেন ?
মানুষ হলে তো।
মানুষ হতে যাচ্ছি।
হয়ে আয়। তখন বুঝবো।
তোকে একটা কাজ করতে হবে।
কি ?
যে-কোন দিন সকালের দিকে এই ঠিকানায় গিয়ে এই টাকাটা দিয়ে আসতে হবে।
বিকাশ তনিমার ঠিকানা লেখা এক টুকরো কাগজ সহ দুশো টাকা বার করলে পকেট থেকে।
সুস্মিতা বললে, অনেক টাকা। কার ?
দুশো। তুই চিনবি না। নাম তনিমা।
তোর ব্যাপার, তুই-ই কাজটা সেরে যাচ্ছিস না কেন ?
সময় কোথায় ?
বুঝেছি। দরকার না হলে জানতুমই না হয়তো বিকাশবাবু কবে, কোথায়,—কি কারণে—
তোকে না জানিয়ে যেতুম না।
আমাকে না জানালে ক্ষতি কি ?
কিছু না। তবু জানাতুম। যাক্ গে। তুই সময় করে যাবি। তনিমাকে বলবি, টাকাটার আর দরকার হল না, তাই ফেরত দিলুম।
আমি কে, যদি জিজ্ঞেস করে।

বলবি। বলবি বন্ধু। তনিমাও তো আমার বন্ধুই। তুই ছেলেবেলা থেকে, আর ও এই ক'সপ্তাহ হল—এই যা তফাৎ।
ভয়ানক মোচড় লাগে সুমিতার ভেতরে। তাই হঠাৎ একটু হেসে বলে, চা খাবি ?
খাব।
মাকে ডেকে বলে সুমিতা, মা, বিকাশ চা খাবে।
মা কেন ? তুই কর না চা-টা।
মনে মনে একটু থমকে যায় সুমিতা। ঠিক তো। তবু ওঠে না। বলে, ওসব মা-ই ভাল পারে।
বিকাশ বলে, তুই টাকাটা তুলে রাখ।
সুমিতা আর হ্যাঁ-না কিছু বললে না, টাকাটা নিয়ে নিজের ব্যাগে রেখে দিলে। তনিমার ঠিকানাটা বার কয়েক দেখে প্রায় মুখস্ত করে ফেলে সেটাও ব্যাগের মধ্যে সাবধানে রেখে বিকাশের সামনে এসে দাঁড়ালে। ভাই-বোনেরা পড়া থামিয়ে সেই তখন থেকে তাদের কথা গিলছে। ওদের দিকে তাকিয়ে বললে, তোদের পড়া হয়ে গেল ?
সঙ্গে সঙ্গে ওরা মাথা নীচু করে বিড় বিড় করে পড়ায় মন দিলে। দৃশ্যটা দেখে হাসি পায় বিকাশের। বলে, ওদের শাস্তি দিয়ে লাভটা কি ?
দেখছিস না, হাঁ করে সব গিলছে।
ওদের দোষ কি ? আমার সঙ্গে বেরোবি ?
কোথায় ?
দু-একটা জরুরী জিনিস কিনতে হবে—
ওরে ব্বা। ন্নাঃ। আমি তোর সঙ্গে টৈ টৈ করে ঘুরতে পারব না। তুই বোস্—
সুমিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
বিকাশ জানে, সুমিতা চায়ের সন্ধানেই গেল। বিকাশ আরো জানে, তনিমার টাকা-ব্যাপারটা সুমিতাকে খট্কা লাগিয়ে দিয়েছে। বিকাশের এও বিশ্বাস যে, চা-বাগানের চাকরি সুমিতার হয়তো বাজে মনে হয়েছে। হোক্, উপায় কি ? আর এই ভয়েই তেমন কাউকে কিছু জানাচ্ছে না ব্যাপারটা। শংকরের সঙ্গে দেখা হলে শংকরকে স্পষ্ট কিছু বলতো না। যেমন তনিমাকে বলে নি চাকরি-টাকরি বা সে-যে কলকাতা ছাড়ছে—এসব। না, বলে নি ঠিক নয়, বলার দরকার হয় নি। বিকাশের সব শোনার জন্যে তনিমার তেমন কি দায় পড়েছে ?
তনিমা অবিশ্যি জানতে চেয়েছিল, শংকরের জন্যে ওভাবে বসে ছিলেন ?
হ্যাঁ।

কতক্ষণ থাকতেন ?
খুব দরকার কিনা—থাকতুম, যতক্ষণ না ফেরে।
এখন আবার যাবেন ?
নুনাঃ।—তনিমার বসার ঘরের দেয়ালে লেপটে থাকা সুন্দর ঘড়িটার কাঁটায় দৃষ্টি রেখে একটু হেসেছে বিকাশ।
আপনার ক্ষতি করলাম না তো ?
বিকাশ দেখলে, সোয়া ন'টা বাজে। ক্ষতির প্রশ্ন উঠলে এখনও শংকরদের বাড়ি হানা দেওয়া যায়। ক্ষতি নয়, সমস্যা। সেই চিন্তা নিয়ে ধীরে ধীরে বললে, ক্ষতি নয়, সমস্যাটা থেকেই গেল।
শংকর তো আপনার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার সঙ্গে আবার কি সমস্যা ?
সমস্যাটা ওর সঙ্গে নয়, আমার নিজের। সমাধান শংকর।
ওঃ।—তনিমা হেসে উঠল। বললে, তো এখন কি করবেন ?
কি আর করব ?
সমস্যাটা কি ?
আচমকা এ জিজ্ঞাসাটা বিকাশকে নাড়িয়ে দিলে। যত সহজে এতক্ষণ কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিল, এ জিজ্ঞাসার পর আর তত সহজ থাকা সম্ভব নয় মনে হল। আমতা আমতা করে বললে, সেটা ব্যক্তিগত।
ব্যক্তিগত বলেই তো জানতে চাইছি। জনগণের হলে জানতে চাইব কেন ?
বিকাশ স্থির দৃষ্টিতে তনিমার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে মনে মনে তারিফ করলে। সত্যি স্মার্ট মেয়েটা। অন্য সময় হলে সে মুহূর্তে তর্ক তুলত। হয়তো ঝট্ করে বলেই ফেলত, আপনার যে-কোন ব্যক্তিগত বিষয়ে যে-কারো কাছে যে-কোন সময় বলতে পারেন ? কিন্তু অবস্থাটা এমন তখন, বিকাশ বড্ড সরল হয়ে পড়ছিল।
বিকাশ চুপ করে আছে দেখে তনিমা বললে, বলতে না-পারার মত হলে বলবেন কেন ? আমিই বা তা জানতে চাইব কেন ? শংকরের জন্যে যেভাবে বসে ছিলেন, আমার কি রকম মনে হচ্ছিল—
কথাটা শেষ না করে তনিমা তাকাল বিকাশের দিকে।
বিকাশ কোন কালেই তত লজ্জা-শরম-সংকোচের ধার ধারে না। কিন্তু তনিমার সঙ্গে তার যেভাবে পরিচয়, সেই সূত্রে তার আজকের সমস্যার কথাটা বলে ফেলা বেমানান। সেটাই ভাবছিল। তনিমা থেমে পড়ায় বিকাশ বললে, খুব একটা সাংঘাতিক কিছু নয়। কিছু টাকার দরকার। শংকর ছাড়া তেমন সোর্স নেই কিনা—
ধারের ব্যাপার ?—তনিমা হাসলে। বললে, ওসব অতো গোপনীয় ভাবছেন কেন ?

ওসব ব্যাপার লোকে তত সহজে নেয় না।
বুঝেছি। আমার থেকেও নিতে পারেন। কত দরকার?
দুশো।
ওতেই হয়ে যাবে?
যথেষ্ট।
আমি দিলে আপত্তি নেই তো?
আপনার অসুবিধে হবে না?
অসুবিধে হলে দেব কেন?
আমার তো ফেরত দিতে দেরি হবে।
অসুবিধে হবে না।
তবু বিকাশ দ্বিধায় ছিল। সে মুহূর্তে কিছুতেই সহজ হতে পারছিল না। দুশো টাকা এত সহজে কোথাও পাওয়া যেতে পারে এটাই অবিশ্বাস্য। তা ছাড়া, তনিমার সঙ্গে তার তেমন ঘনিষ্ঠতা নয়। তনিমা নিজেই প্রায় যেচে-সেধে ব্যাপারটা ঘটালো। এমন কেউ করতে পারে বিকাশ ভাবতে পারে না। আর এখন তো তার নিজেরই কেমন অসম্ভব মনে হচ্ছে।
সুমিতা দেরি করছে। বিকাশ ঘড়ি দেখলে। ভেতরে একটা তাড়াহুড়ো চলছে। আজকের দিনটা খালি, আর সময় নেই। তারপর বিদায় কলকাতা। ভাবতে ভালও লাগছে, খারাপও লাগছে।
কলকাতাকে সে ছাড়তে চায় নি। কলকাতাই তাকে ঠেলে, ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিচ্ছে। কি করবে সে! সে তো প্রাণপণ চেষ্টা করেছে কলকাতার বুক আঁকড়ে থাকতে। কলকাতা তা চায় না। গতকাল থেকে তার একটা ভয়ানক আশংকা ছিল, তার বুঝি বা যাওয়া হবে না। একটাই কারণ, টাকা। দুশো টাকা কে দেবে তাকে, কোথায় পাবে? কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশ্চর্য উপায়ে সে টাকা তার যোগাড় হয়ে গেছে। আজ সকালে নিহাল সিং এসে তার ঘুম ভাঙিয়েছে। নিহাল টাকা নিয়ে এসেছে। খুব ধাক্কা খেয়েছে বিকাশ। কাল নিহালকে মনে মনে কি গাল পেড়েছে সে!
নিহালের টাকাটা দরকার হয় নি। যেমন দরকার হল না তনিমার টাকাটা। নিহাল বার বার বলেছে, রেখে দে। না লাগলে ফেরত পাঠাবি।
বিকাশ রাখে নি।
তনিমার ওখান থেকে বাড়ি ফিরতে কাল প্রায় সাড়ে-দশ পৌনে-এগারো হয়ে গিয়েছিল। অতো রাত অবধি জেগে থাকার কথা না বৌদি আর

রমা-উমার। কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখলে প্রায় সবাই জেগে। দাদা পর্যন্ত। ঘরের মেঝেতে সবাই বসে জটলা করছে। বাবা খাটের ওপর আধশোয়া। বিকাশ ঘরে ঢুকে এক পলক সকলের দিকে তাকিয়ে ভালো-মন্দ কিছু বোঝে নি। ভেবেছে, সংসারের কোনো জটিল আবর্তে মানুষগুলো সব এক জায়গায় এসে জট পাকিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। মনে মনে হাসলে সে। এদের এমনি ঘুরপাক খেতে ভালও লাগে বোধ হয়! কিন্তু তখনই তার ভুল ভেঙ্গেছে।

দাদা জিজ্ঞেস করলে, কি ঠিক করলি?

বিকাশের না বোঝার কথা নয়। অমরের চিঠির কথা মাকে বলেছিল। বলেছিল, চাকরি যখন জুটেইছে একটা, ছাড়বে না, যাবে সে। মা নিশ্চয় তাই বলেছে বাড়িশুদ্ধ সবাইকে। বিকাশ সকলের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে বললে, যাবো।

টাকা-পয়সা লাগবে না?—দাদার গলায় পুরোপুরি গার্জেনি সুর।

বাবা বললে, কাছাড় তো কম দূর নয়। গাড়ি ভাড়াই তো লেগে যাবে পঞ্চাশ-ষাট। শ তিনেক টাকা তো লাগবেই।

তিনশোতে হবে?—দাদা খটকা-লাগা সুরে বলে।

দু'শোই ঢের। আমি জোগাড় করেছি।—বিকাশের পকেটে তখন তনিমার দেওয়া দুশো টাকা।

বাবা বলে, ধার?

হুঁ!—বিকাশ আর দাঁড়াবে না এদের মধ্যে ভেবেছিল। কিন্তু বাবার কথা শোনার জন্যে দাঁড়াতে হল।

বাবা বলছে, তুই ধার করবি কেন? যার থেকে টাকা এনেছিস কাল ফেরত দিস। তোর যাবার টাকার জন্যে ভাবতে হবে না।

দাদা বললে, কিছু জামা-কাপড় বিছানা-পত্তর চাই তো। তার জন্যে শ'দেড়েক নিস আমার থেকে। কাল সকালেই কেনা-কাটা শেষ করবি। যা, হাত-মুখ ধুয়ে আয়। তোর জন্যে বসে আছি আমরা।

বিকাশ থ হয়ে গেল। বলছে কি এরা সব? একে একে সবগুলো মুখের দিকে তাকাতে ইচ্ছে হল, কিন্তু পারলে না। সব যেন উলটে-পালটে যাচ্ছে। বিকাশ তাকাতে পারলে না কারো দিকে। ধীরে ধীরে গায়ের জামাটা খুলে আলনায় রেখে, লুঙিটা তুলে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল।

তখনই ঠিক করেছিল, তনিমার টাকাটা আজ ফেরত দিয়ে দেবে। কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙতেই মনে পড়ল সুমিতার কথা। ভাঙাঘুমের মন নিয়ে কিছুক্ষণ সাত-পাঁচ ভেবে সিদ্ধান্তে এসে গেল। সুমিতাই ঠিক

পারবে তনিমাকে টাকাটা দিয়ে আসতে। তা ছাড়া, এ কাজে সুমিতা ছাড়া আর কাকে সে বিশ্বাস করবে?
সুমিতা চা নিয়ে এল। আলাদা একটা প্লেটে গরম সিঙ্গাড়া চারটে। ভাই আর বোনের দিকে তাকিয়ে বললে, তোরা রান্নাঘরে যা। মা দেবে। সঙ্গে সঙ্গে তারা উঠে ছুটে বেরিয়ে গেল। সুমিতা হাসলে। বললে, নে, খা।
বিকাশ একটা সিঙ্গারা মুখে পুরে দিয়ে বললে, তুই? তুই নিবি নে?
তুই যেভাবে খাচ্ছিস না, আমার ভয় হচ্ছে।
কেন?
ভাগ বসালে যদি রেগে যাস।
ওঃ!—খুব হেসে উঠল বিকাশ। বললে, তোর বেশ বুদ্ধি-শুদ্ধি হচ্ছে দেখছি।
চারটা সিঙ্গাড়াই গপ্ গপ্ করে খেয়ে, চা-টা প্রায় একটা চুমুকে শেষ করে উঠে দাঁড়াল বিকাশ।
সুমিতা বললে, তোর ঠিকানাটা দিয়ে যা।
বিকাশ পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছতে মুছতে বললে, ধুর। আমার ঠিকানা আমি জানি নাকি?

তেরো

সুধা কি করবে বুঝতে পারছে না। দক্ষিণেশ্বরের সেই ঘটনার পর থেকে যত দিন যাচ্ছে, রবীন যেন ততই ক্ষেপাটে হয়ে উঠছে। তার এই ক্ষেপামী সুধাকে ভেতরে ভেতরে ভয়ানক নাড়া দিচ্ছে। অথচ সে কিছুই গোপন করে নি। সত্যি যা তাই বলেছে। আর তাইতেই যেন রবীন কিরকম বাইগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। সুধা ভেবেছিল, রবীন বুঝবে সব। কিন্তু বোঝা দূরে থাক, তার অবুঝপনাই বেড়ে চলেছে ক্রমশ।
ক'দিন ধরে বাড়ি ফেরে দেরি করে। হাঁ-হুঁ ছাড়া বিশেষ সাড়া নেই। একেক সময় অবিশ্যি সুধার খুব হাসি পায়। আবার কোনো কোনো সময়ে ভীষণ ভয় ধরে। শ্বশুর-শাশুড়ি ব্যাপার-স্যাপার সবই লক্ষ্য করছে। তা তাদের হাব-ভাবে বোঝে সুধা। তাতে আরো লজ্জা। কি-না-কি ভাবছে হয়তো। এসব সব মিলিয়ে সুধা মনে মনে কিছুটা শক্ত হবার চেষ্টা করছে। ইচ্ছে, রবীনকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করবে, কী ভেবেছো তুমি? বলো, শুনি। শুনে জবাব দেবো। এভাবে তুমি চলতে পারো, কিন্তু অন্য সকলের যে কষ্ট হয়, সেটা দেখবে না?

ভাবছে, কদিন ধরেই ভাবছে। রবীনকে আর বলে উঠতে পারছে না। যতক্ষণ রবীন বাড়ি থাকে, মুখের দিকে তাকানো যায় না। মনে হয়, এই বুঝি সব ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে।

যাক্, সব ভেঙে টুকরো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক। তবু সুধা রবীনের মুখোমুখী হয়ে দেখবে। এরকম মন নিয়ে তৈরি হচ্ছিল সুধা। আর সে সময়েই এল তার বড়দিদি দেখা করতে। বড়দিদি থাকে পাটনা। জামাইবাবু ছুটি নিয়েছে। ছেলেপুলে নেই। দুজনের ঝাড়া হাত-পা। প্রতি বছরই এসময়ে আসে।

সন্ধ্যার মুখে তারা এসে কড়া নাড়লে। বাড়িতে সুধা আর শাশুড়ি। পুলিনবাবুর ফেরার সময় হয় নি অফিস থেকে। রবীনের তো ঠিক নেই কিছু। সাতটায়ও ফিরতে পারে এগারোটায়ও ফিরতে পারে।

শাশুড়ি দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে। অপরিচিত মুখ দেখে অবাক হয়ে তাকিয়েছে। সুধার বড়দি সামনে এসে পরিচয় দিলে। শাশুড়ি একটু হেসে দরজা ছেড়ে ভেতরে ডাকলে। বললে, আসুন, ভেতরে আসুন।

তারপর সুধাকে ডাকলে শাশুড়ি, বৌমা, তোমার দিদি এসেছে।

সুধা ছুটে এল। দিদি? জামাইবাবু? সুধার ভেতরে যেন একটা দাঁড়িয়ে থাকা রেলইঞ্জিন হঠাৎ ঝক্‌ঝক্ করে নড়ে উঠল। ছুটবে সে। ছুটতে থাকবে যেদিকে খুশি।

বড়দি বললে, একি চেহারা তোর?

জামাইবাবু কি রকম থমকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

সুধা কাঁদবে না হাসবে বুঝতে পারছে না। যেন এর যে-কোনও একটাই এখন তার সম্বল। যেন হাসি বা কান্নার যে-কোনও একটার ছোঁয়া পেলেই হয়। কিন্তু বড়দি আর জামাইবাবু যেভাবে তাকাচ্ছে তাতে দু'টোই এক সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ধরছে। হু হু করে কান্না আসছে আর হা হা করে হাসি। অথচ সে জানে, পাগল ছাড়া ওরকম কেউ পারে না। সে পাগল হয়ে যায় নি। হবেও না। কিন্তু রি রি করা একটা ঘৃণা এখন তার চেতনাকে অস্থির করে তুলছে।

বলবে নাকি সব? দিদিকে সব বলবে ইনিয়ে বিনিয়ে? এখনই? একটু ভাবতে হল মনে মনে। না, বলে কি হবে? কি বুঝবে দিদি? ভুলই বুঝবে, ভুলই বোঝাবে সবাইকে। দরকার নেই দিদিকে বলে।

নিজের মনকে পুরোপুরি আয়ত্তে এনে হাসলে সুধা। দিদি আর জামাইবাবুকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালে। যেন কিছু না, কিছুই হয় নি তার, এমনি ভঙ্গিতে দু'চার কথা বলে এক ফাঁকে শাশুড়ির ঘরে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, মা, আপনি কিন্তু কিছু বলবেন না

দিদিকে।
রবীনের মা অবাক। সুধার দিদিকে দেখে প্রমাদ গুণেছিল মনে মনে। এক সঙ্কোচ আর লজ্জায় জড়িয়ে যাচ্ছিল বার বার। ভয় হচ্ছিল, এখনই হয়তো সুধা কেঁদেকেটে একটা অঘটন ঘটিয়ে দেবে—যার জবাবদিহি তার জানা নেই। সুধার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্বস্তি পেল রবীনের মা। বলল, তুমি ওদের সঙ্গে কথা বল বৌমা। আমি দেখছি, কাউকে দোকানে পাঠাতে পারি কিনা।
সুধা ত্রস্ত হয়ে বললে, আপনি যান ওঘরে। আমি কি কথা বলব ? আমিই যাচ্ছি দোকানে।
তুমি—যাও নি তো কখনো।
তাতে কি। বাড়িতে কেউ না থাকলে কে করবে ! আপনি যান।
এ যুক্তির কাছে রবীনের মাকে হার মানতে হল।
সুধার এখন দিদি-জামাইবাবুর কাছাকাছি থাকতে ভয়। যদি দুর্বল হয়ে পড়ে ?
রবীনের মা বসলে এসে এ ঘরে, সুধার দিদি-জামাইবাবুর মুখোমুখী। কবে এলে, ক'দিন থাকবে, বাবা-মা সব ভাল আছে কিনা ইত্যাদি আটপৌরে প্রশ্নোত্তরের পর আর কোন্ প্রসঙ্গে এগোনো যায় ভাবছিল রবীনের মা। সুধার দিদি জিজ্ঞেস করলে, রবীন ফেরে কখন ?
তার কি ঠিক আছে মা ? কোন দিন সন্ধ্যে, কোন দিন রাত। সে তার খুশি।
তালইমশায় ?
তার সময় হয়েছে। এখনই এসে যাবে।
সুধার জামাইবাবু জিজ্ঞেস করলে, এখান থেকে সল্ট লেক কত দূর ?
রবীনের মা হাসলে। বললে, আমি বাবা সে জানি না। শুনেছি কাছেই। বৌমা জানে হয়তো, বলতে পারবে।
পুলিনবাবু ঘরে ঢুকে বলতে যাচ্ছিলেন, ভর সন্ধ্যে, দরজাটা হাঁ—। অপরিচিত লোকের সাড়া পেয়ে চুপ মেরে এগিয়ে এলেন।
রবীনের মা হেসে বললে, বৌমার বড়দি-জামাইবাবু।
সুধার বড়দি আর জামাইবাবু উঠে এসে প্রণাম করলে পুলিনবাবুকে। পুলিনবাবু খুশি হয়ে বললেন, থাক থাক। আপনারা তো শুনেছি বাইরে কোথায় থাকেন। কবে এলেন ?
সুধার জামাইবাবু বললে, পরশু।
পুলিনবাবু ব্যস্তত্রস্ত হয়ে বললেন, আপনারা কথা বলুন আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি। বৌমা—

রবীনের মা বললে, বৌমা নেই, এখুনি আসবে।
পুলিনবাবু কি বুঝে আর উচ্চবাচ্য করলেন না।
সুধা তক্ষুণি মিষ্টির ভাঁড় হাতে ফিরে এল দোকান থেকে। দেখে রবীনের ওপরে ভয়ানক চটে গেলেন পুলিনবাবু, ছুটি হয় সাড়ে পাঁচটায়, বাবুর সাতটার মধ্যেও বাড়ি ফেরার কথা মনে থাকে না। কি লজ্জা! দোকান-হাট এখন কাঁচ বৌটাকে করতে হচ্ছে। কি ভাববে তোর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা।
পুলিনবাবু মনে মনে গজরাতে গজরাতে নিজের ঘরে ঢুকলেন।
শ্বশুরকে দেখে সুধা কিছুটা সঙ্কুচিত হয়েছে। ঝটপট রান্নাঘরে ঢুকে সে কেরোসিন কুকার ধরিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে শ্বশুরের ঘরে ঢুকল আলমারি থেকে ভাল কাপ-ডিস নামাতে।
পুলিনবাবু গামছা পরে বাথরুমে যাচ্ছিলেন। সুধাকে দেখে গম্ভীর মুখে বললেন, রবীন আজকাল অতো দেরি করে ফেরে কেন বৌমা?
সুধা ফাঁপড়ে পড়ে উত্তর দেয়, আমাকে কিছু বলে নি।
পুলিনবাবু আর কিছু বললেন না। বেরিয়ে গেলেন বাথরুমের দিকে।
বড়দি আর জামাইবাবুকে নিয়ে এঘরে এল শাশুড়ি। সুধা তাদের দেখে একটু হাসলে।
বড়দি বললে, কি করছিলি?
কিছু না। কাপ-ডিস—
কিছু করতে হবে না।
চা খাবে না?
জামাইবাবু সুযোগ পেয়ে বললে, শুধু চায়ের ব্যাপার তো মনে হচ্ছে না।
এবার রবীনের মা বললে, সে কি বাবা! তোমরা প্রথম এলে আমার বাড়ি। শুধু চা খাবে কেন?
সুধার বড়দির মনে পড়ল, সন্দেশের প্যাকেটটা তখনো তার ভ্যানিটি ব্যাগেই পড়ে আছে। মানিকতলা নেমে কেনা হয়েছিল। সুধার হাতে এনে দেবে ভেবেছিল। ভুলে গেছে। বড়দি ব্যাগ থেকে প্যাকেটটা খুলে, সুধার শাশুড়ির হাতে দিয়ে একটু হেসে বললে, ভুলে গেছিলাম মাঐমা।
রবীনের মা খুশি মুখে বললে, এসবের কি দরকার ছিল মা!—সুধার হাতে প্যাকেটটা দিয়ে বললে, বৌমা, চা দাও ওদের।
সুধা বললে, বাবা আসুক বাথরুম থেকে।
সুধার কথা শুনে মনে মনে তারিফ করলে রবীনের মা। সঙ্গে সঙ্গে মনে

হল, রবীন যদি আজও দেরি করে ফেরে, তাহলে একটা বোঝাপড়া করতেই হবে বৈকি। কচি বৌটাকে মিছিমিছি কষ্ট দেওয়া কেন ?
বড়দি-জামাইবাবু উঠি উঠি করেও উঠতে রাত করলে। চা খেতে খেতে পুলিনবাবুর সঙ্গে কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। এক ফাঁকে বড়দি সুধাকে নিয়ে চলে এল ছাতে।
সুধা একটা কিছু অনুমান করে তৈরি হল মনে মনে।
এ কথা সে কথার পর বড়দি বললে, কি হয়েছে তোদের ?
সুধা স্থির স্বরে বললে, কি শুনেছ তোমরা ?
রবীন গিয়েছিল বাবার অফিসে। কি সব বলে এসেছে।
কবে ?
আমরা আসার আগে। বাবা নিজেই আসতো। আমরা কলকাতা এসেছি, তাই ভেবে নিজে আর আসে নি। আমাদের পাঠিয়েছে।
বাবা কি বলেছে তোমাদের ?
সুধা শক্ত হয়ে যাচ্ছে, পাথর। কি বলেছে রবীন বাবাকে ? এ প্রশ্নের জবাবটা যেন সেই পাথরকে ফাটিয়ে চৌচিড় করে দেবে।
বড়দি বললে, দক্ষিণেশ্বরে কি একটা গোলমাল হয়েছিল তোকে নিয়ে। তাই তোর মন ভয়ানক খারাপ নাকি। বাবাকে রবীন বলে এসেছে, কিছুদিনের জন্য তোকে নিয়ে যেতে। মন ভাল হলে—
যদি মন ভাল না হয়, তা হলে কি করবে ?
এটা কেউ ভাবে নি। বড়দি সহসা কিছু বলতে পারলে না। একটু থমকে গিয়ে বললে, কেন, ভাল হবে না কেন ? কি এমন হয়েছে। ছেলেমানষি।
হয়তো তাই। কিন্তু এ মুহূর্তে সুধা তাই বলে সব উড়িয়ে দিতে পারছে না। রবীন গিয়ে বাবাকে বলেছে তাকে নিয়ে যেতে। বললেই বাবা চলে আসবে, আর বাবা এলেই সে ছুট লাগাবে ? কি ভেবেছো তুমি ?
সুধা চুপ আছে দেখে বড়দি বললে, তুই যাবি আমাদের সঙ্গে ? বলব তোর শ্বশুরকে ? আমরা যে-ক'দিন থাকব, তুইও থাকবি।
সুধা যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক স্বরে বললে, না।
কিন্তু বড়দির কানে শব্দটা স্বাভাবিক ঠেকল না। আবছা আলোয় সুধাকে স্থির দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করলে একটু ক্ষণ। একটু হাওয়া দিচ্ছে, তার সঙ্গে একটু শীত। শীত নামানো হাওয়া। এমন হাওয়ায় উদাম আকাশের নিচে দাঁড়ানো ঠিক না, ঠাণ্ডা বসে যেতে পারে। সুধার দিদি বললে, চল, রাত হয়ে গেল। ফিরতে হবে।

সুধা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করলে, তোমরা যাবে কবে ?
সুধার দিদি বললে, ছুটি এক মাসের। কিন্তু এক মাস থাকা হবে না কলকাতা। ওঁর দিদির বাড়ি টাটানগর যেতে হবে। সেখানে ক'দিন থেকে তারপরে ফিরব।
ওখান থেকেই চলে যাবে ?
হুঁ।—সাড়া দিয়ে কি রকম সন্দেহ হল সুধার দিদির। জিজ্ঞেস করলে, কেন ?
এমনি। থাকলে আর একদিন আসতে।
তুই যাবি ?
না।
কেন ?
এমনি।
দিদি স্তব্ধ হয়ে গেল মনে মনে। নিজের বোন তো! স্বভাব জানতে বাকি নেই। ভাবলে, জেদটা সেই একই রকম আছে।

কমলাফুল টি এস্টেট

এক

যতবার বিকাশ ভেবেছে ততবারই মনে হয়েছে, হাঁ, নামটা সুন্দর। কমলাপুর নয়, কমলাফুল—অবাক! কে রেখেছিল এ নাম! পুরের বদলে ফুল, মনটা ফুরফুরে হালকা হয়ে যায়, উড়তে চায়।

কৌতূহলও ছিল। তিন দিন তিন রাতের পরে যেখানে এসে থামল বিকাশ, সে জায়গা সম্পর্কে তার ধারণা থাকার কথা নয়। কিন্তু ধারণা না থাকলেই যে একটা অদ্ভুত কিছু বুঝতে হবে তা তো নয়। স্টেশনে নেমে তার অদ্ভুতই মনে হল। কলকাতার সংস্কার নিয়ে পথে বার কয়েক হোঁচট খেতে হয়েছিল তাকে। সে সামান্য। কিন্তু এখানে যে হোঁচটটা খেল তা ভুলে যাবার নয়।

কলকলিঘাট স্টেশনেই নামার নির্দেশ ছিল অমরের। কলকলিঘাট নামটাও তাজ্জবের। কল-কল্লোল তো দূর, একশো দেড়শো যাত্রীর উঠা-নামার ক্ষণিক ব্যস্ত-ত্রস্ততার পর নিবিড় শূন্য। সেই শূন্যে একমাত্র কমলাফুল নামটাই যেন তাকে বার বার মাটির সঙ্গে জুড়ে রাখছে। নইলে—

অমর না?—দূর থেকেও চিনতে খুব কষ্ট হল না। অমরই আসছে। ওঃ, হাসিখানা দ্যাখো। টেলিগ্রাম পেয়েছে তবে। ভাবনা ছিল, যদি না পায়, কি করবে তবে?

একটা সুটকেস, ব্যস্। অমরের সঙ্গে দু'জন চা-শ্রমিক। তারা একজন সুটকেস নিয়ে হন্‌হন্ করে ছুটে এগিয়ে গেল। অমর বললে, খুব কাছেই কমলাফুল টি এস্টেট। হেঁটে যেতে পনেরো-কুড়ি মিনিট। আমি সাইকেলে এসেছি। তোর হাঁটতে কষ্ট হবে না তো!

কেন?

তিন দিনের জার্নি—

বিকাশ হাসল একটু, জবাব দিলে না। ওর অদ্ভুতই লাগছে। হাবার মত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। এদিক-ওদিকে কেবল টিলা উচো, নিচু, এবড়ো-খেবড়ো। গাছগাছালি, ঝোপঝাড়। ঘরবাড়ি—শনের বা টিনের চালা, মাটির বা বাঁশের দেয়াল। পাকা বাড়ি নজরে আসে না।

সবই নতুন। মানুষজন, জীবজন্ত, পথঘাট, ভৌগোলিক পরিবেশ

বিকাশের কলকাতার চোখে কেবল নতুন নয়, আরো কিছু যেন জড়িয়ে যাচ্ছে। কলকাতার সেই হা-হুতোস্মি স্বভাবের ওপরে মুহূর্তে এক পোঁচ অবর্ণ আলো লেগে যাচ্ছে যেন কী ভাবে! বিকাশ টের পাচ্ছে ভেতরে ভেতরে। অমরের দিকে তাকিয়ে, অমরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁটিতে হাঁটিতে মনেই পড়ছে না যে, সে তিন দিন তিন রাত্রি এক অসহ্য রেলযাত্রা সেরে মাটিতে পা ফেলেছে। না, কোন ক্লান্তি, কোনো অবসন্নতা তার ভেতরে আর লেগে নেই।

অমর খুব বক্‌বক্‌ করছে—নানা কথা। তার কিছু কানে যাচ্ছে, কিছু যাচ্ছে না। বিকাশ অন্যমনস্ক। ওর চোখে বিস্ময় লেগে যাচ্ছে। আঃ, কলকাতাতে আমার এ বোধ কোথায় ছিল, কোথায় ছিল এ বিস্ময়! মনে মনে ভাবলে বিকাশ। অমর কথা বলেই যাচ্ছে। কি যে তার উত্তর দিচ্ছে সে, বুঝতে পারছে না। অমরের উল্লাস,—হাঁ, উল্লাস, হবে না? কতকাল পরে দেখা। অমরের চেহারাটা পালটেছে, ভাষাও কিছুটা। পালটায় নি খালি ওর সেই সরল হৃদ্যতা। বুঝলে বিকাশ। কিন্তু অমর তো বিয়ে-থা করে সন্তান-সন্ততি নিয়ে সংসারী মানুষ। ওর এমন উচ্ছ্বাস! কে ভেবেছে, নিক্তির ওজন ছাড়া আর কিছু বুঝবে এখন অমর। বিকাশ ভাবে নি। তাই সে সারাটা রাস্তা ভাবতে ভাবতে এসেছে প্রথম পর্যায়ে কি কি করতে হবে, কি কি বুঝতে হবে, কি কি জানতে হবে তাকে।

বক্‌বক্‌ করতে করতে অনেক খবর জানালে অমর। অবিশ্যি সে সব একান্ত বিকাশেরই খবর। বিকাশের জানা হয়ে গেল, আপাতত অমরের বাসাতেই থাকবে। জানা হল, চাকরিটা পাকা, কেরানীগিরি। জানাল, মাইনে এখন তিনশো। কিন্তু আনুষঙ্গিক সব মিলিয়ে কলকাতার হিসেবে আট-ন'শোর মতো। এসব নিয়ে খুব কিছু ভাবে নি সে। এখনও কিছুই মনে হল না। বললে, হ্যাঁ রে, এই চা-বাগান?

চা-বাগানের মধ্য দিয়েই কাঁকর-পাথর বসানো আঁকাবাঁকা পথ। ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে সাজানো চা-বাগান। কোথাও কোথাও কাজ-কাম চলছে। চা-গাছ ছাঁটার কাজ। বিশেষ ধরনের কাটারি হাতে নিয়ে চা-শ্রমিকরা চা-গাছ ছেঁটে চলেছে। কিছু মেয়ে-শ্রমিকও এদিক-ওদিক আগাছা নিরোচ্ছে, কেউ ঘাস কাটছে। এসব দেখেই বিকাশ বুঝলে এ হল চ-বাগান।

অমর বললে, হাঁ, কমলাফুল টি এস্টেট। বড় বাগিচা। এ অঞ্চলের নাম-ডাকের চা-বাগান।

নামটা বেশ। কিন্তু কমলাফুল কেন?

কে জানে! ধারে কাছে কোথাও কমলা বন নেই। ছিল কিনা জানিও না। এখানে নামগুলো ঐরকম, কেমন যেন—সোনাখিরা, চাঁদখিরা, হাতিখিরা, মেডলি, টিরিমটি, ছলগোই, বিশ নম্বর, বালুরবন্দ—সব চা-বাগান।

চা-বাগিচার চৌহদ্দি পেরিয়ে চা-শ্রমিকদের আবাসের ভেতর দিয়ে এখন পথ। প্রথমেই একটা নতুন অচেনা ঘ্রাণ পেয়ে বিকাশ সজাগ হল। এমন ঘ্রাণ কল্পনা করা যায় না। ঘ্রাণটা কিরকম মাদক মাদক—খারাপ নয়. আবার ভালও বলা যাবে কি? এদিক ওদিক তাকায় বিকাশ। নিচু নিচু, কলকাতার বস্তী এলাকার আদলে মাটির বাড়ি সব। প্রায় সবই শনের চালা। মাঝে-মধ্যে দু-একটা টিনের চালা। কয়েক হাজার ঘর গায়ে গায়ে লেগে। কলকাতার মনুমেণ্টের তলায় মিটিং-এর সমাবেশের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। প্রায় সব ঘরেরই দরজা বন্ধ। জানালা? ওগুলো জানালা? বিকাশ দেখছে, দেয়ালে প্রশস্ত ফুটোর মত জানালা, তাও ঢাকা। ঘরের চৌহদ্দিতে কোথাও কোথাও মুরগির পাল খুঁটে বেড়াচ্ছে।

সামনের একটা ঘরের পৈঠায় এক বৃদ্ধ শ্রমিক বসেছিল। তাদের দেখে এগিয়ে এসে অমরকে প্রণাম জানিয়ে বললে, গোড় লাগি বাবু। এই লতুন বাবু কলকাত্তাছে এলেন? গোড় লাগি বাপ!

বিকাশ অপ্রস্তুত। অমর হেসে বললে, ভাল আছ রামদিং?

হাঁ বাবু। কাল কাম যাব।

আচ্ছা, আচ্ছা।—অমর সহজভাবেই বিকাশকে নিয়ে এগোয়।

দুই

চান-খাওয়া সেরে দুপুরে তোফা এক ঘুম দিয়ে উঠে বিকাশের মনে পড়ল সব। বিকাশ—কলকাতার বিকাশ এখন কোন্ এক অজ্ঞাত অখ্যাত কমলাফুল চা-বাগানের হাজিরাবাবু অমর মজুমদারের কাছারি ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। অমর এ ঘরটাই তার জন্যে পরিপাটি করে গুছিয়ে রেখেছে। অমর? না, তার বৌ? অমরের বৌকে ইতিপূর্বে খুব একটা ভাল করে দেখেই নি বিকাশ। এখন পর্যন্তও না।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কী রকম উদ্‌ভ্রান্ত ভাবছে নিজেকে। এখানকার ঘরবাড়ি, মানুষজন, গাছপালা, ধুলোমাটি, এমন কি যে বিছানায় সে এতক্ষণ আরামে ঘুমিয়ে উঠল—এসব কোনকিছুর সঙ্গেই তার যেন কোন যোগসূত্র নেই। সব নতুন, সব অপরিচিত, সব অন্য পৃথিবী। সে এ

কোথায় এল, এমনি এক কিম্ভূত বোধ নিয়ে অনুভূতিহীন হয়ে দাঁড়িয়ে।

বাবু, চা!

বিকাশ হকচকিয়ে তাকিয়ে দেখল, অমরের রাঁধুনী বুড়ো চা নিয়ে এসেছে। ঘড়ির দিকে তাকালে। বিকেল হয়ে গেছে—চারটে বাজে। বললে, ভেতরে রাখো।

বুড়ো ঘরের ভেতরে চা রেখে চলে গেল। বিকাশের মনে পড়ল, অমর বলে গেছে পাঁচটা নাগাদ ফিরে তাকে নিয়ে বেরুবে। বিকাশ আর দাঁড়ালে না। ভেতরে গিয়ে চায়ের কাপ তুলে নিলে।

বিরাট ঘর। বৈঠকখানা আর কি! কাছারি ঘর বলে এরা। চা-বাগানে চাকুরে বাবুদের সকলেরই এ ধরনের বাসাবাড়ি—অমর বলেছে। প্রথমে কাছারি ঘর। তারপরে মূল আবাসঘর। তার সঙ্গে আলাদা রান্নাঘর। রান্নাঘরের লাগোয়া কল বা কুয়ো—স্নানের জায়গা। পায়খানা বেশ কিছুটা দূরত্বে। কিছুটা ফাঁকা জমি শাক-সব্জি ফলানোর জন্যে, গোয়ালঘর, হাঁসের খোঁয়াড়, ছাগল পাললে ছাগলের খোঁয়াড়। বাসাবাড়ি নয় তো, যেন বিরাট চত্বর জুড়ে বসতবাড়ি, খুব সহজ পরিবেশ—খোলামেলা সাদামাটা, গ্রাম-গঞ্জে যেমন দেখা যায়। চারদিকে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বিকাশের শয্যা বাঁশের তৈরি মাচায়। ঘরের দেয়াল নল-বাঁশের খিলানে তৈরি, তার ওপরে সাদামাটির পুরো প্রলেপ। বাঁশের বাখারির দরজা, জানালার ঝাঁপ বাঁশের বুনটে বানানো। ঘরের কাঠামো বাঁশের, চালাটা খালি শন দিয়ে ছাওয়া। ঘরের মেঝেতে তিনটে বাঁশের মোড়া, একটা কেরোসিন কাঠের টেবিল এক দেওয়ালের ধার ঘেঁষে।

চা খেতে খেতে বিকাশ ঘরটার সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। এখানে যেন বাঁশ-নির্ভর সব। খুব হাসি পেল বিকাশের। বাঁশি, ধামা-কুলো, নানা কুটিরশিল্প—এসবের উপকরণ বাঁশ, এমনি একটা প্রচ্ছন্ন ধারণাই ছিল তার বরাবর। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেটা সামান্যমাত্র। ব্যাপক অর্থে আসলে যা দেখছে এখানে, তাই। এখানে থাকতে-শুতে বাঁশের আশ্রয়। ভাবতে আবার কিছুটা হেসে নিলে বিকাশ মনে মনে।

একটা বিকট ভোঁ বেজে উঠল। বিকাশ ঘড়ি দেখলে, সাড়ে চার। বুড়ো আবার এসেছে চায়ের কাপ-প্লেট নিতে। তাকেই জিজ্ঞেস করলে, কিসের ভোঁ বাজলো?

আজ্ঞে, কামজারির।

বিকাশ বুঝলে না। বললে, কিসের?

বুড়ো এবার মুচকি হেসে বললে, সকাল সাড়ে সাতটায় একবার বাজে

কামে যাবার জন্যি। দুপুরে বারোটায় বাজে আর একবার, তখন আজ্ঞে, কামের হিসাব-নিকাশ, কিছুটা জিরান। আর এই এখন যে বাজলো, ছুটি।

বিকাশ বুঝলে। বললে, সবাই সাড়ে সাতটায় বেরোয়?

আজ্ঞে, হাঁ।

ভোঁ-টা বাজে কোথায়?

চা-ঘরে।

চা-ঘর?

আজ্ঞে, হাঁ। চা বানায়, মিশিন-ঘর—কারখানা। দেখবেন, একে একে দেখবেন সব। তামাক খাবেন?

তামাক!

আজ্ঞে, হাঁ।

সিগারেট পাওয়া যায় না?

যায়। তামাকের কাছে সিগ্রেট! কি যে বলেন। তামাক বড় ভাল। খাবেন?

না।

পান?

না।

তবে যাই।

জানালা দিয়ে একটা টিলা মতো জায়গা দেখা যাচ্ছে। একেবারে মাথায় একটা সুন্দর সাজানো বাড়ি। তলা থেকে একটা আঁকা-বাঁকা রাস্তা উঠে গেছে সে বাড়ির দুয়ারে। বেশ লাগছে দেখতে। সে দিকে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকল বিকাশ। মনে অবিশ্যি নানা কথা।

নীল রঙের একটা মোটরকার উঠে যাচ্ছে। এঁকে-বেঁকে উঠছে ঐ রাস্তায়, বিকাশ জানালার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। এখানে যে গাড়ি-ঘোড়া চলে তাই ভাবে নি। তবে, কলকলিঘাট স্টেশন থেকে হেঁটে আসার পথে খেলনা ট্রামের লাইনের মতো এক রকম রেল পাতা রাস্তা দেখেছিল বিকাশ। অমর বলেছে, ট্রলি লাইন। ট্রলি গাড়ি চলে। সেটা কি ব্যাপার বোঝে নি। ভেবেছে, এসেছে যখন, বুঝে নেব সব একে একে।

বিকাশ তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। গাড়িটা যতো উঠছে, গতি ততো ধীর হচ্ছে। ধীরে ধীরে এঁকে-বেঁকে উঠছে। পরিষ্কার নীল আকাশ। আলো মজে আসছে। টিলার মাথায় ঐ বাড়ি ছাড়িয়ে অবিরাম ধোঁয়াটে ঢেউ সব স্থির হয়ে আছে যেন। ধোঁয়ামতো পাহাড়ের পর পাহাড়ের মাথা—পাহাড়ে এলাকা। দূর থেকে এমনি মনে হচ্ছে। এতক্ষণে বিকাশ

কিছুটা সাড় পাচ্ছে। সত্যি, অবাক হতেই হচ্ছে।
নীল গাড়িটা এখন অনেক ছোট হয়ে গেছে। সেই সুন্দর বাড়ির দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াল। তিনজন নামল গাড়ি থেকে। একজন বিরাটকায় পুরুষ, একজন মহিলা, আর একজন—আর একজন বোধ হয় ড্রাইভার, এতদূর থেকে স্পষ্ট কিছু বোঝার উপায় নেই। পুরুষ ভদ্রলোক যে বিশাল দেহধারী সেটা কেবল অবয়বে ধরা পড়ছে। মহিলাকে বোঝা যাচ্ছে পোশাকে, শাড়ি পরা। তৃতীয় জন—আর কাউকে যখন দেখা যাচ্ছে না, ড্রাইভারই হবে, ভাবলে বিকাশ।
বিকাশ! কি দেখছিস?
অমরের গলা। বিকাশ ফিরে তাকালে। অমর সোজা এসে ঢুকেছে। খুশি হল বিকাশ। হাসলে। বললে, ডিউটি শেষ?
আরে না! এখানে ডিউটি ব্যাপারটা কলকাতার চাকুরেদের মতো নয়। চলে এলাম। তুই একা বসে আছিস—তৈরি হয়ে নে, বেরুবো।
কোথায়?
সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে, বাংলোতে।
বাংলো?
হ্যাঁ, ঐ দ্যাখ! বিকাশ এতক্ষণ যে বাড়িটা দেখছিল, অমর সে বাড়িকেই দেখালে আঙুল দিয়ে। বললে, ঐ সাহেবের বাংলো। এ চা-বাগানের ম্যানেজার—হর্তা-কর্তা, স-ব। সে-ই চাকরি দেয়, চাকরি নেয়। তোকে দেবে, দরকার পড়লে নিয়েও নেবে। হুজুর মা-বাপ—
অমর হাসতে থাকল। অমরের কথার ভঙ্গিতে বিকাশেরও হাসি পেল। বলল, আমি তৈরি হচ্ছি।

তিন

বুধবার কমলাফুল চা-বাগানের সাপ্তাহিক ছুটির দিন। সকাল বেলা অমরের বাসায় আড্ডা—তাসের আড্ডা। আড্ডাটা এদিন একটু বেশি জমেছে। উপলক্ষ বিকাশ। সবে তিন দিন হল বিকাশ এসেছে। এখানকার বাবু-কর্মীদের মনে মনে একটা তীব্র কৌতূহল কলকাতার ছেলে, উচ্চ শিক্ষিত, কবি—সব ক'টা যোগ্যতাই এদের কাছে অতুল্য। চা-বাগানে এসেছে কেন বিকাশ, এক ধাঁধা তাদের কাছে। একটা সন্দেহের কথাও মনে উঠেছে অনেকের। তবে কি, নকশাল? পালিয়ে বেড়াচ্ছে! বিশ্বাস কি? অমরবাবু হয়তো সবটা চেপেই গেছে। সাহেবকে ধরেধুরে এখানে ঢুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। কে আর খবর

নেবে, বিকাশ আচার্য বলে যে মানুষ কমলাফুল টি এস্টেটের এ্যাসিস্টেণ্ট্ ক্লার্ক-এর চাকরিতে বহাল হয়েছে, সে কোথাকার বিখ্যাত নক্‌শাল ফেরার !

তাদের নিজেদের মধ্যে এসব নিয়ে কিছু কথাবার্তা ইতিমধ্যে হয়েছে। অমর তা জানে না। বিকাশের সঙ্গে তো পরিচয়ই হয় নি। তাই অরুণবাবু হেড-এ্যাসিস্টেণ্ট ক্লার্ক, এখানে সবাই বলে ছোটবাবু, উদ্যোগী হয়ে সবাইকে বলেছে, চলুন, ছুটির দিন অমরবাবুর বাসায় তাস খেলা যাবে।

তাস খেলা উপলক্ষ, বিকাশ লক্ষ্য এটা সবাই বুঝেছে। রাজিও হয়েছে। ছুটির দিনে চা-বাগানের বাবুরা তাস খেলে, এর ওর বাসায় এসে গল্প-গুজব করে, কেউ বা ধারেকাছের চা-বাগানে কোথাও ঘুরে বেড়িয়ে আসে। নয়তো স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে পাথারকান্দি বা ধর্ম-নগর শহরে চলে যায় সিনেমা দেখতে। সিনেমা সেরে মিষ্টির দোকানে রসগোল্লা খায়, টুকিটাকি কেনাকাটা করে। গাড়ির সময় হলে স্টেশনে এসে টিকিট কাটে। বাসায় ফিবতে রাত হয়ে যায়। ব্যস, ছুটির দিন খতম। রাতে ঘুম, পরদিন ভোর হতে না হতে বাঁধা ছক।

তাস খেলতে খেলতে অরুণবাবু তাই বললে, বিকাশবাবু, তাস জানেন না, তো সময় কাটবে কি করে ?

হেড-টিলাবাবু হাতের তাসে চোখ বুলাতে বুলাতে বললে, কইলকাতার পুয়া, থাস খেলাতি জানইন না। আচানক কতা।

হেড্-টিলাবাবু হেরম্ব ভট্টাচার্য সিলেটের লোক। তার উচ্চারণ বিকাশকে সতর্ক করে তোলে। ভাষাটা খুব মন দিয়ে না শুনলে বোঝা শক্ত। সে খেলা জানে না। পাশে বসে দর্শক। দর্শক আরো তিনজন আছে। ছোট টিলাবাবু, ছোট চা-ঘর বাবু আর ছোট হাজিরা বাবু। তাদের দেখছে বিকাশ, পরিচয় হয় নি। অমর অবশ্য খেলার ফাঁকে ফাঁকে সকলের সঙ্গেই একে একে তার পরিচয়টা ঝালিয়ে দিচ্ছে।

ছোট টিলাবাবু মির্জা ইসমাইল বিকাশের গা ঘেঁষেই বসেছে। সেও সিলেটের লোক। বললে, চলেন, পাকাইয়া আসি।

বিকাশ তাকালে, কোথায় ?

চলেন না, পথঘাট চিনতে লাগবে না ?

ছোট চা-ঘরবাবু খগেন চক্রবর্তী ঢাকার লোক। বললে, দূর ! অখন এই দুফইরে যাইব কই। থামো তুমি মির্জা। বিকাশবাবু, আসেন, আমরা কথা কই।

অমরের বুড়ো রাঁধুনী নগেন চা নিয়ে এল। সবাই খুশি হল। এর

আগে একবার ঘিয়ে ভাজা চিড়ে আর চা হয়ে গেছে।
অরুণবাবু বলল, তামাক চড়ল না তো অমরবাবু!
অমর হেসে বললে, বিকাশ হাসবে। তামাক খাওয়া ওর স্বপ্নেও আসে না। দেখছেন না, কুড়ি কাঠির পানামা দু'প্যাকেট!
মির্জা বললে, কইলকাতারে হনার বলেন।
সবাই হাসলে। বিকাশ চুপ। কিছু মগজে ঢুকছে না তার! একদিন সে অফিস করেছে। তার মগজে এখন সেই অফিসের চিন্তা। কিছুই বোঝে নি। কি যে করতে হবে, কাজটা যে কি তার, ঠিক ধরতে পারে নি। কেবল অরুণবাবু বলেছে, হবে খন, আস্তে আস্তে।

হেডক্লার্ক, মানে বড়বাবু দীপেন ভট্টাচার্য মুচকি হেসে বেশ প্রশ্রয়ের সুরে বলেছে, এক আঙুলে অন্তত টাইপ প্র্যাকটিস করুন, অসুবিধা হবে না। বিকাশ এসব ভাবছিল। বড় চা-ঘরবাবু অমরকে খেঁকিয়ে উঠল, এটা কি করলা অমর। সব মাঠে মারা!
তাস খেলায় কী একটা ভুল করেছে অমর। তাই মুখে একটা চুক্‌চুক্‌ শব্দ করে অপ্রস্তুত হয়ে বললে, বুঝতে পারি নি দাদা।
অমরের সাত বছরের মেয়েটা এ সময়ে এসে বিকাশের কানে কানে কি বলতেই বিকাশ চট করে উঠে দাঁড়াল।
অমর মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে, কি হয়েছে রে মিমি?
মিমি বললে, কিছু না। কাকু একটা জিনিস দেখবে।
বিকাশকে টেনে নিয়ে মিমি বললে, চলো না! দেরি হলে নষ্ট হয়ে যাবে।

চার

তাসের আড্ডা বসেছে বিকাশের ঘরেই, তার বিছানার ওপরে। মিমি বিকাশকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অরুণবাবু বললে, অমরবাবু, আপনার বন্ধুর কবিত্ব কোথাও দেখছি না যে!
মির্জা বললে, কবিত্ব দেখার জিনিস, না বুইঝবার জিনিস ছোটবাবু?
ঐ হল! বিছানাটা দেখেছ?
না, অরুণবাবু ছাড়া কেউ কিছু লক্ষ করে নি। অমর বুঝে লজ্জা পেল। বললে, ও কিন্তু বিছানাপত্র কিছু আনে নি। এসব আমার।
অরুণবাবু চুপ মেরে গেল। হেরম্ববাবু বলল, কইলকাতা কইলকাতা কইরা ফাগল সব। কইলকাতায় সকলে টিকে না কেনে, বুইজবা নি?
বড় চা-ঘরবাবু জনার্দন মুখোপাধ্যায় বলে, কইলকাতার ছাপ চক্ষে,

কইলকাতার ছাপ মনে। বিছানা-বালিশে কইলকাতা খুঁজছেন অরুণ-বাবু? আপনে না কইলকাতায় লেখাপড়া করছেন!
হঃ! সেই কইলকাতা আর আইজগের কইলকাতা—অমরবাবু, ডাকেন।
—খগেনবাবু তাস দেখতে দেখতে বলে।
অমর কিন্তু লজ্জাটা চাপতে পারছে না। মনে মনে খুব রাগ হচ্ছে তার। মালা এমন নির্বোধ কেন? বিছানার চাদরটায় কয়েকটা তালি মারা। অমরই বা কি ভেবেছে কে জানে?
খেলা চলছে। ঘড়িতে কারো নজর নেই। ফাঁকে ফাঁকে কথাবার্তা। মির্জা সাহেবের হঠাৎ খেয়াল হল, বিকাশ আর এ ঘরে আসে নি। বললে, অমরবাবু, বিকাশবাবু কই গেলা?
অমরেরও তত খেয়াল হয় নি। তাই তো, বিকাশ গেল কোথায়? সবাই এবার বিকাশের কথা নিয়ে সজাগ হল।
অরুণবাবু ঘড়িতে তাকিয়ে বললে, ওরে বাবা! সাড়ে বারোটা। কলকাতার ছেলে, চানের অভ্যাস সকালে। দেখুন, হয়তো কলের নিচে মাথা গুঁজে বসে আছে।
অরুণবাবুর ঠাট্টাটা সবাই হালকা ভাবেই নিলে। কলে জল আসে সাড়ে বারোটায়। তার আগে চান-টান করার কথা এখানে কেউ ভাবে না। সকালে আটটায় জল যায়। দুপুর সাড়ে বারোটায় এসে দুটো অবধি থাকে। বিকেলে চারটেয় আসে আটটায় যায়। এসব নির্দিষ্ট সময়ে চৌবাচ্চায়, ড্রামে, বালতিতে জল তুলে রাখে সবাই। স্নানের দরকার হলে অসুবিধে নেই। অরুণবাবুর বলার ভঙ্গিতেই সবাই হাসলে।
অমর কিছুটা অবাক হল। বিকাশ গেল কোথায়? সবাইকে বললে, আর চলবে?
হেরম্ববাবু বললে, আইজ থাউক।
জনার্দনবাবু বললে, বিকাশবাবু আমাগো বোদাই বানাইয়া দিল দেখি! অ অমর, তোমার বন্ধু গেল কই, খোঁজ!
সবাই হাসতে হাসতে উঠে পড়ল।
অরুণবাবু বলল, আসল কাজটাই হল না।
মির্জা বললে, আসল-নকল বোঝন ভার। বুইজলেন ছোটবাবু? ধৈর্য না থাকলে—
হেরম্ববাবু বললে, মির্জাসাব কিতা কইতে কিতা কয়, বুইজতে ফারি না। অমরবাবু, বিখালে আমার বাসায় চলেন বিকাশবাবুরে লইয়া।

অমর তার শোবার ঘরে এসে অবাক। মিমির সঙ্গে বিকাশ লুকোচুরি খেলছে। আশ্চর্য!

মিমি বাবাকে দেখে বেশ ডগমগ খুশিতে বললে, তোমরা খেলছ, আমি আর কাকু না, লুকোচুরি খেলছি। কাকু হেরে যাচ্ছে।

বিকাশ অমরের দিকে তাকিয়ে খুব হাসতে হাসতে বলে, মিমির সঙ্গে খেলাটাই ভাল। তোদের ঐ তাস খেলা আমার সয় না।

অমরের সাড়া পেয়ে মালাও এসেছে এ ঘরে। বললে, যাক, আজ সকাল সকাল খেলা ভাঙল।

আমার জন্যেই নিশ্চয়। আমার একটা ধন্যবাদ পাওনা রইল। —বিকাশ বললে মালাকে।

মালা বললে, তা দাবি করতে পারেন। এখন যান তো, চান-টান সেরে ফেলুন আপনারা। কলে জল এসে গেছে।

লজ্জাটা ভোলে নি অমর। বললে, বিকাশের বিছানায় একটা তালি মারা চাদর পেতে দিয়েছ?

তালি মারা? দূর! আমি নিজে সব করেছি। —মালা বেশ তীব্র আপত্তি তোলে।

দেখে এসো। —অমর চ্যালেঞ্জ তোলে।

বিকাশও অবাক হয়। বলে, না না! খুব ভাল সুন্দর চাদর পাতা ছিল। কাল রাতে শীত শীত লাগছিল। তাই তুলে গায়ে দিয়েছিলাম। আর পাতি নি।

অমর বোঝার চেষ্টা করে। তবে তালি মারা ওটা কি দেখল সবাই?

ততক্ষণে মালা ও ঘরে চলে গেছে। বিকাশ অমরের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে চেষ্টা করছে।

অমর বললে, জানিস, অরুণবাবু ঐ তালি দেখে খুব লজ্জা দিলে।

লজ্জা?

হ্যাঁ।

কেন?

বলে, কলকাতার ছেলে, তার এমন তালিমারা বিছানা!

ও হোঃ! কলকাতাতে সব নতুন, সব অভঙ্গুর ভাবে নাকি এরা? তোর লজ্জা কেন?

এখন বুঝবি না। থাকবি তো, দেখবি তখন।

মালা এ ঘরে চলে এল। বললে, কিছু না। বিকাশবাবু চাদরটা তুলে ফেলায় তোষকের ওয়ারটা দেখা যাচ্ছিল। ওতে দুটো তালি আছে। আমারই ভুল, ঢেকেঢুকে রাখা উচিত ছিল। —বলে, অমরের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে বিকাশ। তারপরে মিমির দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, চলো মিমি দেবী, আমরা নেয়ে আসি।

মিমি যাবে না। অমরকে জড়িয়ে ধরে মুখ লুকিয়ে বললে, আমি বাবার সঙ্গে নাইব।

আচ্ছা আচ্ছা! —বলে হাসতে হাসতে বিকাশ চলে এল তার ঘরে।

দু'মিনিটে বিছানাপত্র সব ফিটফাট করে রেখে গেছে মালা। চাদর-টাদর পেতে পরিপাটি। ভাল লাগে। বুদ্ধি রাখে মেয়েটা, নজরও আছে। মিমিকে দিয়ে কেমন ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে সকালের খাবারটা খাইয়ে দিলে।

অমরের কথা বলতেই বললে, ওর কথা রাখুন। চা-বাগানে থেকে থেকে অন্য মানুষ হয়ে গেছে। তাস নিয়ে বসলে বাড়িতে আগুন লাগলেও উঠবে না। তাই বলে আপনিও কষ্ট করবেন? সে-সব ভাবেই না।

মনে মনে হেসেছে বিকাশ। অমরের ওপর অভিমান। পরিচিত অভিমান। কিন্তু ভালও লেগেছে। দৈ, কলা আর ভেজা চিড়ে পরিপাটি করে বাটিতে এগিয়ে দিয়ে হেসে বলেছে মালা, এসব আমাদের চা-বাগানের খাবার আপনার ভাল লাগবে তো? মালা বেশ কথা বলতেও জানে বুঝলে বিকাশ। ধারণা ছিল, বুঝিবা কলাবৌ—সাড়াশব্দ পাবে না। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে হয়েছে। তিন দিন হল এখানে এসেছে। এর মধ্যে বাবাকে কেবল পৌঁছি-সংবাদ দিয়েছে কার্ডে। আর কারো কথা তেমন মনে আসে নি। কিন্তু মালার দু'চারটে কথায়, ব্যবহারে তখন থেকে বার বার মা'র কথা মনে আসছে, বৌদির কথা, সুমিতার কথা মনে আসছে। কোথায় যেন ব্যথার মত মমতা করুণ সুর তুলছে। ভাবলে বিকাশ, আজই রাতে সে মাকে লিখবে, বৌদিকে লিখবে, সুমিতাকে লিখবে। মালাকে বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, চিড়ে-কলা-দৈয়ের স্বাদটা শহুরে নয় ঠিকই, শহরে এ জিনিস আমরা তেমন করে নিতেই শিখি নি। কিন্তু ভাল লাগছে, খুব ভাল লাগছে, মাকে চিনতে পারছি, সুমিতাকে চিনতে পারছি, বৌদিকে চিনতে পারছি। এক কথায় আমাদের মেয়ে জাতটাকেই যেন খুব কাছে পেয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু এসব ভাবা যায়, বলা যায় না। বোঝানোও যায় না। ঘরের চার-দিকে তাকিয়ে নিজেকে কী রকম নির্জন দ্বীপের রাজা মনে হচ্ছে। একটু আগে যে মানুষগুলো এঘরে ছিল তাদের সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠ

হওয়া হয়তো উচিত ছিল। কিন্তু পারে নি। ভুল করল কিনা কে জানে! কী ভাববে তারা! কলকাতা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা-আগ্রহ তীব্র এদের। আবার একটা করুণাও আছে বুঝিবা! কলকাতার ছেলে এ সৃষ্টিছাড়া চা-বাগানে আসে কেন তবে চাকরি করতে? ঠিকই তো! এতো তোমার ধন-দৌলত-অহংকার, কিন্তু মানুষগুলো যে ভেসে যাচ্ছে, ছন্নছাড়া হচ্ছে, উদভ্রান্ত হয়ে কোথায় সরে যাচ্ছে, সে কি ভালো? তুমি তাদের ধরে রাখতে পারছো না কলকাতা!

কি রে! চান করবি না?—আদুল গায়ে লুঙ্গিপরা অমর কাঁধে একটা লাল গামছা ফেলে মাথায় দুহাতে তেল মাখতে মাখতে এসে দরজায় দাঁড়াল।

বিকাশ হেসে বললে, তুই সেরে আয়। আমি তৈরি হচ্ছি।

কেমন দেখলি আমাদের বাবু কোম্পানী?

ভালো।

তোর ভালো লাগছে?

তোর ভালো লাগে না?

দূর! চা-বাগানে থেকে অভ্যেস হয়ে গেছে, এই যা! নয়তো, ভালো লাগার মতো ক'টা মানুষ আছে এখানে?

বিকাশ কিছুটা অবাক হল। বলে কি অমর! কেন, তার নিজের তো মানুষগুলোকে তেমন মন্দ মনে হচ্ছে না। সাদামাটা সহজ স্বভাবের সব। তাই বললে, সে তো সব জায়গাতেই—মনের মতো সব আর কোথায় পাবি। মনের মতো করে নিতে হয় না!

অমর এবার হাসলে। বললে, বিকাশ, তোর বোধ-বুদ্ধি আর খুলল না। সে একই আছিস। এবার যদি কিছুটা পালটায়। আমি যাচ্ছি, তুই চানের জন্যে তৈরি হয়ে নে। আজ বিকেলে তোকে নিয়ে বাজারে যাব। এখানকার বাজার দেখে আসবি।

ছয়

অমরের বাসা থেকে বেরিয়ে অরুণবাবু আর মির্জা ইসমাইল একসঙ্গে হাঁটতে থাকল। অন্য সকলের বাসা কাছাকাছি। তাদের দুজনের হাসপাতাল এলাকায়, কিছুটা দূরে, ডাক্তারবাবু, নার্স, কম্পাউণ্ডার আর তাদের দুজনের বাসা প্রায় লাগোয়া। বলা যায়, এ চা-বাগানে অন্য বাবুদের এক পাড়া, তাদের আলাদা পাড়া।

হাঁটতে হাঁটতে অরুণবাবু বললে, বুঝলে মির্জা? আমি ভেবেছিলাম,

কলকাতার মানুষ, বেশ কিছুটা ঝকঝকে হবে, এ তো দেখছি ম্যাড় ম্যাড় করছে।
মির্জা হাসলে মনে মনে। বললে, মাত্র আইছে। দ্যাখেন কিছুদিন, উপর উপর সব বুইজতে ফারবেন কেনে?
তা ঠিক। তবু, একটা রকম-সকম থাকবে তো! আমি তো বাপু মেদিনীপুরের মানুষ। এতকাল এখানে আছি, কিন্তু বলো, সেটা বোঝা যায় কিনা?
মির্জা মাথা নাড়লে। কিন্তু মনে মনে সায় নেই। ছোটবাবুকে বেজার করে লাভ নেই। মেদিনীপুরের বৈশিষ্ট্য বা কলকাতার ঝক্‌মক্‌—কোনটা সম্পর্কেই তার কোন ধারণা নেই। বললে, তবে মনে লয় মানুষ ভালো। শিক্ষাদীক্ষা আছে।
হুঁ—অরুণবাবু মির্জার ধারণাটা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ নয়। বললে, দেখা যাবে। কাজকর্ম কিছুতো জানে না হে! আমার মুশকিল। শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়া কি চাট্টিখানি?
শুনলাম, বড় সাহেব মেহরা নাকি খুব খুশি।
হুঁ! অমরবাবুকে তো মেহরা পছন্দ করে। বিকাশবাবু তার বন্ধু, কলকাতার লোক। বড়সাহেব আবার কলকাতা বলতে অজ্ঞান। মেম-সাহেব কলকাতার বনেদি বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে। বুঝতেই পারছ, কলকাতার মানুষ মানে শ্বশুরের দেশের মানুষ। খুশি তো হবেই।
মির্জা হাসলে। বললে, ইটা বাড়তি কতা ছোটবাবু। বিকাশবাবু ভালো মানুষই মনে লয়।
কি জানি!—অরুণবাবু চুপ মারলে।
হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে তার অসুবিধা হয়। বয়স নেহাৎ কম নয়। তার ধারণা, চা-বাগান বলে শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে ভিড়তে হয়। মির্জা বা এ চা-বাগানের অন্যান্য অনেক বাবুর তুলনায় অরুণবাবু বয়স্ক। একমাত্র বড়-চাযরবাবু—জনার্দনবাবু বোধ হয় প্রায় তার বয়সী হবে। কিন্তু তার স্বাস্থ্য ভাল, বয়স বোঝা যায় না। অরুণবাবু স্থূলকায় বাতের রোগী। বারো মাসই তার দেহজ নানা অসুবিধা। এখানে সকলে মনে করে, অরুণবাবুর মেজাজ যে সবসময় ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে, তার কারণ ঐ স্বাস্থ্য। মির্জাও তাই বিশ্বাস করে। হেডক্লার্ক দীপেনবাবু তো আকছাড় হাসি-ঠাট্টা করে অরুণবাবুকে উড়িয়েই দেয়।
বাসার কাছাকাছি এসে পড়েছে। তাই মির্জাও আর কথা বাড়াল না। জিজ্ঞাসা করলে, বিখালে বাজারে ধাইবেন নি?
দেখি! ভাল যদি লাগে—

আমি যাইমু না।
তোমার আর কি? একা আছো!
সামনের মাসত একবার বাড়ি যাইমু। ইবার আপনার বৌমারে আইনমু।
এখানে থাকতে পারবে?
কেনে ফারবে না?
ভাল লাগবে?
না লাগে থাইকবে না।
সে তোমার সুবিধা আছে। বাড়িই বা আর কদ্দুর! তুমি তো ইচ্ছে করলে ফি সপ্তাহে যেতে পার।
হঃ, ফারি! পইসা লাগে না ছোটবাবু!
আহা, বৌটার কথাও তো ভাবতে হবে!—অরুণবাবু বলে।
মির্জা আর কথা বললে না। মনে মনে বেশ কিছুটা থমকে গেল। বৌয়ের কথা সে সত্যি ভাবে না। ছোটবাবু ঠিকই বলেছে। বৌয়ের কথাও ভাবতে হবে। বিয়ে যখন করেইছে, ভাবতেও হবেই। কিন্তু কেবল বৌয়ের কথাই বা ভাববে কেন? মা-বাবা-ভাই-বোন সবও তো আছে। তাদের কথাও তো ভাবতে হবে। সে ভাবে না। অরুণবাবুর কথায় কিছুটা লজ্জাও যেন লাগে।
মির্জার বাসা একটা টিলার মাথায়। অরুণবাবুর বাসা টিলার নিচে সমতলে। আগে অরুণবাবুর বাসা। অরুণবাবু 'যাচ্ছি হে' বলে বাসায় ঢুকে গেল। ইসমাইল তার বাসায় উঠতে উঠতে ভয়ানক অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এখানে সে একা, বড় একা। ঠিক সঙ্গী কেউ নেই। সে এখানে চাকরি পেয়েছে মাস ছয়েক আগে। মুসলমান বলে গোড়াতে কিছুটা অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। সেটা সে আমল দেয় নি। কিন্তু এই বাবু-জাতের মানুষগুলোর সঙ্গে কিছুতেই সে পারে না। এর আগে বছর দুই অন্য একটা চা-বাগানে একই চাকরি করে এসেছে। সেখানেও একই অভিজ্ঞতা। এখানে কিছু মাইনে বেশি বলেই আসে নি, এসেছে এ আশায় যে, যদি একটু নিঃশ্বাসের সুরাহা হয়। কিন্তু চা-বাগানগুলোতে বোধ হয় সে আশা করা যায় না! শ্বাসরুদ্ধ হয়েই থাকতে হবে বা। আর এজন্যই কলকাতার বিকাশবাবু, কবি বিকাশবাবু, শিক্ষিত বিকাশ-বাবুকে নিয়ে সে একটা কল্পনা বুনেছিল। বিকাশকে দেখে, তার সঙ্গে কথা বলে যদিও সে কল্পনায় চিড় ধরার কথা নয়, তবু কিছুটা যেন মনমরাই হয়েছে। এখন, অরুণবাবুর মতে তার বাকি থাকছে কেবল বৌয়ের চিন্তা। বৌয়ের চিন্তাই সম্বল! খুব হাসি পেল মির্জার।
চড়াই পেরিয়ে বাসার গেটে এসে হাঁক পাড়লে, সমরু, এই সমরু।

সমরু চা-বাগানের কুলি। বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক। মির্জার বাসার চাকর। বাবুর সাড়া পেয়ে ছুটে এল।

মির্জা জিজ্ঞেস করলে, সব রেডি?

হাঁ, সাব।

তবে তুই যা।

আজ বাজারে যাবেক না?

যাবি। টাকা নিয়ে যা। পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট বার করে বললে, তরিতরকারি সব আনবি, ডিম আনবি, মাছ না।

সমরু চলে গেল।

ঘরে ঢুকে মির্জা জামা-প্যাণ্ট ছেড়ে লুঙি পরে রান্নাঘরের দিকে এগোলে। তার রাঁধুনী নেই। সে মুসলমান। চা-বাগানের কুলিরা মুসলানের ছোঁয়ায় আসতে চায় না। সমরু তার ঘরদোরের, হাট-বাজারের কাজ করে, রান্নাঘরে ঢোকে না। এমন কি, তার বাসায় যে কল, সে কলের জলও খায় না। এই রীতি। মির্জা জানে, মেনেও নিয়েছে। কিন্তু বড় অসহায় লাগে সব ভাবলে। এখন তাকে রাঁধতে হবে। সিদ্ধ—আলুসিদ্ধ, ডিম সিদ্ধ, ডাল সিদ্ধ, দুধ আছে, ব্যস।

রান্নাঘরে ঢুকতে ঢুকতে ভাবলে, অরুণবাবু হয়তো ঠিকই বলেছে। এ অবস্থায় বৌয়ের কথাই তাকে ভাবতে হবে।

সাত

বেশ রাত হয়েছে। শীত শীত লাগছে। অমর বলেছে, এবার শীত দেরী করছে। আরো আগে আসে। হবে বা। বিকাশ চিঠি লিখতে বসেছে। কিন্তু লিখতে আর পারছে না। বিকেল থেকে এই রাত পর্যন্ত 'বাজার' তার মনে চেপে আছে। ছাড়ছে না।

দুপুরে অমরের কথায় মনে মনে হেসেছিল বিকাশ। বাজার আবার দেখবে কি? গতকাল তো তলববাজার দেখেইছে! বাজার ব্যাপারটাকে তার কখনো বিশেষ কিছু বলে মনে হয় নি। কেবল বাবাকে দেখেছে, বাজার যাওয়া বাজার করা নিয়ে বেশ আগ্রহ। খেতে বসে দরদাম, খারাপ-ভাল ইত্যাদি নিয়ে মন্তব্য-মত-ক্ষোভ-তুষ্টি—সে বাবার বিষয়। মা থেকে শুরু করে সবাই আড়ালে হাসে। এখানে যেন বাবার চেয়েও বেশি সজাগ, বেশি স্পর্শকাতর সবাই বাজার নিয়ে। বিকাশের বেশ মজা লাগে। তাসের আসরে কয়েকবারই যেন 'আজ বাজার বার' কথাটা শুনেছে সকলের মুখে। অমরও বলেছে!

এখানে চা-শ্রমিকদের প্রতি সপ্তাহে মজুরি দেওয়া হয়। এদের সাপ্তাহিক মজুরি পাওয়ার দিন মঙ্গলবার। বেলা দুটোয় মজুরি দেওয়া শুরু হয়। এরা বলে তলব। তলবের দিনের নাম তলববার—মানেই মঙ্গলবার। অফিসের সামনে পনেরো-বিশখানা চালাঘর। বেড়া নেই—খুঁটির ওপরে শনের চালা, নিচু নিচু সব। সেখানেই বসে তলব বাজার। আনাজ-পাতি চিড়েমুড়ি নানান বেসাতি নিয়ে বসে দোকানীরা। ক্রেতা চা-বাগানের শ্রমিকরা, বাবুরা। সব চা-বাগানেই নাকি তলবের দিন এমনি ছোট একটা বাজার বসে। শ্রমিকদের সাপ্তাহান্তিক উপার্জনের নগদ টাকা হাতে—তড়িঘড়ি কিছু কেনাকাটা না করলে তাদের মন ভরবে কেন?
বিকাশ সে বাজার দেখেছে। মণিপুরী মেয়েরা মুড়ি-চিড়ার ঝাঁপি নিয়ে বিক্রি করতে আসে। বাজারের একটা দিকে তাদের পঁচিশ-ত্রিশ জনের সারি অনায়াসে নজর কাড়ে। যেন আগাছা বনজঙ্গলের মাঝে হঠাৎ এক থোকা অচেনা সুন্দর ফুল। প্রথমে তো বিকাশের অদ্ভুত মনে হয়েছিল। কেমন ছিমছাম আঁটোসাটো পোশাক পরা মেয়েরা, যুবতী থেকে বুড়ি সবাই প্রায় একই ধাঁচের। ছবিতে দেখা মণিপুরী মেয়েদের জ্যান্ত ছবি। মুড়ি বিক্রি করছে, চিড়া বিক্রি করছে। মুড়ির চাক, চিড়ার চাক তাদের হাতে বানানো—আসলে মুড়ি-চিড়ার মোয়া, কিন্তু তাদের নিজেদের রুচি অনুসারে চ্যাপটা, গোল, ভাজা তিল মেশানো—বেশ খানিকটা শিল্পরুচি এনে দেয়। মনে মনে তারিফ করেছে বিকাশ। বাজারে দেখার মতো এই একটাই নতুন দৃশ্য। আর সব চিরাচরিত। কি দেখবে আর বাজারে!
অমর যখন বলেছে, যেতে হল।
'দেখা যাক' মন নিয়ে বাজার ঘুরে এসে বিকাশ নির্বাক। বাজারে ঢোকার মুখেই একটা দেশী মদের দোকান। সদ্য তলব পাওয়া পয়সার অনেকটা সেখানে ঢালে কুলি-কামীনরা। অমর বলে, 'দ্যাখ, কষ্টের পয়সা কেমন খোয়াচ্ছে।' বিকাশ দেখলে, চা-শ্রমিকদের নারী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ অনেকেই দিব্বি নেশায় বুঁদ হয়ে কেউ বসে আছে, কেউ বা বাজারমুখো হচ্ছে দুলতে দুলতে। বিশ-পঁচিশ মাইল জুড়ে জনপদ, চা-বাগানের রাজ্যে সপ্তাহে এই এক দিন বিকালে বাজার। ষাট-সত্তর মাইল দূরের শহর-গঞ্জ থেকে দোকানীরা আসে ট্রেনে চেপে বাসে চেপে। আশপাশ থেকে ঘোড়ায়, সাইকেলে আসে স্থানীয় সওদাগরের দল। বিকাশের নয়া চোখে বিস্ময়ের কাজল লাগে। বাজারে কি নেই? জড়িবুটি, ওষোধ-বিষুধ, ম্যাজিক-বাঁদরনাচ, মনোহারী, তৈজসপত্র, মশলাপাতি—সব, সব। তবু বাজার নিস্তেজ। মাছওয়ালারা

এখনও অনুপস্থিত। মাছের বাজার ফাঁকা। কয়েক জন চ্যাং, ল্যাটা, পুঁটি আর কুঁচে নিয়ে বসে আছে। কুঁচে বিকাশের এই প্রথম দর্শন। ভয় পেয়েছিল। সাপ? বিচিত্র কি! এখানে সাপ-খেকোদের কথা ভাবা যায়। মাছের মতো সাপ বাজারে বিক্রি হবে তা কে কল্পনা করবে? অমর হেসেছে।
ভয় পেলি? সাপ নয়, কুঁচে মাছ। —অমর নির্ভয় দিয়েছে বিকাশকে।
মাছের বাজারের কাছটাতেই বিভিন্ন চা-বাগানের বাবুরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।
বাজারে চা-বাগানের বাবুরা স্বতন্ত্র। পোশাক-আসাক চাল-চলন কেনা-কাটা—সব কিছুতেই তারা আলাদা। দোকানীরা তাদের আলাদা স্বাতন্ত্র্য দেয়। বাবুদের পয়সা আছে। চা-বাগানের কুলি-কামীন আর গ্রামাঞ্চলের মানুষজন স্বাতন্ত্র্য দেয় তাদের আর্থিক যোগ্যতা, শিক্ষার যোগ্যতা, পোশাক-আসাকের ধোপদুরস্ততার জন্যে। আগে, দেশ স্বাধীন হবার আগে অবশ্য বাবুদের এরা দেখত শাসকদের প্রতিনিধির মতো। তাই তখন সব ছাপিয়ে ভয়-সমীহের ভাবটাই প্রকাশ পেত সবচেয়ে বেশি। এখন তেমন নয়। তবু, বাবুরাই তাদের আদর্শ। তাদের ছেলেমেয়েরা যদি বাবুশ্রেণীর যোগ্য হয়—এমন একটা হাপিত্যেশ স্বপ্ন সব সময় খেলা করে তাদের মনে।
আশপাশের বিভিন্ন চা-বাগানের পাঁচ-সাত জন বাবুর একেকটা ছোট ছোট দল মাছের বাজারের কাছে দাঁড়িয়ে। একথা ওকথা বলছে; কিন্তু সকলের লক্ষ্য বড় রাস্তার ওপরে—কখন মাছওয়ালাদের ট্রাক এসে দাঁড়ায়।
অমর, বিকাশ আর তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে হেরম্ববাবু, খগেনবাবু, সত্যেন-বাবু। অমর বললে, আর কত দাঁড়াব!
তবে কুঁচিয়া কিনেন অমরবাবু। বিকাশবাবুর নয়া স্বোয়াদ লাইগব।—ফ্যা ফ্যা করে হাসল হেরম্ববাবু।
সত্যেনবাবু বললেন, খালি বিখাশবাবু কেনে, আমরারও কুঁচিয়াই কপালত্ আছে আইজ। ঘোর লাইগবার আর কত্খন?
অমর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, পাঁচটা। সাড়ে পাঁচে সন্ধ্যা। আজ আর মাছ-টাচ হবে না। চলুন, অন্য বাজার সারি।
অমর বিকাশকে নিয়ে এগোলে। আর কেউ নড়ল না। তাদের সঙ্গে চা-বাগানের শ্রমিক একজন বাজারের ঝুড়ি আর মাছের খলুই নিয়ে। অমরের বাসার চাকর। বাসন মাজে, ঘরদোর ঝাঁট দেয়, বাজার-দোকান করে, গরু-হাঁসের তদ্বির-তদারক করে।

অমরের খেয়াল পড়ে। জিজ্ঞেস করে, এই দুখিয়া, গরু সব বেঁধে রেখে এসেছিলি ?
হুঁ, আইগা !—দুখিয়া মাথা দুলিয়ে বলে।
বিরাট বাজার, তার গুঞ্জনও ব্যাপক। জোরে কথা বলতে হয়। বিকাশ বেশ জোরে বললে, মাছ না আসা অবদি ওরা দাঁড়িয়েই থাকবে নাকি রে ?
থাকবে না ? মাছের জন্যেই তো বাজারে আসা। নইলে আর বাবুরা আসবে কেন ? চাকর-বাকরই অন্যসব কেনাকাটা পারে।
বিকাশ বুঝলে না, চাকরেরা মাছ কিনতে পারবে না কেন কে জানে !
মাছের বাজার থেকে অনেকটা সরে এসেছে ওরা। তখনই লক্ষ্য করলে প্রায় বাজারশুদ্ধ সকলের একটা চাঞ্চল্য—তড়িঘড়ি ছুটছে অনেকে মাছের বাজারের দিকে।
অমর বিকাশের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললে, মাছ এসেছে, বুঝলি !
না, এটাও বিকাশ তত বুঝলে না। মাছ এসেছে বলে সবাই ছুটবে কেন ? জিজ্ঞেস করলে, তুই ? তুই কি করবি ?
সত্যেনবাবুকে বলেছি, পারলে আমার জন্যেও কিনবে। আমি অতো পারি না। চল, কান্ডটা দেখাব !
আরে বাস্ ! কাছে এসে বিকাশ তাজ্জব। মাছওয়ালারা সুস্থির হয়ে বসতে না বসতে বাবুশ্রেণীর মানুষজন ছেঁকে ধরেছে। কার সাধ্য তাদের ব্যূহ ভেদ করে।
অমর বললে, মাঝে মাঝে গোলমাল হয়। বাবুরা সব বেছে ছেঁকে কেনার পরে ঝড়তি পড়তি মাছ যা থাকে তাতেই তল্লাটের লোকদের তুষ্ট থাকতে হয়। কিন্তু দামটা বড্ড বাড়িয়ে দেয় বাবুরা, এরা তা সইবে কেন ? বাবুরা দাম বাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়, তাদের পয়সার জোর আছে। কিন্তু স্থানীয় বস্তির মানুষজন, চা-বাগানের শ্রমিকশ্রেণী—তাদের তো পয়সার জোর নেই, তারা এখন কী করবে ? সপ্তাহে বাজার তো একদিন। মাছটা আঁশটা তাদেরও তো চাই, তাদেরও তো জিভের তার চাই !
বিকাশ দেখছে আর অমরের কথা বোঝার চেষ্টা করছে। সন্ধ্যা নেমে গেছে। সারা বাজারে এখানে ওখানে মশাল, কুপি, লণ্ঠন, পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে দোকানীরা ব্যস্ত। বিকাশ জিজ্ঞেস করলে, অনেক রাত অবদি বাজার চলে ?
নয়-সাড়ে নয়ে ভাঙ্গে।—অমর বললে।
আমরা কখন ফিরব ?—বিকাশ জিজ্ঞেস করলে।
ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অমর বললে, সোয়া ছয়। ধর আর আধ ঘণ্টা।

তারপরেই ফেরা। এতক্ষণে কেনাকাটা হয়ে গেছে সকলের।
তোর তো কিছুই হল না!—বিকাশ বললে।
কেন? দুখিয়া বাজার করছে না?
ওহো! দুখিয়াকে তো অমর তার সামনেই জায় ধরে টাকা দিয়ে পাঠালে। ওতো বেশ কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে নেই।

বাবুরা প্রায় সবাই এই করে। কেবল মাছটা জবর দখলের ব্যাপার বলে সেখানে তাদের ব্যক্তিক প্রহরা। বাদবাকী বাজার করাব দায় চাকরের ঘাড়ে।

চা-বাগানের মেয়ে মজুররাও বাজারে আসে। তলব বাজারে দেখা মণিপুরী মেয়েরাও মুড়ি-চিড়ে নিয়ে বসেছে—এখানে অনেক মণিপুরী পুরুষ দোকানী আর খদ্দেরও এসেছে। বিকাশ দেখছে না তো, গোগ্রাসে গিলছে। কেনা-বেচার হাবভাবও কী রকম। কী আশ্চর্য অপরিচয়! কেমন যেন লাগে। অমর তাকে বাজারে টেনে এনে ভালই করেছে হয়তো। বাজারটা কমলাফুল চা-বাগান থেকে মাইল দেড়েক দূরে। জায়গাটার নাম চাঁদখিরা। এখানে বলে ছানকিরা। খুব হাসি পায়, কিন্তু হাসা যায় না, হাসা উচিত নয়। ভাবে বিকাশ। এরা কী রকম কথা বলে সব। কী রকম উচ্চারণ। ক-এর উচ্চারণ খ-এর মতো, খ-এর উচ্চারণ ক-এর মতো —সব বিপরীত। কাকা বলতে শোনায় খাখা, খা বললে শোনায় কা। অথচ ভাষাটা বাংলা, এরা তো বাঙালীই। বিকাশ লক্ষ্য করেছে, চা-বাগানের বাবুরাই এখানকার সবকিছুর আদর্শ। বাবুরা সবাই বাঙ্গালী। সিলেটেরই বেশি। বাদবাকী ঢাকা-ফরিদপুর, কুমিল্লা-ময়মনসিং-এর লোক। তাদের ভাষাও পাল্টেছে, তাদের উচ্চারণও অনেকটা এদের আদলে এসে গেছে। অমরটা অবাদ দিব্বি এদের মতো বলতে পারে। অভ্যাস! তারও হবে। ভাবলে বিকাশ।

রাত্রির খাওয়া সেরে বিকাশ বসেছিল চিঠি লিখতে। মা'র কাছে লিখবে, বৌদির কাছে লিখবে, সুমিতার কাছে লিখবে। কিন্তু লিখতে বসে সন্ধ্যায় বাজারের অভিজ্ঞতা বার বার মাথায় আসছে। বার বার অন্ধকারে বাজারের মানুষজন, মশাল-কুপি-হ্যারিকেন-পেট্রোম্যাক্স-এর আলো তার মনের ওপরে ফুটে উঠছে। তারপর অন্ধকারে দল বেঁধে হাঁটতে হাঁটতে ফেরা। হেরম্ববাবুর হাতে পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ, বাঘের গল্প, হাতির গল্প, আর সাবেক আমলে চা-বাগানের সাহেব ম্যানেজার-দের বেলেল্লাপনার গল্প শুনতে শুনতে বিকাশের মনে হচ্ছিল, রূপ-কথা! আর সেই কুঁচে মাছ? চা-বাগানের শ্রমিকশ্রেণীর মানুষেরা খায়। তাদের নাকি প্রিয় খাদ্য। হেরম্ববাবু বলছিল, কুঁচের ঝোল নাকি

কী সব দুরারোগ্য ব্যাধির ওষোধের মতো। খেতে পারলে অব্যর্থ, অসুখ সারবেই। কিন্তু খাবে কে?

হেরম্ববাবু গল্পে ওস্তাদ। বেশ রসিয়ে বলতে জানে। কিন্তু তার ভাষা! বিকাশ তো প্রায় বোঝেই না। অমর বলেছে, ও কিছু না, পাঁচ-সাত দিনেই সব ঠিক বুঝবি।

যাক গে সে সব। এখন চিঠি লিখতে বসেছে, চিঠি লিখবে। কিন্তু পারছে না। কী যেন একটা হয়ে গেছে। শীত শীত করছে। গায়ে একটা চাদর চাপিয়ে টেবিলের ওপরে হ্যারিকেনের সামনে ঝুঁকে বসে বুঝতেই পারছে না বিকাশ, কী লিখবে কাকে?

জানালাটা খুলে দাঁড়ালে। বাগানের শ্রমিক লাইনের রাস্তায় টিমটিমে আলো—এখানে এক ফোঁটা, আবার বেশ দূরে এক ফোঁটা। বিজলি আলো এখানে কেবল রাস্তায়, অফিসে, ম্যানেজারের বাংলোয়, কারখানায়। আর সব অন্ধকার। ম্যানেজারের বাংলোর আলো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সব নিশুত। আশ্চর্য নিশুত। আকাশ পরিষ্কার। অজস্র তারা —বিরাট আকাশ। আকাশ? বাজারের সেই মশাল, কুঁচে মাছ…সেই মানুষজন…

বিকাশ ভুলে গেল তাকে চিঠি লিখতে হবে। জানালা থেকে সরে এসে কাগজ-কলম নিয়ে বসলে। কতদিন কবিতা লেখে না, কত দিন! আজ লিখবে, এখনই। প্রথম লাইন এসে গেছে। ছ'লাইনের এক কবিতা লেখা যখন শেষ হল, জানালার পাশে এসে আবার দাঁড়ালে। সারা পৃথিবী ঘুমিয়ে। কবি বিকাশ আচার্য একটি ছ'লাইনের কবিতা লিখে আর ঘুমোতে পারছে না। কাকে সে শোনাবে তার এ কবিতা। কাকে?

আট

দীপেন ভট্টাচার্য বড়বাবু, হেডক্লার্ক। ম্যানেজারের পরেই দণ্ডমুণ্ডের উপ-অধিকারী। চা-শ্রমিকদের যাবতীয় বিচার-অভিযোগের প্রাথমিক ধকল সইতে হয় তাকেই। তাই তাকে সব সময়ই স্থিরধীর অচঞ্চল থাকতে হয়। এটা দীর্ঘকালের অভ্যাসে আয়ত্তও করেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ভয়ানক বেসামাল হতে হয়। সম্প্রতি একটা ঘটনা নিয়ে ভারি ঝামেলা হচ্ছে। মির্জা সাহেবের ব্যাপার। তার বাসায় নাকি রাত্রে বাসন্তিয়াকে দেখা গেছে। বাসন্তিয়া ঝগড়ুর ছেড়ে দেওয়া বৌ। ঝগড়ু বৌকে ছেড়ে এ বাগান থেকেই পালিয়েছে। লোকে বলে অন্য

কোন্ বাগানে একটা মেয়েকে নিয়ে ঘর করছে। তা করুক। বাসন্তিয়াও ক'দিন যেতে না যেতে সনাতনকে টেনে এনেছে নিজের ঘরে। সারাদিন কাজ-কাম করে রাতে হাঁড়িয়া খেয়ে বেহুঁস পড়ে থাকে সনাতন। বাসন্তিয়া চুপি চুপি যায় ছোট সাহেবের বাংলোতে প্রায় প্রতি রাতে—এমনই একটা জনরব আছে কমলা-ফুল টি এস্টেটে। তবু বাসন্তিয়া রাতে যাবে কেন মিজার বাসায়? কানা-ঘুষা চলছে। হাতে-নাতে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। প্রমাণ নেই। কিন্তু ব্যাপারটা মিথ্যা না-ও হতে পারে। দীপেনবাবু ম্যানেজারের কানে তুলেছে কথাটা। ম্যানেজার মেহরা সাহেব বলেছে, বাসন্তিয়ার তো চরিত্র ভাল না সবাই জানে। কিন্তু মির্জা হল বাবু। মির্জার সঙ্গে তার সম্পর্ক, ভাল কথা নয়। তার ওপরে মির্জা মুসলমান। চা-শ্রমিকরা সবাই হিন্দু। এই নিয়ে নয়া ফ্যাসাদ বাধতে কতক্ষণ! দীপেনবাবুকে সব খোঁজখবর নিয়ে মির্জাকে রুখতে বলে দিয়েছে।

অনেক ভেবেচিন্তে দীপেনবাবু মির্জাকেই জিজ্ঞেস করবে ঠিক করেছে। কিন্তু তার আগে বড় চাঘরবাবু, ডাক্তারবাবু আর টিলাবাবুর সঙ্গে আলোচনা করা দরকার ভেবে তাদের খবর দিয়েছে। আজই তার বাসায় কথা হবে। রাত ন'টায় আসার কথা তাদের। তার আগে দীপেনবাবু সারাদিন ভেবেছে। খোঁজখবর যা পেয়েছে তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। কবে রাত সাতটা কি আটটায় মির্জার বাসা থেকে বাসন্তিয়া বেরিয়ে এল, কে যেন দেখেছে। ব্যস, তাই থেকে ধরে নেওয়া হবে মির্জার সঙ্গে বাসন্তিয়ার……দূর! তা হয় না। বাসন্তিয়া না হয়ে যদি নিধিরাম হত, কেউ চোখ মেলে তাকাতও না। তার ওপরে, মির্জা মুসলমান,—এই নিয়ে বাবুদের মধ্যেও অনেকের ক্ষোভ আছে, শ্রমিকদের তো আছেই।

মির্জাকে চাকরিতে নেবার সময়ে দীপেনবাবুই সায় দিয়েছিল সবচেয়ে বেশি। মেহরা সাহেব প্রশ্ন তুলেছিল, মুসলমান আর কোন বাবু নেই এখানে। ভেবে দেখুন। দীপেনবাবু হেসেছে। সে দিনকাল নেই মিঃ মেহরা। যদি কারো মনে অন্যকিছু থাকে, থাকুক। লোকটা কাজের, অভিজ্ঞতা আছে, শিক্ষিত, বয়সও বেশি না, কেবল মুসলমান বলেই অনুপযুক্ত ভাববো? মেহরা আর কথা বলে নি। তারপরে মির্জাকে চাকরিতে বহাল করে মনে মনে বেশ একটা তুষ্টি লেগেছিল দীপেনবাবুর। আজ ওসব কথা মনে করে দ্বিধা লাগে। তবে কি ভুলই করেছে?

ডাক্তারবাবু আর বড় চাঘরবাবু একসঙ্গে এল। কিছু বাদে এল টিলাবাবু। ব্যাপারটা সকলেরই জানা। ভূমিকার দরকার হল না। দীপেন-

বাবু বললে মির্জা-বাসন্তিয়ার সমস্যা। সত্যি যদি হয়, কি করা যাবে! মিথ্যে হলেও কিছু করা দরকার যাতে সত্যি হয়ে না ওঠে।
ডাক্তার ভবতোষবাবু হেসে বলে, চা-বাগানে কত কি ঘটে! ওসব তত আমল না দেওয়াই ভাল দীপেনবাবু। মির্জা ইয়ংম্যান। একলা থাকে। বাসন্তিয়া তো জাত ছিনাল। তারা কি করছে না করছে তাতে কার কি আসে যায়। ওসব ভাবনা ছাড়ুন।
চাঘরবাবু বললে, ডাক্তার যা কইল, খাঁটি কথা। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন, মানুষের মন—বুঝি-বুঝি বুঝি না। কি করবেন? জীবনে দেখলাম তো কম না। আমার মনে হয়, মির্জারে বুজাইয়া-সুজাইয়া কওন ভাল যে, ঘটনা সত্য হইলে, যা হইছে হইছে, আর যেন না হয়।
হেরম্ববাবু বললে, হিন্দু অইলে ইতা হয় নাকি! মুসলমানেরা ফারে না কি কাম? আমার মত, বিদায় দেওন ভালা। ফরত্ আর কি হয় না হয়, কি কাম। মেহরারে কয়েন, চাকরি ছাড়াই দিত।
দীপেনবাবু হাসে। বলে, হেরম্ববাবু মির্জাকে সইতে পারে না।
না না, কিতা কয়েন? আমি ঝামেলার কতা ভাইবছি। দরকার কি! আমরার বাগানত আবার এক অশান্তি লাগুক চায়েন নাকি?—হেরম্ব-বাবু বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।
বড় চাঘরবাবু বললে, আরে রাখেন! শান্তি-অশান্তির কি হইল! সকলই মানুষের কারবার। মানুষ ইচ্ছা করলে না পারে কি?
দীপেনবাবু স্থির স্বরে বললে, তাহলে মির্জাকে ডেকে কথাটা বলি।
ডাক্তারবাবু বললে, তাই তো ভাল। অন্ততঃ ভদ্রলোক জানুক যে আমরাও চোখ খুলেই আছি।
বড় চাঘরবাবু বললে, মির্জারে যা দেখছি, আমার কিন্তু খারাপ মনে হয় না। দোষ খালি মুসলমান হওয়ায়। শুনি, বাসন্তিয়া তো আরো কত জনের ঘরেই ঢোকে, কথা তো ওঠে না হে ডাক্তার!
হেরম্ববাবু চটে উঠল, চাঘরবাবু সবতাতেই এক্কইবারত্ সুজা ভাবইন। অত সুজা না। বুইজতে হইব।
খুব উত্তেজিত হেরম্ববাবু। তার চোখে দৃশ্যটা ভাসছে। স্পষ্ট। অন্ধকারে বাসন্তিয়া নামছে টিলা বেয়ে। হেরম্ববাবু অরুণবাবুর বাসাতে ঢুকছিল। আড্ডা দিতে প্রায় সন্ধ্যাতেই যায়। বাসন্তিয়াকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল হেরম্ববাবু। বাসন্তিয়া তো! হাঁ বাসন্তিয়া। উত্তেজনার মাথায়, ঘটনাটা যে তারই দেখা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু এ কাহিনী এমনভাবে চাউর করে ছেড়েছে হেরম্ববাবু, এখন যদি নিজেই বলে ফেলে, তারই দেখা, তারই বলা, তারই সন্দেহ, তাহলে সবাই

ব্যাপারটাকে অন্য চোখেও দেখতে পারে না। তাই সে দিকে আর না গিয়ে চুপ করলে হেরম্ববাবু।

মির্জার ওপরে হেরম্ববাবু চটা, এটা এখানে জানে সবাই। মুসলমান বলেই নয় কেবল, মির্জা কী রকম সব কথাবার্তা বলে, সকলের সঙ্গে বাছবিচার না রেখে চলাফেরা করে—এসব হেরম্ববাবুর ভয়ানক অপছন্দ। কিন্তু উপায় নেই। তাকে এ ব্যাপারে তেমন কেউ পাত্তাই দিতে চায় না।

দীপেনবাবু জিজ্ঞেস করলে, চা চলবে?

ডাক্তারবাবু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, সাড়ে নয়। তা চলতে পারে।

বড় চাঘরবাবু বললে, কেবল চা ক্যান দীপেনবাবু। এত রাইত, কিছু টায়ের ব্যবস্থাও করতে হয়।

দীপেনবাবু হেসে বললে, হেরম্ববাবু আবার যত্রতত্র যখন-তখন খান না, ছোঁন না!

হেরম্ববাবু হা হা করে উঠল, সে কি কথা! বড়বাবু বামুন মানুষ, তার বাসায় কিয়র ছোঁয়াছানি, বাছবিচার!

সবাই হেসে উঠলে। দীপেনবাবু বললে, আপনিই বা কম কি! সিলেটের ভট্ট বংশ, জাত বামুন।

চাঘরবাবু বললে, রাখেন জাত। বিদেশে অবার জাত-অজাত কি? কে হিন্দু আর কে মুসলমান!

ডাক্তারবাবু বললে, আঃ চাঘরবাবু, আপনি বিদেশ কথাটা ছাড়ুন। আজ আর দেশ কোথায় আমাদের? ঐ মির্জা সাহেবই কেবল বলতে পারে এটা তার দেশ।

সবাই মানে সে কথা। মির্জা এ অঞ্চলেরই লোক। পাথারকান্দি থেকে বেশ ভেতরে এক অজ পাড়াগাঁয়ে তার বাড়ি। অরুণবাবু ছাড়া এ বাগানের আর সব বাবুদের দেশ ছিল আজকের বাংলাদেশে। এখন আর নেই। কবে সে দেশ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন, সেই পাকিস্তান আমল থেকে। তবুও অনেকেই ভুলতে পারে না দেশের কথা। যা নেই, আর হবেও না, তাই নিয়েই এদের অনেকের এক করুণ আফশোস। চাঘরবাবু জনার্দন মুখোজ্জেরই তা বড় বেশি। যখন তখন সে আফশোসের কথা টেনে আনে।

চায়ের সঙ্গে লুচি আলুভাজা নিয়ে এল দীপেনবাবুর স্ত্রী চারু।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলে, কী? ভাল আছেন?

দীপেনবাবু হাসে। হাসে চারুও। আর তাদের হাসির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে হেরম্ববাবু বলে, অসুখ কইরছে নি? কিতা!

জনার্দনবাবু মুচকি হাসে। বলে, অসুখ! হঃ। মাঝে মাঝে অসুখ করণ ভাল।
চা-লুচি সাঙ্গ করে সাড়ে দশ বাজিয়ে যখন উঠল সবাই, দীপেনবাবু বললে, চাঘরবাবু, কথাটা আপনি বলুন মির্জাকে।
আমি?
হাঁ।
ডাক্তারবাবু বললেন, তাই বোধ হয় ভাল হবে।
হেরম্ববাবু দীপেনবাবুকে বললে, চাঘরবাবু কেনে, আপনের অইল কি? আপনে না কেনে?
দীপেনবাবু বললে, চাঘরবাবুকে খুব মানে মির্জা।
হ, ঠিকই!—হেরম্ববাবু স্বীকার করলে। কিন্তু ঠিক যেন মেনে নিতে পারছে না। তাই বললে, হগলে মিলল্যা কইলে কিতা হয়। ভালা না নি?
বলেন কি?—ডাক্তারবাবু অবাক হয়। বলে, এসব কথা সভা করে বলা যায়? শত হলেও মির্জা তো আমাদেরই একজন। তার ভাল-মন্দের কথা আমরা ভাববো না!
তবে ভাবইন। —বলে, হাঁটা ধরলে হেরম্ববাবু।
দীপেনবাবু লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে আসছিল। ডাক্তারবাবু বললে, হেরম্ববাবু তো গোসা করলেন। চলুন চাঘরবাবু, আমরা এক সঙ্গে যাই।
দীপেনবাবু বললে, এগিয়ে দেব?
কেন? টর্চ আছে। আমরা যেতে পারব।—ডাক্তারবাবু চাঘরবাবুর হাতের টর্চের দিকে আঙ্গুলে ইঙ্গিত করে বললে।
দীপেনবাবু লণ্ঠন হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। চাঘরবাবু আর ডাক্তারবাবু অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, তখন বাইরের গেট বন্ধ করে ভেতরে চলে এসে দেখলে চারু তখনও কী সব কাজে ব্যস্ত। সেদিকে একবার তাকিয়ে কলতলায় ছুটলে গামছা কাঁধে ফেলে।
আর তখনই মনে হল, ব্যাপারটা হয়তো বানানো। মির্জাকে চাকরিতে নেবার আগে ঐ পোস্টে হেরম্ববাবু চেয়েছিল তার এক আত্মীয়কে ঢোকাতে। তার ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল। মির্জার তুলনায় সে কিছুই না। মির্জা গ্র্যাজুয়েট, চাবাগানে টিলার কাজের অভিজ্ঞতা তিন বছরের। লোকও স্থানীয়। অযোগ্যতা কেবল ধর্মে। সে হিন্দু নয়। হেরম্ববাবুর আত্মীয় ম্যাট্রিক পাশ, ইতিপূর্বে কাজের কোন অভিজ্ঞতা নেই, তেমন চালাক-চতুরও নয়। কী করে তাকে নেওয়া যাবে! নেওয়া যায় নি। আজকাল আর সে দিন নেই যে, অমুক বাবুর তমুক হওয়াটাই আসল যোগ্যতা হবে। ইউনিয়ন আছে, আই. টি. এ. আছে, মন্ত্রী আছে, রাজ-

নীতিক পাণ্ডারা আছে। কে যাবে ওসব ঝামেলায়।
হেরম্ববাবু তা বোঝে না। মির্জার ওপরে সে হাড়ে চটা। বাসন্তিয়ার ওপরও তার মন বিরূপ। একটা গোলমাল হয়েছিল হেরম্ববাবুর সঙ্গে। বাসন্তিয়াকে হেরম্ববাবু হুকুম করেছিল কাজের ছুটির পরে তার গরুর জন্যে এক বোঝা ঘাস কেটে আনতে। বাসন্তিয়া হুকুম মানে নি। সোজা বলে দিয়েছে, 'হাম তুহারা নকর নেই লাগে বাবু। নাই সেকব।' হয়তো সে জন্যেও বাসন্তিয়া আর মির্জা, দু'জনকেই সে কিছুটা বেকায়দায় ফেলতে চায়। হতে পারেও বা।
হাত-মুখ ধুতে ধুতে কথাগুলো মনে এল দীপেনবাবুর। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, বড়চাঘরবাবু যেন হালকা সুরে এরকমই ইঙ্গিত দিয়েছিল। হাঁ, ঠিক এরকম।

নয়

বাবুমহল থেকে সর্দার-চৌকিদারদের মধ্যেও সব ছড়িয়েছে। একমাত্র হেরম্ববাবু ছাড়া আর কাউকেই তেমন গুরুত্ব দিতে দেখা যাচ্ছে না, সেটাই অবাক করেছে ম্যানেজার মেহরাকে।
মেহরা মির্জাকে একদিন তার বাংলোয় তলব করেছিল। সন্ধ্যা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত কি কথা হয়েছে কেউ জানে না। মির্জা কেবল দীপেনবাবুকে বলেছে, সামনের মাসত সমাধান। সাতদিনের ছুটি দিবেন। বাড়িত যাইমু। এইখানে আর একলা থাকতাম না বড়বাবু।
দীপেনবাবু বুঝলে, বৌকে নিয়ে আসবে মির্জা। তাই বললে, ভাল। খামোকা ঝুটঝামেলায় যাবেন কেন?
তার ধারণাটা দীপেনবাবু অন্য অনেককেও বলেছে। সবাই কিছুটা স্বস্তি পেল। কিন্তু ঘটনাটা রহস্যঘন হয়েই থাকল। বড় চারঘরবাবু কেবল তার স্বভাবসিদ্ধভাবে বলেছে, হুঃ, বৌ-পোলা-মাইয়া লইয়া থাকলে নিশ্চিন্ত। অন্য মাইয়ালোকের দিকে তখন কেবল ভক্তি—অষুদটা ভালই দিছে বড় সাহেব মেহরা। মির্জার বেলায় খাটবে হয়তো। কিন্তু ছোট সাহেবের বেলায় কি হইবে. অ্যাঃ? তার ত বৌ-পোলা-মাইয়া নাই।
ছোটসাহেব রামধন মালিকের নাকি নজর বাসন্তিয়ার দিকে। তবে, তা আজকের নয়, আকস্মিক ঘটনাও নয়। কিন্তু মাঝে-মধ্যে সে সব নিয়ে কথা ওঠে। আর কথা উঠলে সত্য-মিথ্যায় রস জমে যায়।

বিকাশ তো আনকোরা নতুন এখানে। হয়তো তাকে শোনানোর উৎসাহে যার যা মনে হয়েছে বিকাশকে বলেছে। মির্জা সম্পর্কে বিকাশের কিছুটা অন্য ধারণা হয়েছিল। এসব শুনে তার কেমন লাগে। মির্জাকে সে জিজ্ঞেসই করবে ভাবলে। কিন্তু অমর কি বলে জানা দরকার। হেরম্ব-বাবু অবিশ্যি সুযোগ পেলেই বিকাশকে ধরে, বুইজলেন বিকাশবাবু, আপনে নয়া মানুষ। ইটা খইলকাতা না, ছা-বাগান, হক্কল এক্কইবারে তাজ্জবের কারবার। ভালো নি লাগে, কয়েন ছাই!

ছোট সাহেব রামধন মালিকের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে বিকাশের। লোকটা কাজের মনে হয়। তার ব্যক্তিগত দুর্বলতা নিয়ে এরা অতো মাথা ঘামায় কেন বিকাশ বোঝে না। অমরকে জিজ্ঞেস করতেই হেসে বললে, কি শুনেছিস বল দেখি!

বিকাশ যা শুনেছে বললে।

অমর বললে, তোর কি মনে হয়?

কি আবার মনে হবে! তোদের চা-বাগানের একটা নক্সা পাচ্ছি। কি বলিস!

তুই তোর মতো বুঝেছিস। ভালো।—বলে, হাসতে থাকলে অমর।

হাসছিস যে!

কিছুদিন যাক, তখন আর হাসবো না।

বিকাশ ক্ষেপে উঠল, তোরা কি ভাবছিস বল তো! আমি কি শিশু, না বোকা?

তা নয়, এটা চা-বাগান, আলাদা জগৎ। সব ধাতে আনতে সময় লাগবে না?

আলাদা জগৎ আলাদা জগৎ করে কেবল ঘুরপাক খাচ্ছিস! তোরা ছাড়া আর কেউ কিছু বুঝবে না ভেবেছিস?

রেগে গেলি! আরে, এখানে যারা আসে, থেকে যায়, আস্তে আস্তে তারা সব বোঝে, বুঝে এখানকার সঙ্গে মিশে যায়। আমাদের দশাটা তুই বুঝতে পারছিস না।

সবাই আমাকে একই কথা শোনাচ্ছিস! আমার মনে হয় তোরা ভুল করছিস।

হবে বা!

হবে নয়, হয়েই আছে। আমি প্রমাণ করব।

অমর গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, করিস, দেখব।

অমর উঠে গেল। রাত হয়েছে। রাতের খাওয়া-দাওয়ার পরে প্রায়ই ওরা দুজনে গল্পগুজব করে। কখনো অমরের ঘরে, কখনো বিকাশের ঘরে। আজকের কথাবার্তা বিকাশের ঘরেই হচ্ছিল। জানালা-টানালা বন্ধ। দরজাও অর্ধেক ফাঁক করা। শীত নেমেছে। শীত যে এমন তাই

জানা ছিল না বিকাশের।

অমর চলে যাবার পর শুয়ে পড়বে ভেবেছিল। কিন্তু কি মনে করে সামনের জানালাটা খুলে দাঁড়াল। আজকের ডাকে কলকাতা থেকে একটা লিট্‌ল ম্যাগাজিন এসেছে তার নামে। তার একটা কবিতা ছাপা হয়েছে। অনেক আগে দিয়েছিল, সেই কবে! তখন বিকাশ জানতো না পৃথিবীতে কমলাফুল নামে এক চা-বাগান আছে, সেখানে সে থাকবে। কিন্তু ওরা জানলে কি করে? ঠিকানাটা পেল কোথায়? বিকাশ কিছুতেই বুঝলে না তার এখানকার ঠিকানা ওরা পেল কী করে! এ কথা সে বিকেল থেকে ভাবছে। আর সে ভাবনায় সারা কলকাতা তার মন জুড়ে বসেছিল। তখনই মির্জার সঙ্গে দেখা। মির্জা তার টিলার কাজ সেরে অফিসে এল। বিকাশ তখন বেরুচ্ছে অফিস থেকে।

আরে বিখাশবাবু!—হঠাৎ উচ্ছ্বাস মির্জার।

কিছু না বুঝে হাসলে একটু বিকাশ।

মির্জা বললে, টু এ্যাণ্ড হাফ মিনিট্‌স্‌ ফর মি, প্লিজ!

বলেই নাটুকে ভঙ্গিতে অফিসে ঢুকেই ফের বেরিয়ে এসে বললে, চলেন, এক লগত যাইমু।

বিকাশ মির্জার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করলে। কিন্তু মনে মনে খট্‌কা দানা বাঁধতে থাকল, ব্যাপারটা কি?

চলতে চলতে মির্জা বললে, লেখেন-টেকেন, কবিতা?

মির্জার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলে বিকাশ, হাসিঠাট্টা নয়। কলকাতা বা এখানে, কবিতা লিখে শুনলে সবাই কী রকম হাসে। তাই নিজে সে কখনও বলে না কাউকে, এড়িয়ে যায়। কিন্তু অমর এসব খুব রটিয়েছে। ফল হয়েছে উল্টো। সবাই তাকে অন্য কিছু ভাবে। কিন্তু মির্জার স্বরটা পরিষ্কার। বিকাশ বললে, এই একটু-আধটু ভাল লাগে।

ভাল লাগে! হ, ভাল না লাগলে লেখবেন কেনে। অমরবাবুর মুখত্‌ সব শুইনছি। কিন্তু সত্য কথা উবায় জানন নি যায় বিকাশবাবু? শুইনলাম, আপনের নামত্‌ খইলকাতা থন পত্রিকা আইছে। আপনের কবিতা ছাপছে। বড় ভালা লাগল। আপনের কবিতা পইড়তে দিবেন নি?—বেশ সরল মনেই বলে গেল মির্জা।

বিকাশ বললে, কবিতা পড়তে ভাল লাগে আপনার? আধুনিক কবিতা?

কয়েন কিতা? মানুষটা আধুনিক যুগর আর ভালা লাগবে পৌরাণিক যুগ?—বলে হাসলে মির্জা।

বিকাশেরও হাসি পেল। বাঃ, বেশ বলছে তো মির্জা।

বিকাশের হাসি দেখে মির্জার উৎসাহ বাড়ে। বললে, কবিতার খাতা

লইয়া একদিন আয়েন আমার বাসাত্।
আপনিও লেখেন-টেকেন নাকি?—জিজ্ঞেস করে বিকাশ।
ফের হাসলে মির্জা। বললে, না। পইড়তে ভালা লাগে।
কি পড়েন?
কিতা আর পইড়তাম! এই ধরেন গিয়া জীবনানন্দ, বিনয় মজুমদার, সামসুর রাহমান, বোদলেয়ার, সুধীন দত্ত, এলিয়ট।
এ তো কবিতা! অন্য কিছু?
প্রবন্ধের বই।
গল্প-উপন্যাস?
আধুনিক খুব ভালা লাগে না। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের লেখাপত্র মাঝেমধ্যে খুব লাগে, চমক লাগায়।
আপনি লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ভক্ত?
ভক্তিটক্তি না মশয়, ভালা লাগে। শিলচার-গৌহাটি-খইলকাতা-আগরতলার বন্ধুরা পাঠায়। দুই চাইরখান পত্রিকা ত খুবই সুন্দর।
রাজনীতি নি করেন বিকাশবাবু?
বিকাশ হেসে ফেললে। এ সন্দেহের কথাটা ইদানীং খুব চাউর। কলকাতার যুবক হলে তো কথাই নেই, সবাই ভাবে পয়লা নম্বর নকশাল হবে। বললে, ওসব ততো বুঝি না।
কয়েন কি?—মির্জা অবাক হল। বললে, আমি ত ভাইবতাম নিশ্চয় লেফ্‌ট লাইনর মানুষ।
লেফ্‌ট-রাইট জানি না। মার্ক্‌স্ বলতে একটু-আধটু যা শোনা যায়, ভাল লাগে।
ই কথা কইবেন না। তলে তলে সকলে ভাইব্‌ব সর্বনাশ।
কিন্তু আমি তো শুনেছি চা-বাগানে কম্যুনিস্টদের প্রভাব খুব। লেবার-ওয়াকার্স ইউনিয়নে তাদেরই প্রাধান্য!
হঃ, তা ঠিক। কিন্তু বাবু-সাহেবের তা ভালা লাইগব ক্যান্ কয়েন? কুলিরা মানুষ ভাইবতে ত তারার আপত্তি।
বলছেন কি?
ঠিকই কইছি।
আর কথা হয় নি। বাসার কাছাকাছি এসে মির্জা দাঁড়িয়ে বললে, আইবেন নি কাইল? রাইতে।
যাবে বলে বিকাশ চলে এসেছে। মির্জার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাসন্তিয়া নামটা কয়েকবারই মনে এসেছিল। কিন্তু এমন অনুষঙ্গে তা কি তোলা যায়? জানালা দিয়ে মধ্যরাতের কুয়াশাচ্ছন্ন কমলাফুল চা-বাগানের

আকাশ চোখে পড়ছে। টু শব্দ নেই। ভয়ানক শীতে চারদিক জমে গেছে। বিকাশ দুলছে। কে পাঠাল পত্রিকাটা, বাসন্তিয়ার সঙ্গে ছোট সাহেবের সম্পর্ক, মির্জার আজকের অভাবিত পরিচয়, আর এই একটু আগের অমর—কিছুই মেলাতে পারছে না।
কিন্তু পত্রিকাটা? কে পাঠালে কলকাতা থেকে? কুয়াশায় ঢাকা কমলা-ফুল চা-বাগানের গভীর রাতের স্তব্ধতায় বিকাশের মনে কলকাতার মুখগুলো ভেসে উঠছে। সুমিতা? ওহ্, সুমিতাকে আজ পর্যন্ত চিঠি দেওয়া হয় নি। শংকর। শুভেন্দু। রবীন। নাঃ, এরা তাকে পত্রিকাটা পাঠাবে ভাবা যায় না। তবে কে। প্রশ্নটা মাথায় নিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল বিকাশ।

দশ

মানুষের পরিবর্তন কী ভাবে হয়? মানুষ তো বাঘ না যে, শিকার দেখলেই হালুম করবে, সাপ না, যে ভয় পেলেই ছোবল মারবে, শেয়াল না যে, ভাঙ্গা বেড়া দেখলেই মাথা গলিয়ে দেবে, বা গাছ-পাথর নয় যে, অনুভব-অনুভূতির ব্যাপারটা উহ্য থাকবে। তার বিকাশ এবং প্রকাশ দুই-ই চাই। এবং সে কারণে সে কখনো বাঘের মূর্তি পায়, সাপের বশ মানে, শেয়ালের চাতুর্যে বিশ্বাস রাখে, গাছ-পাথরের মতো প্রত্যক্ষে তার নিজস্বতার প্রকাশ এবং বিকাশ অদৃশ্য রাখে। মানুষ বলেই বস্তুজগতের যাবতীয় অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ প্রভাবে তার ভেতরে ক্রিয়া চলবেই। সে তা স্পষ্ট বুঝুক, চাই না বুঝুক।—ক'দিন ধরেই এ ধরনের কি ভাবনায় পেয়ে বসেছে। বিকাশ তা থেকে রেহাই পাচ্ছে না।
এ চা-বাগানে যত দিন যাচ্ছে ততই তার এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটছে সে বেশ বোঝে। কেবল সেটা সে চায় কিনা তা বুঝতে পারছে না। অথচ এ পরিবর্তন রোধ করা অসম্ভব। বিকাশ আলাদা বাসা নিয়েছে বলে অমর ভয়ানক বিরূপ হয়েছে। মির্জা বেশি কাছে এসেছে। বাগানের বাবুদের কারো সঙ্গেই তার বিরোধ নেই। তবু, সকলের সঙ্গেই যেন যোগসূত্রশূন্য এ এক অসহায় অবস্থা। চ-বাগানের শ্রমিক শ্রেণী বরঞ্চ অনেক সহজ। তাদের মনোভাব আচার-আচরণে স্পষ্ট, অসুবিধা হয় না। কিন্তু বাবুমহল?
অমর কেন কী ভাবছে, বিকাশ ঠিক ধরতে পারে নি। আলাদা বাসা নিয়েছে। অমর তাতে আপত্তি তোলে নি। অমরের বৌ অবশ্য বলেছিল, 'এখানে অসুবিধা হচ্ছে বুঝি।' মালা বড্ড সরল। অমরের

মুখের দিকে তাকালে বুঝতো হয়তো। কিন্তু সে তখন তাকিয়ে আছে বিকাশের দিকে। তাই তাকে হাসতে হয়েছে। বলতে হয়েছে, অসুবিধা মানে, আলাদা বাসা তো নিতেই হবে। যখন পেয়ে যাচ্ছি. নিয়ে নিই।
অমর কিন্তু হুঁ হাঁ করে নি। সে জন্যে বিকাশের দুঃখ নয়। অমর যে তার সম্পর্কে একটু বিরূপ হয়ে উঠেছে এবং তা কারণে-অকারণে মাথা চাড়া দিচ্ছে, কিন্তু একেবারে মিথ্যার আশ্রয় করে, সেটাই দুঃখ। একটা যন্ত্রণাও। ইচ্ছে হয়েছিল স্পষ্ট বলবে, অমর, তুই আমাকে ভুল বুঝছিস না। বলে নি।
দু'মাস হয়ে গেল কমলাফুল চা-বাগানে। দু'মাসে তার নিজের পরিবর্তনের বহর কম নয়। দু'দিন হল সে অমরের বাসা ছেড়ে অলাদা বাসায় চলে এসেছে। বাবুদের বাসা-বাড়ি সবই প্রায় এক চৌহদ্দিতে। কেবল মির্জার আর ডাক্তারবাবু, অরুণবাবু, কম্পাউন্ডার এবং নার্সের কোয়ার্টার কিছুটা দূরে। মির্জার বাসাটা একটা একটেরে টিলার মাথায়। মনে হয় বাগানের সব কিছু থেকে আলাদা, বিচ্ছিন্ন—মাটি থেকে শূন্যে। তাই মির্জাকে শূন্যস্থানী বলে হাসায় বিকাশ।
এভাবে একলা একটা বিরাট বাসা নিয়ে থাকার অভিতজ্ঞা কে জানে কেমন! বাংলো মতো বড় বাড়ি। বিরাট ঘর। বৈঠকখানা আলাদা। আলাদা রান্নাঘর। কলতলা, স্নানের ঘর, পায়খানা, ফুলের বাগান, সবজিক্ষেত, তিনটে কাঁঠাল গাছ, পাঁচটা কলা ঝাড়, একটা গোয়ালঘর—যদিও গরু পোষার কথা সে কল্পনা করতে পারে না। এসব দিয়ে তার কি হবে? খুব খরাপ লাগছে। কিন্তু উপায় নেই। আশ্চর্য! অমর একবার এল না। ভেবেছিল, আসবে। মির্জা দুদিনই সন্ধ্যার পরে এসেছে। হেরম্ববাবু এসেছে। অরুণবাবু অফিসে জিজ্ঞেস করেছে, কেমন লাগছে আলাদা। দীপেনবাবু বলেছে, কলকাতা লিখে দিন, আলাদা বাসাও হয়ে গেল।
বিকাশ হেসেছে। মানেটা স্পষ্ট। কিন্তু ভেতরে একটা কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করছে। অমরকে কী ভাবে বোঝাবে?
দূরে মেয়েদের একটা দলের গান উঠেছে। দূরে না, হেরম্ববাবুর বাসায়। বিকাশের মনে পড়ল, আজ পরবের দিন। পোষ সংক্রান্তি। এখানে বড় পরব। বাবুদের ঘরে ঘরে পিঠে-পায়েসের আয়োজন। বড় চাঘরবাবু সংক্রান্তির পরে, পোষ মাস কাটিয়ে মাঘ মাসে নতুন বাসায় আসতে বলেছিল। বিকাশ ভেবেছিল, অমরও তাই বলবে। অমর না বললেও মালা আপত্তি তুলবেই। তোলে নি। তুললেও সে শুনতো কিনা বলা যায় না। দুর্বলতা? মানুষের এটুকু দুর্বলতাও থাকবে না? অমর

বা মালা বললে মিমির মুখের দিকে তাকিয়ে বিকাশ তার বাসা বদলের কথা অন্যভাবে ভাবতো কিনা কে জানে। কিন্তু সব মিলিয়ে একটা দুঃখ তো দগ্‌দগে হয়ে উঠল। কী দিয়ে শুকোবে কে জানে।
এখানে তো তার নেই বলতে কিছু নেই। তবু জোগাড় হয়ে গেছে। চাঁদখিরার বাজার থেকে থালা-হাঁড়ি-ঘটি-বাটি-গেলাশ-হাতা-খুন্তি মায় দা-কাটারি সব ধারে কেনা হয়েছে রামব্রীজের দোকান থেকে। তেল-নুন চাল-ডালও। মাইনে পেয়ে সব শুধলেই হবে। আরো কিছু দরকার। একটা টেবিল-চেয়ার। কিছু বইপত্র। একটা ট্রান্‌জিস্টার রেডিও। হেরম্ববাবু একটা টেবিল দেবে বলেছে। অরুণবাবু চেয়ারের ব্যবস্থা করবে কথা দিয়েছে। বড় চাঘরবাবু বলেছে, শেষমেশ আমি ত আছিই বিকাশবাবু। যা দরকার বলবেন। চা-বাগানে অন্য অসুবিধা নাই কেবল মন টিকান ছাড়া।
পৌষ সংক্রান্তির দিন পরবের ছুটি। চা-বাগানে পরবের অভিজ্ঞতা প্রথম বিকাশের। কাল থেকেই লক্ষ্য করেছে সবাই বেশ খুশিখুশি। অমর ছাড়া আর সব বাবুরা তাকে নেমন্তন্ন করেছে, যখন খুশি গিয়ে মিষ্টিমুখ করে আসতে। হেরম্ববাবুর বাসাটা কাছে বলে কিনা কে জানে, সেখানে তার দুপুরে খাওয়ার নেমন্তন্ন।
একটা কথা ভাবছিল বিকাশ। না বলুক, সে চলে যাবে অমরের বাসায়। এখন? না, বিকালে? বিকালেই। চমরু তার বাসায় বহাল হয়েছে ম্যানেজার মেহরার অনুমতি মতো। বুড়ো মানুষ। জাতে মাদ্রাজি। বিচিত্র ভঙ্গিতে হিন্দি-বাংলা মেশানো মাদ্রাজি স্বরে কথা বলে। নেশাখোর। সুযোগ পেলেই হাঁড়িয়ায় ডুব দেবে। হাতে পয়সা পড়লেই হল। দু'দিনেই ওর স্বভাবটা ধরেছে বিকাশ। ভাল মানুষ। ছেলে-মেয়ে-বৌয়ের সঙ্গে বনাবনি নেই। তাই খুশি মাফিক যেখানে সেখানে রাত কাটায়। খেয়ালের বশে বাগানের কাজ করে। কখনো বা পনেরো-বিশ দিনের জন্যে বেপাত্তা হয়ে যায়। ফের এসে বাবুদের হাতে-পায়ে ধরে, ম্যানেজারকে সেলাম ঠোকে। বলে, এ্যায়সা আউর কভি নেই হোগা সাব। তুম মাই-বাপ। মাফি কি জিয়ে। হাম কাম মাঙ্‌তা।
এ বাগানের পুরোনো শ্রমিক। ক্ষমাঘেন্না করে ফের হাজিরা খাতায় নাম ওঠে চমরুর। কিন্তু কাজকর্ম বিশেষ পারে না। বয়েস হয়েছে। বিকাশ আলাদা বাসা নেবে শুনে বড় চাঘরবাবুই ম্যানেজারকে ধরিয়ে দিলে, গিভ চমরু টু বিকাশবাবু। বোথ উইল বি হ্যাপি।
মেহরা বললে, ইজ্‌ ইট্‌!
আই মিন।—বলে বড় চাঘরবাবু মাথা নাড়লে।

বড় চাঘরবাবুর কথাটা দীপেনবাবুকে বললে ম্যানেজার মেহ্‌রা। দীপেনবাবু বললে বিকাশকে, কবি মানুষ। চমরুকে ভাল সঙ্গী পাবেন। আপনার কাব্যের নেশা, আর তার হাঁড়িয়ার।

কথা শুনে অফিস শুদ্ধ সকলের হাসি। বিকাশ ভেবেছিল কি না কি! কিন্তু বড় চাঘরবাবু যখন চমরুর কথা বলেছে, যে যত হাসুক, তার কিছু মনে হয় নি।

দুদিনেই চমরুর সঙ্গে তার বেশ বনে গেছে। বিকাশ জিজ্ঞেস করেছিল, রাঁধতে জানো?

চমরু বোঝে নি। হাঁ করে হেসেছে। বলেছে, ক্যা বোলতা সমঝ্‌তা নেহি।

বিকাশ বললে, পকানে জানতা?

জরুর।—বেশ জোর দিয়ে বলেছে চমরু। এবার বুঝেছে।

তব আজসে হামারা খানা তুম পকায়গা।

নেহি, নেহি। উ ক্যা বাত বাবু। আপ বামহন নাই লাগি! পাপ লাগে হামকো। হাম পকানে নেহি সেকেগা।

মুশকিল! বিকাশ প্রথম দিন মুশ্‌কিল আসান করেছে সিদ্ধভাত আর ঘি দিয়ে। আজ দুপুরে নেমন্তন্ন। রাতে যা হয় হবে। কিন্তু এভাবে চলবে কি করে? চমরুর তো পাপ লাগবে, আর তারও যে পুণ্য হবে সে আশা নেই। তা ছাড়া, চমরুও তো খাবে দুবেলা। ভেবে কেনারা পাচ্ছে না কি করবে।

আরো কত সমস্যা! একা থাকার সমস্যা। মনটা কী রকম হয়ে আছে। হেরম্ববাবুর বাসা থেকে বোধ হয় গানের দলটা এগিয়ে আসছে। চমরুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে, কিসের গান?

চমরু একগাল হেসে বললে, জানতা নেহি? টুসু মাইকি পরব।

টুসু মাই! টুসু পুজো! কোথায় যেন এরকম কিছু শুনেছে বা পড়েছে মনে হল।

গান এগিয়ে আসছে। চমরু বললে, ইহা আই, গানা হোগা, নাচ হোগা। রুপেয়া দেনে পড়ি বাবু।

কেতনা?

পাঁচ-দশ—জো খুশ্‌।

গান তার বাসার গেট পেরুচ্ছে। কাছারিঘর, মানে বৈঠকখানাঘরের দাওয়ালে এসে দাঁড়াল বিকাশ।

পেছনে চমরু।

এক ঝাঁক কলকণ্ঠে নয়া গান শুরু হল,

আরে আরে লতুনবাবু তোর তো বড় নাম শুনি
টুসু এল তোহার ঘরে কি খাওয়াবি বল শুনি।

নানা বয়সের চল্লিশ-পঞ্চাশজন বাগানের কুলি-কামিন মেয়ে গানের রোলে মুখর। কাছারিঘরের চাতালের সামনে এসে দাঁড়াল। সবার আগে টুসুর মন্দির মাথায় করে মাঝবয়েসী একজন। বাঁশের বাখারি দিয়ে তৈরি মন্দির। রঙিন কাগজে মোড়া। কাগজের জাফরি কাগজের ফুল দিয়ে সাজানো। মেয়েরাও সেজেছে। কী ফুল চেনে না বিকাশ, কিন্তু তাদের সকলের খোঁপায় সাদা-লাল-হলদে ফুল গোঁজা। মন্দিরের ভেতরে মৃন্ময়ী টুসু দেবী তেল-সিঁদুরে লাল। গলায় গাঁদাফুলের মালা। মেয়েরা কেউ গাঁদাফুলে সাজে নি। দু'-একজন আবার বুনো সবুজ পাতাও গুঁজেছে খোঁপায় ফুলের সঙ্গে।

মন্দির মাটিতে রেখে সবাই তার চারদিকে নাচের ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে গান জুড়ে দিলে জোর। মুখে মুখে বানানো গান। একজন এক কলি জুড়ে দেয় প্রথমে তারপর সকলে এক সঙ্গে সে কলি দু'বার গায়। ফের নতুন কলি একজন জুড়ে দেয় আবার সেই কলি সকলে দু'বার গায়।

বেশ লাগে। বিকাশ ওদের গানটা খুব মন দিয়ে শুনছে। ওরা গাইছে,

আরে আরে লতুনবাবু কলিকাতা শহরে ছিলি
টুসু এল দেখা করতে তাকে বল তুই কি দিলি।
শীতের পোশাক লটর পটর খুব যে লিজে পরেছিস
শীতে টুসুর কী হাল হবে তুই কি কিছু ভেবেছিস।

বেশ তো! মন হালকা হয়ে আসে। গানের ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের মধ্যে নিঃশব্দ চোখাচোখি, হাসি, প্রগলভতা সবই দেখছে বিকাশ। সব নিয়ে একটা সরল উচ্ছলতা, সহজ আনন্দের টান। সকলের সাজগোজ একই ঢংয়ের। শাড়ি-ব্লাউজ যার যেমন ভালো আছে, চাদর-ওড়না যার যেমন দামী আছে পরেছে মনের মতো করে। হয়তো সে জন্যেই খুশির আমেজ লেগেছে এমন। এদের জীবনে আজও তো অভাব, অভিযোগ, যন্ত্রণার কমতি নেই। এরা সারা দিন শ্রম দেয়। রাতে সন্তান-সংসার-স্বামী—তিনের দিকে আলাদা দায়, ভিন্ন দায়িত্ব, বিভিন্ন কর্তব্য। বিকাশের ধারণা, চা-বাগানের মেয়েরাই খাঁটি সর্বংসহা। সবচেয়ে যেটা তাকে চমক দেয়, এদের স্বাভাবিক হৃদ্যতা, সরল মর্যাদাবোধ। এ দুই ক্ষুণ্ণ হলে এরা ভয়ংকরী। মাত্র কিছু সময়ের মধ্যে এটা বেশ দেখেছে বিকাশ।

গান চলছে,

বিহান বেলায় চা-লুচি খাস দু'পহরে ব্যঞ্জন-ভাত
টুসু কি খায় খবর নাই তার সারাদিন যায় কাটে রাত।

আরে আরে লতুনবাবু চেয়ে দেখ তুই টুসুর পানে
টুসু জাগে শীতের মাসে টুসু নাচে মোদের গানে।
আরে আরে লতুনবাবু দশটাকা দে টুসুকে
সামনের বছর তোকে টুসু দিবেক টুকটুক্ উষাকে ॥

বিকাশ একটু থমকে যাচ্ছিল। বুঝি আক্রমণ! কিন্তু না, ক্ষোভ-দুঃখ-যন্ত্রণার ভাষায় একটা আশার, আনন্দের ছোঁয়া মিশিয়ে সব গড়িয়ে দিচ্ছে। শেষ কলিটা শুনে খুব হাসি পেল। ইঙ্গিতটা চমৎকার, উপমাটা সুন্দর। আবার রূপকও বটে—'টুকটুক্ উষা', মজার কল্পনা। খুব খুশি হল বিকাশ। ঘরের ভেতরে গিয়ে সুটকেস থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করলে। দশ টাকা? হাঁ, দশ টাকাই ওদের দাবি। বিকাশ খুব আনমনা হয়ে যায়। মাত্র দশ টাকা? এদের এই স্বভাবজ উদ্ভাবন, সহজ সুর, সাবলিল কবিতা মিলে যে গানের স্পর্শ তার দাম? বাইরে উচ্চকিত গান চলছে। ভাবতে ভাবতে বিকাশ বুঝি বা একটু দেরিই করে ফেলছে। টাকা নিয়ে দলটা টুসুর মন্দির মাথায় তুলে গান গাইতে গাইতে বিকাশের বাসার বাইরে চলে গেল। এবার গানের কথা পালটে যাচ্ছে। বিকাশ মন দিলে সে দিকে।

আরে আরে ছোটবাবু, দেখ রে চেয়ে একবার
লতুনবাবু দশটাকা দেয়, তোহার বেশি রোজগার।
টুসু এল তোহার ঘরে বিশটাকা ফেল পুজোতে
টুসুর বরে ভালো হবে তা কি হবে বুঝাতে ॥

দলটা সত্যেন শিকদারের বাসার চত্বরে ঢুকে সুর তুলছে। তাকে এরা ডাকে ছোটবাবু বলে। ছোট হাজিরা বাবু, অমরের অ্যাসিস্টান্ট। গানের কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। ছোটবাবুর সঙ্গে বিকাশের তেমন আলাপ-পরিচয় হয় নি এখনও। ভদ্রলোক কী রকম লাজুক লাজুক। অনেক-গুলো ছেলেমেয়ে. ভাইবোন। বুড়ো মা-বাপ নিয়ে বিরাট পরিবারের বোঝা তার ঘাড়ে। হয়তো সে জন্যেই ভদ্রলোক গুটিয়ে থাকেন। সত্যেন-বাবু সম্পর্কে কারো কাছে কিছু তেমন শোনেও নি বিকাশ। দু'বছর তিন বছর অন্তর তার বৌ একটি শিশুর জন্ম দেয়—এ ছাড়া অন্য কোনও খবর কেউ রাখে বলে মনে হয় নি বিকাশের।

টুসুর গান অস্পষ্ট হতে হতে এক সময় মিলিয়ে গেল। বিকাশ তখনও দাঁড়িয়ে। কী ভাবছে ছাইভস্ম সব! চমরু এসে একগাল হেসে বললে, জল গরম হয়ে গেছে। মানে, চান করার জল। কী রকম কনকনে শীত। নাইতে ইচ্ছে হয় না। তাই গরম জল। পিপেতে ব্যবস্থা। এখানে প্রায় সব বাবুদের বাসাতেই টিনে বা পিপেতে জল গরম করে চান করে সবাই

সারা শীত কাল। কলতলার কাছে ইট পেতে উনুন। কাঠের আগুন। এখানে রেল স্টেশন ছাড়া কয়লার ব্যবহার নেই। চা-কারখানার বয়লারও চলে কাঠের আগুনে।

কাঠের আগুনের গল্প শুনেছে বাবার মুখে। সে আগুনে রান্নার স্বাদই নাকি আলাদা। বাবা বরাবর এরকম নানা ব্যাপারে তাঁর গ্রাম-জীবনের স্মৃতির সঙ্গে তুলনা করে একটা আফসোস তুলতে ভালবাসে। ওসব ধারণা নিয়ে অনেক হাসাহাসি করেছে তারা। এখন মনে হচ্ছে, ঠিক হাসির ব্যাপার নয়। এখানে রান্নার স্বাদ আলাদা তো বটেই। তা ছাড়া, কাঠের আগুনে রান্নার সঙ্গে একটা নতুন ঘ্রাণ লাগে, কয়লার আগুনে যা পাওয়া যাবে না। বাবা হয়তো অস্পষ্ট ভাবে এসবেরই স্মৃতি-চারণা করে, তারা বোঝে না। বিকাশের ইচ্ছে হচ্ছে, বৌদিকে লিখে, তোমরা একদিন কাঠের উনানে এটা-সেটা রান্না করে দেখ। কেবল স্বাদ আলাদা হবে না, ঘ্রাণ লাগবে নতুন, খাওয়ার একটা অন্য আনন্দ পাবে। যদি সত্যি লেখে, সবাই না হাসুক, ভাববে, বিদেশে ছেলেটা একা একা মন মরা হয়ে আছে। তক্ষুণি মা হয়তো ভাববে একটি মেয়ে দেখলে হয়। তারপরই ভাববে রমা-উমা চোখের ওপরে। অন্তত রমার বিয়ে না হতে বিকাশ কি রাজি হবে?

কী যেন গাইছিল ওরা—সামনের বছর তোকে টুসু দিবেক টুক্‌টুক্‌ উষাকে। *উষা, প্রভাত। অন্ধকার কাটিয়ে আলো। এক মানবকে এক কল্পিত মানবী। কী দেবে? আলো? দেয়, দিতে পারে! সুমিতাকে মনে পড়ে।* সুমিতার কাছে বড় অপরাধ করে বসে আছে। দেখতে দেখতে কয়েকটা মাস চলে গেল, লেখাই হল না সুমিতাকে কিছু। কী লিখবে? আজকের এই টুসুর গানের ব্যাপারটা লিখলে হয়। বুঝবে না, কিছু বুঝবে না সুমিতা। তবু মনে হচ্ছে, সুমিতাকেই লেখা যায়।

এগারো

টুসুর দলরে দিলেন কত?—হেরম্ববাবু জানতে চাইলেন।

দুপুরে হেরম্ববাবুর বাসায় নেমন্তন্ন খেতে বসে কথাবার্তা। বিকাশ একাই নিমন্ত্রিত। রান্নাঘরের বারান্দায় আসন পেতে ব্যবস্থা। করিমগঞ্জ থেকে হেরম্ববাবুর দুই খুড়তোতো ভাই, শিলচর থেকে কাকা এসেছে কী উপলক্ষে। বিকেলেই চলে যাবে তারা। এক সঙ্গে সবাই বসেছে। বিকাশ হেরম্ববাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, দশ টাকা। দশ টাকা! কয়েন কি?—হেরম্ববাবু অবাক হয়ে বলে, আপনেরে নয়া

পাইয়া হারামজাদিরা খুব জক্‌ দিছে বিকাশবাবু।
বিকাশ লক্ষ্য করলে অন্য সকলের মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ছে কিন্তু হাসছে না। বিকাশ জিজ্ঞেস করলে, আপনি কত দিলেন?
কত আর দিতাম! দুই টাকা বরাবইর দিছি। এইবার মাইনল না, পাঁচ টাকাই দিলাম।—বেশ একটা আফসোসের সুর টেনে বলতে বলতে হেরম্ববাবু হঠাৎ সুর পালটালেন, আমরার সিলটি পাক ভালা লাইগব নি আপনের?
সে কি? ভাল লাগবে না কেন? এই বেশ খাচ্ছি।—বিকাশ খুব লজ্জার সুরে বললে। তার খারাপও লাগছিল না ঠিকই। তবু হেরম্ববাবু ওভাবে বলায় ভেতরে একটা অস্বস্তি লাগল।
হেরম্ববাবুর স্ত্রীকে আগে দেখে নি বিকাশ। সে-ই পরিবেশন করছিল। মাঝবয়সী মহিলা। বেশ হাসিখুশি। বললে, কইলকাতার পুয়া। ডর লাগে। চুঙাপিঠা খাইবেন নি?
বিকাশ তাকিয়ে দেখলে তার হাতে বড় থালায় চাক-চাক ভাতের মন্ডের মতো একটা জিনিস আর মাছ ভাজা। পিঠে বলতে সে জানে বাড়িতে তৈরি কোনও মিষ্ট খাবার। কিন্তু তা তো সবশেষে পাতে পড়বে। অবাক হল বিকাশ। বললে, সব খাবো। দিন না!
পিঠের সঙ্গে মাছ ভাজা! এমন কম্বিনেশন শুনলে তাদের বাড়িতে সবাই হাসবে। হেরম্ববাবুর স্ত্রী তার পাতে পিঠেটা এক চাকলা আর মাছভাজা বেশ খানিকটা দিয়ে আর যারা বসেছিল তাদের পাতে দিতে থাকল।
হেরম্ববাবু খেতে খেতে বোঝাচ্ছে, ইতা আমরার সিলটর স্পেশাল। বুইজলেন নি বিকাশবাবু। বিরইন চাউলরে বাঁশের চুঙ্গায় ভইরা জল দিয়া, মুখটা কলাপাতা দিয়া বাইনতে হয়। তার পরৎ চুঙার গায়ে মাটির লেপ দিয়া লাকড়ির আগুনে সেই চুঙা বসাই রাখতে লাগে। আধাঘন্টা বাদে আগুন থাইকা চুঙারে তুইলা আনন লাগে। তার পরৎ ঠান্ডা হই গেলে বাঁশের চুঙা ভাইঙ্গা লম্বা লম্বা নলের মত বিরইন চাউলের পিঠা বাইর হইব। তারে চাকু দিয়া কাইট্টা চাকলা চাকলা কইরা লয়েন। তার পরৎ, দেখছেন নি, ঘি-নুন দিয়া খায়েন, মাছভাজা দিয়া খায়েন বা দুধ-চিনি দিয়া খায়েন, বড় ভালা লাগে।
বিকাশ খেতে খেতে বললে, আপনাদের বোধ হয় মাছভাজা দিয়ে খেতেই ভালো লাগে!
হঃ! মাছের কাছে বাঙ্গালীর কি খাদ্য বেশি কয়েন ছা! আমরার সিলটে কত জাতের মাছ। তা বলেন কেনে, পাকিস্তান হই গেল, গেল খাওন-দাওন। এখন বাংলাদেশ হওনের পরে বর্ডার পার হইয়া লুকাই-চুরাই

এপারে আসে, কিন্তু দাম যা, হাত দিতে ডর করে ।—বলতে বলতে হেরম্ব বাবু সজাগ হল। ব্যস্ত হয়ে বৌকে বলল, আটটু দেও বিকাশবাবুরে। কেন যেন বিকাশ কিছুটা বাচাল হয়ে উঠছে। বললে, আরো আছে, শুধু তো এ-ই না ! সবই তো খেতে হবে !

মুখে আঁচল টেনে নিঃশব্দে একটু হেসে চলে গেল হেরম্ববাবুর স্ত্রী। হেরম্ববাবু বলে, আপনের সামনে কথা কইতে লজ্জা লাগে তারার। আমরার কথা ভালা বোঝেন, না না-বোঝেন কে জানে।

আরে না না, তা কেন ! আমি বেশ বুঝি।—খুব দ্রুত কথা ক'টা বলে বিকাশ তাকাল অন্যান্যদের দিকে। তারা মুচকি হাসছে। তাদের কাউকেই বিকাশ চেনে না। হেরম্ববাবু অবিশ্যি বলেছিল, এই তার কাকা আর তাঁর দুই ছেলে। কাকা শিলচরের কোথায় যেন বাড়ি করেছে। ছেলেরা করিমগঞ্জে একজন চাকুরে, আর একজন ব্যবসা করে। করিমগঞ্জে অমরের সঙ্গে একবার বেড়িয়ে এসেছে বিকাশ। শিলচর যাওয়া হয় নি। এখানকার মানুষের কাছে করিমগঞ্জ-শিলচর বড় শহর, সখের বসতি, সুখের আস্তানা। অন্তত চা-বাগানের মানুষজন সে রকম ভাবে। তারা যখন সাতে-পাঁচে শহরে যায়, মনে হয় কী না কী জাঁকজমকের ব্যাপার। এটা সেটা কিনবে, মিষ্টি খাবে পেটপুরে, সাইকেল রিক্সায় ঘুরবে চেনা মানুষের সন্ধানে। তারপর ঘরে ফিরে এসে বুঝবে দরকারের জিনিস কত ভুলেছে আর অদরকারে গুচ্ছের টাকা খরচা করে বসেছে। তা হোক, আবার কেউ শহরে গেলে তার মারফৎ আনানো যাবে। চা-বাগানের বাবুরা শহরে গেলে যেন একার জন্যে যায় না, বন্ধু-বান্ধব সহকর্মীদের, তাদের মা-বাবা ভাই-বোন-বৌ ছেলেমেয়ে সকলের ফরমাস খাটতেও যায়। এখানে তাই নিয়ম। বিকাশের এসব বেশ লাগে।

হেরম্ববাবুর কাকার দিকে তাকিয়ে বললে, আপনাদের শিলচর যাওয়া হয় নি আমার। এবার একদিন যাব।

আপনে কইলকাতার মানুষ। শিলচার নি ভালা লাগব ! যায়েন যদি আগৎ খপর দিবেন। অ হেরম্ব, তুমি ছাই জানাই দিবা।—বেশ ধীরে ধীরে বলেন হেরম্ববাবুর কাকা।

ছেলেরা মুচকি মুচকি হাসছে। বিকাশ দেখলে। বুঝতে পারলে না কেন। হেরম্ববাবু ধমকের সুরে বলে, তোমরা হাইসছ কেনে ? হাইসবার অইছে কিতা !

বড়ছেলে বেশ স্পষ্ট কলকাতার ঢংয়ে বলে, বাবার কথা উনি ঠিক বুঝবেন ?

হয় হয় ! ইতা ঠিক্। আমার কতা উনি বুইজবেন কেনে ?—হাসলেন

হেরম্ববাবুর কাকাও।
বিকাশ বলে, আপনাদের কথা বুঝতে আমার সত্যি অসুবিধে হচ্ছে না। এ নিয়ে আপনারা সবাই অমন ভাবছেন কেন? আমার কথাও তো খাস কলকাতার নয়। আমাদের দেশ তো ছিল ফরিদপুরে। আমি দেশ দেখি নি। জন্ম থেকে কলকাতায়। আমার মা-বাবা তো বাঙ্গাল-ঘটি মিশিয়ে এক কিম্ভূত ভাষায় কথা বলে। শুনলে হাসি পায় ঠিক। কিন্তু ব্যাপারটাতে হাসির কি আছে বলুন। যার যেমন ভাষা। তাতে লজ্জারই বা কি!
কথাগুলো বলে ফেলে বিকাশই লজ্জিত হল মনে মনে। বেশ একটা বক্তৃতা গোছের ব্যাপার হয়ে গেল। বাঁচালে হেরম্ববাবুর বড় মেয়ে। সে কী একটা তরকারীর বাটি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। বললে, শুঁটকি মাছ, খাবেন তো!
মনে মনে চমকে উঠল বিকাশ। শুঁটকি! খাবে? খেতে পারবে? দেখা যাক। বললে, খাই নি কখনও। দিন—
শুনেছে, হেরম্ববাবুর বড় মেয়ে হেনা ডাক্তারি পড়ছে বিব্রুগড়ে। সে যে এসেছে তা জানতো না বিকাশ। ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করে, আপনি কবে এলেন। কিন্তু কী ভাববে সবাই কে জানে। সে চুপ করেই থাকল। হেরম্ববাবু বলে, আমার বড় মাইয়া। কাইল আইছে। দিন সাতেক থাইকব।
এবার বিকাশ সুযোগ পেলে। বললে, তাই! আপনিই ডাক্তার হতে যাচ্ছেন?
মাথা দোলালে হেনা। বিকাশ বললে, ডাক্তারের হাতে অখাদ্য পরিবেশন হবে না নিশ্চয়।
ইঙ্গিতটা বুঝে সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে হেনা বললে, শুঁটকি খাদ্য না অখাদ্য গবেষণা হয় নি। আপনি দেখুন চেখে।
বিকাশ খুশি হল। কথা বলতে জানে মেয়েটা। সকলের পাতের দিকে তাকিয়ে দেখলে শুঁটকির ঝোল দিয়ে ভাত মেখে গ্রাস তুলছে সবাই। সেও এক গ্রাস মুখে পুরে দিলে। ঘ্রাণটা একটু অস্বস্তিকর। প্রথম অভিজ্ঞতা বলে হয়তো। কিন্তু খেতে তো বেশ লাগছে! শুঁটকি নিয়ে একটা এলার্জির চল আছে—খুব নিন্দে-পরিহাস। চাঁটগায়ের লোকেরা শুঁটকি পছন্দ করে। তাদের এক আত্মীয় বিয়ে করেছে চাঁটগায়ের মেয়ে। তাকে সবাই খেপায় শুঁটকি সভ্যতা বলে। শেয়ালদা বাজারে সে নিজে দেখেছে শুঁটকির দোকান। পুরো চৌহদ্দিটা শুঁটকির গন্ধে দুর্ভেদ্য। নাকে রুমাল দিতে হয়। কিন্তু যারা খায় তারা দিব্বি

দাঁড়িয়ে দরদস্তুর করে কেনে, ব্যাগে পুরে বাড়ি ফেরে। শুঁটকির স্বাদই আলাদা—তারা বলে।

সে স্বাদ এখন পেল বিকাশ। মনে হচ্ছে ঘ্রাণটা যদি আয়ত্তে আনা যায় তা হলে শুঁটকি খেতে সত্যি সুস্বাদু। অবিশ্যি এসব ঠিক কাউকে বোঝানো যায় কিনা কে জানে।

হেরম্ববাবু শুঁটকির ঝোল দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে ভাত খেতে খেতে বলে, বুইজলেন নি বিকাশবাবু। আপনারা কইলকাতার মানুষেরা শুঁটকির সোয়াদ বুইজতেন যদি, আর ছাড়তেন না। আসল কথা কি জানেন, আমরার ই দেশৎ মাছ বড় বেশি আছিল্। মানুষে অত মাছ কি করব! শুঁটকি বানাই রাখত। শুঁটকি ত রাখন যায় যদ্দিন খুশি। পইচব না, নষ্ট হইব না।

শুঁটকি পরিবেশন করে একপাশে দাঁড়িয়েছিল হেনা। সে বললে, বিকাশবাবু, আর দেবো?

বিকাশ বললে, আজ আর সইবে না। বড্ড ঝাল।

হঃ, জাল না হইলে ভালা লাগে না। কে রাইনছে? তুমি নি? তুমি রাইনলে জালটা কমই হইছে কওন লাগে। —হেরম্ববাবুর কাকা বলে হেনাকে।

হেনা বলে, লঙ্কা ঠেঁসে খাও দাদু। তোমার ঝালের আন্দাজ আমি পাব কি করে?

চমৎকার! দাদু-নাতনির পরিহাসটা বেশ লাগছে। খেতে খেতে ভাবছিল, এর পরে আর কি? চমকে উঠল মনে মনে। প্রশ্নটা বড় ব্যাপক যেন, দ্ব্যর্থক লাগছে। সত্যি তো! এরপরে আর কি? নানা কথাবার্তা-হাসির সঙ্গে খাওয়া সারতে ঘন্টাখানেক সময় গেল।

আয়োজনটা ব্যাপকই ছিল। শাঁক, ভাজা থেকে তেতো, ঝাল, ঝোল, অম্বল এবং মিষ্টান্নে সমাপ্তি। অতো খাওয়া যায়! সবশেষে পাঁচ রকমের পিঠে, তারপরে পায়েস। খেতে খেতে হাঁপিয়ে উঠেছিল বিকাশ। খেয়ে উঠে আর দাঁড়ানো নয়। মুখ-হাত ধুয়ে চট্‌পট্ পলায়ন। বিকাশের যা অবস্থা, শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচে। বেঙ্গল কেমিক্যালের যোয়ানের আরক আছে এক শিশি। বাবা দিয়েছিল। নতুন জায়গায় খাওয়া-দাওয়ার গোলমাল হলে লাগবে। এত দিন লাগে নি। আজ সেটা খুলবে। হেরম্ববাবু, হেরম্ববাবুর কাকা, হেনার মা—বলা উচিত ছিল এদের, কিন্তু তাদের জন্যে অপেক্ষা না করে সে হেনাকেই বললে, আসি এখন!

একটু বসবেন না?

বিকাশের হাসি পেল। বললে, বসার মত অবস্থা নেই।

পান খাবেন ?
কিছু খাওয়ার কথা আর ভাবতেই পারছি না যে !
বলেন কি ? কিছুই তো খেলেন না !
আর কতো খাবো ! আমি কি রাক্ষস ?
হেনা হেসে ফেললে। সেই ফাঁকে বাইরে পা বাড়ালে বিকাশ।
শীতের দুপুর যে এমন হতে পারে কল্পনা করা যায় না। হেরম্ববাবুর বাসা থেকে বেরিয়ে—তিন মিনিটের পথ তার বাসা, এই তিন মিনিটেই সে তিন হাজার অনুভবের কম্পন নিয়ে ফিরে এল। চার দিকে কুয়াশা-কুয়াশা—প্রচণ্ড সূর্যের তেজ তাকে ম্লান করতে পারছে না। গায়ে একটা শিরশিরে শীত লেগেই আছে। কিন্তু বিকাশের ঘাম হচ্ছে। বুঝলে, খাওয়াটা বেশি হয়েছে বলেই কেবল ঘাম নয়, একটা হাঁসফাঁস অস্বস্তি। ঘরে ঢুকেই তড়িঘড়ি বাবার দেওয়া যোয়ানের আরকের শিশিটা খুঁজতে লেগে গেল বিকাশ। কিন্তু কোথায় ?
চমরু কাছে দাঁড়িয়ে তার কাণ্ড দেখছে। সে জিজ্ঞেস করলে, ক্যা হুয়া বাবু ? কুছ হারা গিয়া ?
নাজেহাল হয়ে বিকাশ বললে, কি জানি ?
তারপরই খেয়াল হল, সে তো বেশ নেমন্তন্ন খেয়ে এল, চমরুটা কি খেল খবর নেওয়া দরকার। বললে, তুম খায়া ?
হাঁ হাঁ, বহৎ !
বহৎ ! ক্যা পকায়া, কাহা ?—বিকাশের খটকা লাগে। ব্যাটা তার রান্না-ঘরেই রান্নাবান্না সারলে নাকি ?
কাহে ? আজ সব বাবুলোক কো বাসামে হামারা নিমন্তন্ হ্যায় বাবু। রাতমে ভি।
বলে কি ? সবাই চমরুকে নেমন্তন্ন করে বসে আছে ? কি জানি, এখান-কার হালচাল এখনও কত অজানা তার। এই পৌষসংক্রান্তির নেমন্তন্নটা—একেবারে নতুন স্বাদের। শুঁটকি মাছ সে কোন দিন খাবে কল্পনাই করে নি। চুঙাপিঠার নাম এবং পরিচয় এই প্রথম। তা ছাড়া, কত রকমের অন্য সব পিঠে-পায়েস। এবং আন্তরিকতা—ডাক্তার মেয়ের পরিবেশন—সব কিছু বর্ণনা দিয়ে একটা চিঠি ছেড়ে দিলে হয় কল-কাতায়। ওরা সবাই চমকে যাবে, কৌতূহলে পড়বে। সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখাবে হেনার কথায়। কিন্তু কি আশ্চর্য ! একটি ভদ্র শান্ত মেয়ে ছাড়া হেনাকে আর তেমন কিছু মনেই হচ্ছে না। যাক্ গে, যাক্ সে। যোয়ানের আরকের শিশি খুঁজতে ফের মন দিলে বিকাশ।
চমরু তার সাড়া না পেয়ে বললে, বাবু, রুপিয়া-উপিয়া হারা কুছ্ ?

নেহি। যোয়ান জানতা ?
হাঁ, জরুর !
কিস্‌কো বোলতা ?
জওয়ান তো জওয়ানকিই বোলতা বাবু। তো সো তুমহারা ঘরমে কাহে আওয়েগা ?
দূর ব্যাটা ! মনে মনে হাসছে বিকাশ। শিশিটা খুঁজে পেলে বোঝানো যেতো। বললে, এক কিসিমকা দাবাই।
দাবাই ? হামকো কাহে নেই বোলা—বলেই ঝট্‌ করে বাঁশের তৈরি তাক থেকে যোয়ানের আরকের শিশিটা নামিয়ে এনে বিকাশের হাতে দিয়ে বললে, ইয়ে হ্যায় না ! হাম রাখ দিয়া থা।
চমরুর ওপরে অস্হা বাড়ছে বিকাশের। নেশাখোর, কালসিঁটে রুক্ষ হারগিলে চেহারা হলেও আকর্ষণ করার মত একটা মায়া-মমতার প্রাণ বড় সরল রেখায় বহমান ওর শরীরে। গেলাসের জলে খানিকটা যোয়ানের আরক ঢেলে খেয়ে ফেলে চমরুকে জিজ্ঞেস করে বিকাশ, তুম পিয়ে গা ?
কাহে বাবু ?
ইয়ে তো হজমি দাবাই। আজ খানা-পিনা জায়দা হুয়া নেই ?
উহ্‌ হামারা নেহি লাগি।—বলে হাসতে হাসতে মাথার পাগড়িটা খুলে ফের বাঁধতে বাঁধতে ঘর থেকে বেরোয় চমরু। সেদিকে তাকিয়ে বিকাশের মনে পড়ল, সন্ধ্যা বেলা বড় চাঘরবাবু জনার্দনবাবুর বাসায় যেতে হবে—চায়ের নেমন্তন্ন। এ পরবের দিনে নাকি নেমন্তন্ন-টন্ন করে খাওয়াবার রেওয়াজ বিশেষ সেই। সকলেই সকলের বাড়ি যাবে, খাবে, আনন্দ করবে—এই নিয়ম। সে নতুন, তাই হয়তো তাকে হেরম্ববাবু নেমন্তন্ন করে খাওয়ালে, চাঘরবাবু চায়ের নেমন্তন্ন করেছে। অরুণবাবুও বলেছে। কেবল অমরের কাছ থেকেই সাড়া নেই। সেটাই সে আশা করছে সকাল থেকে। মনে হতেই চমরুর খোঁজে পার্টিকোতে চলে এল বিকাশ। চমরু টান হয়ে শুয়ে পড়েছে মেঝেতে। চোখ বোজা।
বিকাশ ডাকলে, চমরু, ঘুমা গিয়া, না কেয়া ?
বিকাশের সাড়া পেয়ে ধড়মর করে উঠে বসে বলে চমরু, নেহি বাবু !
অমরবাবুকো বাসা ছে কই আয়া থা ?
নেহি !
ঠিক হ্যায়।—বলে নিজের ঘরে এসে বাঁশের মাচার বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লে বিকাশ। আশ্চর্য ! অমরটা এমন ? ভয়ানক খারাপ লাগে। বড় বিপন্ন মনে হয়।
চোখ বুজে অনেকক্ষণ ভাবলে বিকাশ। মালাও অমরের ভুলটা শুধরে দিতে

পারে। পারে না কি ? আসলে ভুলটা যে কি তা স্পষ্ট করে সে নিজেও কি ধরতে পেরেছে? খুব সোজাসুজি তো এই বোঝায় যে, অমর মনে করে তার বাসায় বিকাশের অসুবিধা হচ্ছে, ভালো লাগে না। হা সংসার ! অমর, তোরা সংসারটাতে কালিঝুলি মাখিয়ে দিচ্ছিস! কিন্তু অমর যদি বিকাশের বাসা থেকে এভাবে আলাদা হয়ে যেতো, কি ভাবতো সে ? আর, এভাবে এক সঙ্গে বেশিদিন থাকা সহজও তো নয় ঠিকই! সহজ হলে দু'দিনে সব বিস্বাদ জোলো হয়ে যেত।
ঘুম আর এল না বিকাশের। সে কিছুটা অস্থির হয়ে উঠেছে। অমরের বাসায় যাবে আজ ? অমরের সঙ্গে বিরোধ, ভুল বোঝাবুঝি তার ভেতরে একটা সোরগোল তুলছে। পারে যদি, মালা আর অমর দুজনের সামনেই বলবে, অমর, তুই ভুল বুঝেছিস। তোর সঙ্গে আমার বিরোধ কোথায় ? বল, বুঝিয়ে বল।
শুয়ে চোখ বুজে যা ভাবা যায়, উঠে দাঁড়িয়ে চোখ মেলে তা বলা যায় না। সে কথা বিকাশ জানে। কিন্তু বড় অস্থির লাগছে। সেটা দূর করতে হলে অমরের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে হবে। আর একবার সব খতিয়ে ভাবলে বিকাশ। জামা-প্যান্ট পরে তৈরি হতে থাকল।

বারো

বেরোনো হল না। মির্জা এলে। সন্ধ্যা প্রায় নামছে। অসময় বলা যায় না। জামা-প্যান্ট পরা দেখে জিজ্ঞেস করলে, যাইবেন কোন্‌খানে ?
ঠিক তো, কোথায় যাবে! হাসলে বিকাশ। বললে, অমরের বাসায় যাব ভাবছিলাম!
যাইবেন পরে। আমিও যাইমু।
ঠিক আছে। বসুন! চায়ের ব্যবস্থা করি।
না। লাইগব না। একজন পাকের মানুষ লাগান, তখন চা-লুচি খাইয়া যাইব।
মন্দ বলেন নি। দিন না একজন। ভালো লোক হবে।
কিছু দিন সময় দেন।
বেশ।
আমিও এইবার একজন রাইখমু। একলা আর পারন যায় না।
আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আসবেন শুনলাম!
হঃ, স্ত্রী আইব, পাকের মানুষও আইব। দুইটা বাচ্চা। রান্দনের মানুষ না অইলে চইলব না। চা-বাগান, আমি বাবু মানুষ। আমার বৌ কাম-

কাজ করলে সকলে হাইসব। বারুরার বৌরার বিবি-রানী হইয়া না থাকলে মান থাকে!
বলে কি? বিকাশ অবাক হয়ে তাকায়।
হুঃ, দেখছেন কি?
হেরম্ববাবুর বাড়িতে—কথাটা শেষ হল না বিকাশের।
না, রান্দনের লোক নাই। তারার কথা আলাদা। সিলটর বামনরা বড় কট্টর। জাতপাতের লাগি প্রাণ দেয়। আইজ খাইলেন কেমন তারার বাড়িৎ?
আপনি জানলেন কি করে?—বিকাশ অবাক। হেরম্ববাবুর বাড়িতে তার নিমন্ত্রণের কথা মির্জা জানবে এটা ভাবে নি।
মির্জা একটু মুচকি হেসে বলে, চা-বাগানৎ লুকাই-চুরাই কত জনে কত কি কারবার করে, আবার হকলেই তা জানে। খালি কয়না, কইলে দুষ। যাউক গিয়া। আইজ পরবের দিন।
এ পরব তো আপনাদের নয়।
দুর মশয়! আপনেগ আমাগ ব্যাপারটা কি? পরব পরব। মানুষের পরব। সব মানুষেই আনন্দ করব। তার আবার আপনেগ আমাগ ভাইবা ভাগা লাগাইবেন ক্যানে?
বিকাশ অবাক হল। এত সহজে সত্যি তা নেওয়া যায় কি! বললে, সে রকম হলে তো অনেক সমস্যা মিটে যেত।
হইলে অর্থ কি বিকাশবাবু? হইয়াই আছে। আমরার বোজার ভুল। ধর্মের কথাটা ভুইলতে পারলে বেবাক এক। খাওন-দাওন, মিলন-মিশন, আমোদ-আহ্লাদে ধর্ম কি আলাদা সোয়াদ দেয় নাকি? দেখেন না, আইজ হগল বাবুর বাসাৎ-ই আমার দাওয়াৎ। গেছি, ডাক্তারবাবু, বড়বাবু, অরুণবাবুর বাসাৎ সকালে গেস্‌লাম। বিকালৎ আপনেরে লইয়া যাইমু আর আর হকলর বাসাৎ। আমি ত মুসলমান—সেই কথা মনৎ আসেই না বিকাশবাবু।
টুসু গানের দল আপনার বাসায় গিয়েছিল?
না।
কেন?
তা তারার মর্জি। তবে, আমারেও পয়সা দিতে হইছে।
তাই নাকি? কত?
পাঁচ টাকা দিছি কাইলই! তারার দলের কয়জন কাইল কামজারিৎ কইল, বাবু, তুই টুসুরে পাঁচ টাকা দিবি। দিলাম। আমার বাসাৎ তারা না যাউক, তারার গান আমি শুইনছি। আমার ভালা লাগে।

ওরাও আপনাকে অচ্ছুৎ ভাবে নাকি?

আরে মশয়, আপনেরা লেখাপড়া শিখ্যা জ্ঞান অর্জন কইরাও যদি কিছু না ভাবেন, এরা ভাইববে কি কইরা? তারা কিছুই ভাবে না। তুমি চামার, আমি কায়েৎ তোমারে ছুঁইমু না। তুমি হিন্দু, আমি মুসলমান তোমারে ছুঁইমু না—এর মধ্যে আবার ভাবনা-চিন্তার কি আছে, চিরকালই চইল্লা আইছে, আইজও চইলছে। তবে কথা কি জানেন, আর চইলব না। শ্রমের ঘাম সকলরই সমান বিকাশবাবু। সেইখানে ছোঁয়া-ছানির বালাই আর চইলছে না।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার দিকে। একটা শিরশিরে হাওয়া। সারাদিনের পাতলা কুয়াশাটা দিনের শেষ আলো মেখে একটা হালকা কমলারঙের চাদর হয়ে লেপটে গেছে চারদিকে। মির্জা পাজামা পরেছে। সাদা পাঞ্জাবীর ওপরে ঘি-রঙের সুয়েটার চাপিয়েছে। ভাল করে একবার তাকিয়ে বিকাশের মনে হল তারও শীত লাগছে। সে সুয়েটার পরে নি। চাদর চাপিয়ে বেরুবে ভেবেছিল। মির্জার দিকে তাকিয়ে, না মির্জার কথা শুনে, কে জানে, বিকাশ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল। এবার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বললে, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে ধর্মটর্ম নিয়ে আপনার তত মাথাব্যথা নেই।

আপনের আছে? কারই নাই। ঐ এক সংস্কার। যাউক—হেরম্ববাবুর বড় মাইয়ারে কেমন লাগল কয়েন।

মনে মনে খুব শক্ত হয়ে গেল বিকাশ। তবে এই জন্যেই মির্জা সাহেবের এখানে আসা! বললে, আমি তো আজ মাত্র দেখলাম!

পয়লা সাক্ষাৎ-ই ত আসল। কি মনে হয় না-হয়—

আমার কি মনে হবে না-হবে তাতে কি আসে যায়!

একটু হাসলে মির্জা। বললে, আপনে একইবার হরুতার মতন কইছেন।

বিকাশ বুঝতে পারছে না। জিজ্ঞেস করলে, হরুতা কি?

হা হা করে হেসে উঠল মির্জা। হাসতে হাসতেই বললে, এইবার চা খাওন লাগব বিকাশবাবু। হরুতা বুইজলেন না? পোলাপান—ছেলে-মানুষ।

এবার বিকাশেরও দম ফেটে হাসি এল। অদ্ভুত শব্দ—হরুতা। তবু হাসলে না। মির্জাকে বসতে বলে চায়ের উদ্যোগে ভেতরে গেল বিকাশ।

কেরোসিন কুকার জ্বালিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে একটু ভেবে নিলে কিছুক্ষণ। মির্জার কথাগুলো ঠিক ধরা যাচ্ছে না। হেরম্ববাবুর সঙ্গে মির্জার মন কষাকষি। মির্জা সেটা বাইরে তত টেনে আনে না। তাই

তার মনের ভাব সব সময় ধরাও মুশকিল। কিন্তু হেরম্ববাবুর মেয়ের প্রসঙ্গটা বিকাশের ভাল লাগে নি।
চা নিয়ে আবার যখন মুখোমুখি বসলে দুজনে, তখন সন্ধ্যে। চমরু হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রেখে গেল টেবিলের ওপরে। এতক্ষণে বিকাশের মন একটু নরম হয়েছে। বাইরে তাকিয়ে বললে, চা খেয়ে বেরুবেন?
ইচ্ছা আছিল। কিন্তু গেলেই খাওন। কত খাইবেন?
তবে না গেলেই হয়।
হয়, কিন্তু ভালা দেখায় না।
হেরম্ববাবুর বাসায় যাবেন?—মির্জার মন বোঝার জন্যে ফস্ করে বলে ফেলে বিকাশ।
যাওন উচিত। কিন্তু যাইমু না। ভদ্রলোক বড় কট্টর। প্যাঁচালও কম না। আপনে ত জানেনই সব।
কোন্ প্রসঙ্গে বলছে বুঝলে না বিকাশ। বললে, বুঝলাম না।
বুজলেন না? আপনে শোনেন নাই বাসন্তিয়ার কথা?
তা শুনেছি।—একটু হাসলে বিকাশ। বললে, আমার কিন্তু সেটা একটা বড় কৌতূহল মির্জাসাহেব। ব্যাপরটা কি, বলবেন?
কিছু না। হেরম্ববাবুর মনের ঝাল।
বলেন কি? আপনি প্রতিবাদ করলেন না?
কইরছি।
শুনি নি তো!
শুইনবার কথা না বিকাশবাবু. বুইজবার কথা। বোজন লাইগব। সারা বাগানৎ ই কথা লইয়া ঢি ঢি হইছিল। আমারে দেখছেন নি তখন? কি দেখছেন? কথাটা কি জানেন? সত্য সত্য, মিথ্যা মিথ্যা। বাসন্তিয়ার লগে আমার সম্পর্ক বাবু আর কুলির। কুলিরা বাবুরে বাসায় যায় আসে না? বাসন্তিয়া গেলে দুষ? কয়দিন দেখছে কোন্ মানুষে?—কিছুটা উত্তেজনা পেয়ে বসেছে বোধ হয়। সেটা বুঝে একটু থামল মির্জা। তারপরে বললে, আসল কথা বিকাশবাবু, বাসন্তিয়া খারাপ মেয়েছেলে ইতাই হকলে জানে, তার যে ভালাও কিছু থাকতে পারে ইতা কোন্ মানুষে ভাবে? তারে ভালা থাকনের কথা কে কয়? জানেন কিছু? যাউক, রাখেন ঐ সব। আপনে ঐ সবে যাইবেন না বিকাশবাবু। চা-বাগানের জগৎটা দেখেন খালি, বুইজতে চেষ্টা করেন।
বিকাশ মির্জার মুখের চেহারাটা লক্ষ্য করছিল। থামতেই বাইরে তাকালে। অন্ধকার। কুয়াশায় তা আরো জমাট। শীতও যেন সেই সঙ্গে নামছে বেশ জাঁকিয়ে। উঠে গিয়ে ভেতর থেকে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে

বেরিয়ে এসে পার্টিকোর জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে ফের বসলে। কিন্তু এ মুহূর্তে সবই তার কাছে অস্পষ্ট ঠেকছে। যেন ধাঁধা—মনে হয়, এই বুঝি সমাধান, তারপরই দেখছে, না, তা ঠিক নয়। সব গুলিয়ে যাচ্ছে। হাতের ঘড়িতে একবার চোখ বুলালে। সাড়ে ছয়। বেরুলে আর দেরী নয়। বললে, বেরুবেন নাকি ?

আপনের যা ইচ্ছা। পরেও যাওন যায়। আপনে কবিতা লেখেন, ভাবছিলাম অখন শুইনমু। পড়বেন নি ?

সময়টা ঠিকই আছে, কিন্তু মনের অবস্থা ! একটুখন ভাবলে বিকাশ। এখানে তার কবিতা শোনার মানুষও আছে দেখে ভাল লাগার কথা। কিন্তু ভাল লাগছে না। তবু, যেচে সেধে বলছে মির্জা। না শোনালে কি ভাববে কে জানে। একটু হেসে বললে, আমার কবিতা ভাল লাগবে না আপনার।

আহা, না শুইনলে তাই বা বুইজমু কিভাবে। আনেন, খাতা আনেন। আইজ কবিতার আসর লাগাইমু।

বাইরে গেট খোলার একটা শব্দ হল। তারপরই একটা ডাক, বাবু !

কে ? —বিকাশ উঠে গিয়ে পার্টিকোর দরজা খুলে দাঁড়ায়।

নগেন। অমরের রাঁধুনী বুড়ো। বাঁ হাতে টর্চ, ডান হাতে মাঝারি সাইজের টিফিন ক্যারিয়ার। সেটা এগিয়ে ধরে বললে, মা পাঠাইলেন।

অমর আছে ? —বিকাশ জিজ্ঞেস করে।

আছে। বড় চাষরবাবু, ডাক্তারবাবু আইছেন।

অ ! —মনে মনে ভাবলে, আর সবাইও যাবে নিশ্চয়। টিফিন ক্যারিয়ারটা নগেনের হাত থেকে নিয়ে বললে, তুমি তো বসবে না এখন ?

না, বাবু। কাম আছে। —বলে নগেন টর্চ জেবলে গেট পেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মির্জা বললে, না গেলি এই বিপদ। বাসাত্ পাঠাই দিব। কত খাওন যায় কয়েন ?

বসুন। রেখে আসছি এটা। —টিফিন ক্যারিয়ারটা নিয়ে ভেতরে রাখতে গিয়ে লক্ষ্য করলে এক টুক্‌রো ভাজ করা কাগজ ক্যারিয়ারের বডিতে গোঁজা। টিফিন ক্যারিয়ার রেখে ভাজ করা কাগজটা টেনে নিয়ে খুললে। চিরকুট—মালা লিখেছে, আসবেন ভেবেছিলাম। এলেন না তো ! এতো অভিমান কেন আপনার ?

আশ্চর্য ! কথা ক'টা পড়ে তার সারা শরীরে একটা কী যেন হয়ে যাচ্ছে। শরীরে ঠিক নয়, মনে—মস্তিষ্কে। মালার এ চিরকুটের পর তো আর যাওয়াই যায় না অমরের বাসায়। অসম্ভব।

কবিতার খাতা নিয়ে পার্টিকোতে চলে এল বিকাশ। বললে, শুনতে যখন চাইছেন, এখানে এসে যা লিখেছি তাই শোনাব।
মির্জা খুব খুশি। বললে, চালান!
বিকাশের যেন কি হয়েছে। জীবনে সে এই প্রথম তার নিজের কবিতা একটার পর একটা অনর্গল পড়ে যাচ্ছে। এখানে এসেতক্ বিশেষ কিছু লেখা হয় নি। তবু যা লিখেছে সব পড়লে। মির্জা চুপ করে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। পড়া শেষ করে একটু সলজ্জ হেসে বললে বিকাশ, ক'টা বাজে?
ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মির্জা বলে, বেশি না, সাতটা একচল্লিশ। আর লেখেন নাই?
না।
কেমন লাগল জানতে চাইলেন না যে!
সে তো শ্রোতার দায়। পাঠক পাঠ করেই খালাস।
কি কইমু কয়েন ছাই? আপনে যে খাঁটি কবি সেই কথা অক্ষরে অক্ষরে। দুঃখ কি জানেন, চা-বাগানে কে বুইজব আপনের কবিতা?
এই তো আপনি বুঝছেন।
আরে দূর! আমি আর কতটা কি বুঝি! ভালা লাগে, এই যা। তবে একটা কথা, আইজকাইল আপনেরা যা লেখেন তা কেবল আপনেগো কথা সুন্দর বুদ্ধি খাটাইয়া কবিতায় লেখেন। সব পাঠকে সব বুইজতে পারে না। ধরেন গিয়া, এই যে ছয়-সাত বছরের মধ্যি দ্যাশর কত উলট-পালট হই গেলা, কবি-সাহিত্যিকরার মনৎ তার কি ফল নাই কিছুতা?
মির্জা কি বোঝাতে চাইছে বিকাশ জানে। গত ছ'সাত বছরের দগদগে ইতিহাস, সে কলকাতার ছেলে, সে জানবে না? খুব জানে। কত কম সময়ে কত ব্যাপক রূপান্তর ঘটে যাচ্ছে মানুষের। মানুষেরা কি রকম বিচ্ছিন্ন একা হয়ে যাচ্ছে। বিকাশ কি জানে না? চা-বাগানে চলে এল কেন বিকাশ, কোন্ জ্বালায়? শুধু কি আর্থিক বেকারত্ব ঘোচাতে? আজকের মানুষ যে লাখ লাখ টাকা উপায় করেও অঢেল অপব্যয় করেও মানবিক বেকারত্ব ঘোচাতে পারছে না, সে জ্বালা-যন্ত্রণা তো তাকেও পোড়ায়। সে জন্যেই না কবিতা লিখতে হয়, না লিখে পারা যায় না। কেউ বুঝুক, চাই না বুঝুক। অন্তত নিজেকে বোঝার জন্যেও তাকে কবিতা লিখতেই হবে। মির্জাকে খুব আলতো করে বললে, কবিতা সবাই বুঝবে তা কি ভাবা যায়? কবিতা কেন, যে-কোনও বিষয় বুঝতে অভিজ্ঞতা, প্রবণতা, ভালবাসা এগুলো চাই!
হুঃ, তা ঠিকই। —মির্জা মাথা দোলালে।

বকাশের মনে হচ্ছে, মির্জা তার একটা কোমল তারে মোচড় দিয়ে ফেলেছে, হয়তো অজান্তে। কিন্তু তাতে যে সুর উঠতে চাইছে মির্জাকে কি তা শোনানো যায় ?
পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করলে মির্জা। বিকাশ বাধা দিলে। বললে, অনেকক্ষণ সিগারেট খাওয়া হয় নি। রাখুন ওটা, আমি দিচ্ছি।
মির্জা হা হা করে উঠলে—ঐ ত আপনারার দুষ। সিগারটর মধ্যে আবার আপন-পর কিসের বিকাশবাবু ! পাকিট থাকি তুইল্লেই ত নিজের।
মির্জার এই স্বভাবটাই বিকাশের ভাল লাগে। লোকটা রসিক। মির্জার প্যাকেট থেকে সিগারেট তুলে নিয়ে ধরালে। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে, চা-বাগানের গল্প শুনেছি, গল্প পড়েছি। মনে হচ্ছে, প্রায় সবই বানানো। সে সব গল্পের আকর্ষণ আছে, কলকাতার মানুষ সে আকর্ষণে কথনো সথনো তাকায় এদিকে। যেমন, আমি। কিন্তু জানেন, ভাবতেই পারি নি এখানেও মানুষের জীবন আর তার স্বাভাবিক জীবিকা-যন্ত্রণা-বোধ সবই কাজ করে আর আর দশটা মানব সমাজেরই মতো।
বিকাশ থেমে একটু হেসে বললে, ঠিক ঠিক বোঝাতে পারছি না হয়তো। বক্তৃতার মতো হচ্ছে। কিছু মনে করছেন না তো !
দূর মশয় ! বক্তৃতা বক্তৃতাই সই, চালান। আর কে শুইনছে ? আমি কইরমু কি ! চালান। —মির্জা বেশ জোর দিয়ে বললে কথা ক'টা।
বিকাশ তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলে, নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরেই বলছে কিনা মির্জা।

তেরো

মির্জার সঙ্গে বিকাশের ঘনিষ্ঠতাটা অনেকেরই অপছন্দ। এমন কি ম্যানেজার সাহেবদেরও নাকি সেদিকে বাঁকা নজর। বিকাশ অবিশ্যি তা খুব একটা আমল দেয় না। কিন্তু শ্রমিক মহলেও যখন তা নিয়ে কথা ওঠে সে তো হেলাফেলা করা যায় না। তারা নীরব দর্শকের ভান করে না। অর্জুন সর্দার তো একদিন তাকে বলেই ফেললে, এ বিকাশবাবু ; আপ তো বাহ্মন লাগে। তো উহ্ মুসলমান মির্জাসাবকো সাথ অতনা মজলিস কাহে !
বিকাশ মনে মনে চমকালে, কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে, তাতে কি দোষ সর্দার ?
নেহি, দোষকা বাত নেহি। উহ্ আচ্ছি নেহি।

কেন ?

আরে উহ্‌লোগকো খাতির দেশ ভাগ হুয়া থা না ?

অবাক হয়ে যায় বিকাশ। বলছে কি অর্জুন সর্দার! দেশ বিভাগের জ্বালাটা এরাও ভোলে নি তবে! কিন্তু সর্দার যে একটা বড় ভুল করছে তা বোঝাবে কি করে বিকাশ! বললে, সর্দারজী, সে তো কবেকার কথা। যারা তা করেছিল, করেছিল, তার জন্যে আজকের মানুষকে দোষ দেওয়া যায় না।

সাচ বাত। লেকিন মুসলমান লোগকো বিশওয়াস নেহি।

খুব ধাক্কা খেলে বিকাশ। বলে কি অর্জুন সর্দার। এরা তবে মনে মনে সাম্প্রদায়িক! অবশ্য বিকাশ জানে, শিক্ষিত উন্নত শ্রেণীর মধ্যেও অনেকে ঘোর অন্ধ সাম্প্রদায়িক। যদিও তারা জাত-পাতের ধার ধারে না, কিন্তু হিন্দু আর মুসলমানের বিভেদটা যেন কিছুতেই মুছে ফেলতে পারে না। আর সেটাকে জোরদার করতে দেশ বিভাগের নজিরটাই তুলে ধরে সকলে।

ইদানীং অর্জুন সর্দার প্রায় রোজই সন্ধ্যায় আসে বিকাশের বাসায়। পর্টিকোতে বেঞ্চির ওপর আসন করে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে এটা সেটা কথাবার্তা চালায়। বিকাশের ভালই লাগে।

সেদিনও সন্ধ্যায় তেমনি বসে এ কথা সে কথার মধ্যে মির্জার প্রসঙ্গ এল। সেই সঙ্গে আরও একটা বিষয়ও তুললে অর্জুন সর্দার। শুনে বিকাশ থ। অর্জুন সর্দার বললে, আপকো তো অমরবাবু লে আয়া থা। তু উনকো সাথ বনাও নেহি কাহে! উহ্‌ ঠিক নেহি বাবু।

বিকাশ হেসে বললে, তুমি এতো সব জানলে কি করে সর্দার ?

এ্যায়সা হি জানা। কই বোলা নেহি। হামলোগ দেখতা নেহি!

বিকাশ বললে, আরে না না, সেসব মিটে গেছে।

তব ঠিক বাত। আপ বিলকুল নয়া আদমি! বাগানমে ক্যা হোতা ক্যা নেই হোতা কুছ মালুম নেহি। সব কুছ ঠিকছে সমঝনে হোগা কি নেহি ?

বৃদ্ধ অর্জুন সর্দারের মূর্তিটা লণ্ঠনের লাল আলোয় একটা অভাবিত তাৎপর্য ফুটিয়েছে। বিকাশ চেয়ে আছে। অর্জুন সর্দারের চোখেমুখে মমতা। ক্ষণেক আগে মুসলমান বলে মির্জার দিকে ঘৃণা আর বিকাশ বিলকুল নয়া আদমি বলে তার প্রতি আশ্চর্য সহৃদয়তা—একই মানুষের মধ্যে, একই মানুষের দৃষ্টিতে, সব বুঝে উঠতে পারছে না বিকাশ। কিন্তু অশিক্ষিত, সরল, সংকীর্ণ জীবনে অর্জুন সর্দারের কপটতা নেই, অবিশ্বাসের আবিলতা নেই। যা বোঝে অনায়াসে গ্রহণ করে, যা ভাবে নিশ্চিন্তে প্রকাশ করে। এ জিনিস তো খুব একটা দেখে নি বিকাশ।

কলকাতাতে নেই, এখানেও না।
বিকাশ বললে, হাঁ সর্দারজী, সবই বুঝে নিতে হবে।
মাথায় ফেট্টি বেঁধে একটা কালো রঙের পশমী কম্বলে সর্বশরীর মুড়ে বেশ তোফা করে বসেছে সর্দার। বাবুদের ঘরে লেবার বা কুলি শ্রেণীর মানুষদের বসার আসন বস্তা। এখানে এই রেওয়াজ। বিকাশের বাসায় বস্তা নেই। অর্জুন সর্দার প্রথম যখন আসে একটা বস্তা ভাজ করে বগলে চেপে নিয়ে এসেছিল। বিকাশ বস্তায় বসতে দেয় নি। বলেছে, আমার এখানে বাবু-কুলি সর্দার-সাহেব সবার এক আসন, এই বেঞ্চি। চেয়ার যখন হবে, তুমি চেয়ারেই বসবে।
খুব হেসেছিল সর্দার। বলেছিল, কলকাত্তাকা হালৎ নেহি চলেগা বাবু।
—অর্জুন সর্দার বিকাশের মুখের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, আপ কলকাত্তাছে আয়া। কলকাত্তাওয়ালা আদমি বাগানমে ঠিক নেই হোতা। অমরবাবুকো দেখ্‌খো। কইকো সাথ মিল নেহি হোতা। কিত্‌না বরিস হো গিয়া, আভিতক্‌ হিয়াকা হালচালসে বনাও নেহি।
বিকাশ অবাক হয়। বলে কি সর্দার ! তার তো মনে হয়েছে অমরটা চা-বাগানের সঙ্গে মিশে মিলিয়ে গেছে। কলকাতার অমর কোথায় ? সর্দারের এই ধারণাটা কেন হয়েছে তা জানার কথা ভাবলে বিকাশ। বললে, না সর্দার, আমার তা মনে হয় না। অমর এই চা-বাগান, চা-বাগানের কুলি, মজুর সবকিছু খুব ভালবাসে ! ও তো এখন কলকাতার কথা ভাবেই না। ভুলে গেছে।
কুলি-মজুর লোগ্‌কো সাথ প্রেম ঠিক নেহি বাবু। বাবু কুলিসে আলগ্‌ রহেগা কি নেহি ! অমরবাবু কো কুছ্‌ মালুম নেহি। কুলি লোগকো পেয়ার করনেসে উ লোগ শির পর চড়েগা। উ লোগকো চাবুক হি সিধা রাখেগা, পেয়ার নেহি।
এক মুহূর্তে অর্জুন সর্দারের মর্জিটা স্পষ্ট হয়ে গেল বিকাশের কাছে। বিকাশ বুঝলে অমর সম্পর্কে সর্দার কেন অমনি বলছিল। এখানকার কুলি-কামিনদের সমশ্রেণী নিজেকে মনে করে না অর্জুন সর্দার। কুলিদের সে কি চোখে দেখে তা তো বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কেন ? এখানে কুলি-কামিনদের ইতিহাস অর্জুন সর্দার ভালো জানে। তবু তাদের দিকে তার টান নেই কেন ? বিকাশ বললে, কুলিরাও তো মানুষ সর্দার।
নেহি। উলোগ জানোয়ার।—তীব্র ঘৃণা ফুটে ওঠে সর্দারের চোখে-মুখে।
বিকাশ তাকিয়ে থাকে। বুঝতে চেষ্টা করে সর্দারের মনের ভাবটা। অন্য

একদিন সর্দার বলেছিল তাকে, হামছত্রী হ্যায় বাবু, ছাপরা জিল্লাসে আয়া। বাগানকা কুলিলোগ সবকই অচ্ছুৎ হ্যায়। ই লোগ ছুঁয়ে তো পানী ভি নেহি পিয়েগা হাম।—মনে পড়ে গেল বিকাশের। সেদিন অন্য প্রসঙ্গ ছিল। অর্জুন সর্দারের মনোভঙ্গিটা ততো ধরা পড়ে নি। আজকের কথার সঙ্গে সেদিনের কথাগুলো জুড়ে গিয়ে অর্জুন সর্দারের একটা শ্রেণীচেতনার সন্ধান দিয়ে দিচ্ছে যেন। স্বাধীনতার প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ বছর পার করেছে দেশ। তারপরেও এদের মধ্যে এই মনোভাব! তাজ্জব বনে যায় বিকাশ। আরও একটা ব্যাপার তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। কী বাবুশ্রেণী, কী কুলিরা—কেউ অর্জুন সর্দারকে খুব একটা পছন্দ করে না লক্ষ্য করেছে। বিকাশ কিছুটা যেন বুঝলে, অর্জুন সর্দারের প্রতি সকলের এ মনোভঙ্গি কেন। কিন্তু সর্দারের ওসব নিয়ে যে বিশেষ মাথা-ব্যথা আছে তা তো মনে হয় না।

বিকাশ বলে, সর্দার, জমানা বদল হয়েছে। তুমি অমন ভাবলে তোমাকে সবাই ঠেলে ফেলে দেবে।

অর্জুন সর্দার হেসে উঠলে। বললে, বাবুজী, আপতো ছোকরা হি লাগে। জমানা কাঁহা পালট গিয়া বোলো? কাঁহা? দেশকো হালৎ ক্যা হুঁয়া? আদমি লোগকো হালৎ ক্যা হুঁয়া? সমঝে, কই সমঝে? সাহেব লোগ চলা গিয়া তো সব গিয়া। উহি লোগ ঠিক কিয়া থা। স্বাধীন হুঁয়া কিত্না বরিস হুঁয়া বাবু? বাগান কো আচ্ছি হুঁয়া, কি খারাবি হুঁয়া? তোহারা ক্যা মালুম?

কি জানি! বিকাশ এসব বোঝে না। জিজ্ঞেস করলে, তোমার কত বছর হল সর্দার এ বাগানে?

চাল্লিশ বরিস হোগা জরুর। পঁয়ত্রিশ সালমে আয়া থা। হামারা উমের থা বাইশ বরিস।

দেশে যাও নি আর?

ফি বরিসমে যাতা বাবু। দেশমে হামারা খেতি-উতি হ্যায় না! ভাইয়া হ্যায়। উসকো লেরকা-লেরকি হ্যায়, ভাইকা বহু হ্যায়। কভি কভি উ লোগ ভি আতা হিয়া।

অর্জুন সর্দারের ছেলে-মেয়ে নেই। বৌ লছমি আর সর্দার। বিকাশ জানে। সর্দার যে বছরে একবার দেশেও যায়, তার আত্মীয়-স্বজনও যে এখানে আসে মাঝে-সাঝে এটা জেনে অবাক হল। এখানে বাবু শ্রেণী ছাড়া শ্রমিকদের যে অন্যত্র কারো কোনও ভিত আছে তা বিশ্বাস করা যায় না। শ্রমিকদের অনেকেই তো বলে, একদিন তাদের পূর্বপুরুষ কোথা থেকে এখানে এসেছে তা সঠিক কেউ মনে করতেই পারে না। চা-

বাগানই এখন তাদের পৈত্রিক ভিটের স্থান, মাতৃভূমি। কিন্তু অর্জুন সর্দার সে দলে নেই জেনে বিকাশের খুব ভালো লাগছিল না। তাই বললে, তুমি যখন আর কাজ-কাম করতে পারবে না, দেশেই চলে যাবে সর্দার ?
নেহি। দেশমে রহ্‌নে স্যাকেগা নেহি।
কেন ?
বাগান ছোঁড়কে রহেগা ক্যায়সে !
অদ্ভুত ! বাগানের শ্রমিকদের প্রতি তার ঘৃণা। শ্রমিকদের সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখতে সে নারাজ। তবু বাগানের পরিবেশ ছেড়ে নিজের দেশেও সে থাকার কথা ভাবতে পারছে না। অর্জুন সর্দারের এই ভাবটা বিকাশকে বেশ আকর্ষণ করে। বলে, তুমি বললে না, বাগানের হালচাল এখন ভাল নয়। তা হলে এখানে থাকবে কেন ? তোমার দেশ রয়েছে, জমিজিরেত রয়েছে। সে সব ছেড়ে—
বিকাশের কথা শেষ না হতেই সর্দার বলে, ছোঁড়েগা কাহে ? যায়গা নেহি ? সর্দারের মনোভঙ্গিটা ঠিক বুঝতে পারে না বিকাশ। এ মুহূর্তে বোঝা যাবেও না, ভাবলে। তাই অন্য প্রসঙ্গে কথা তুললে। বললে, চল্লিশ বছর ধরে এখানে আছো সর্দার। তুমি তো অনেক দেখেছ, অনেক জানো তবে তখন কেমন ছিল এই চা-বাগান ?
অর্জুন সর্দার হেসে উঠল। বললে, ক্যা বোলে বাবু ! সব কুছ ঠিক ঠিক কহ্‌নে ভি নেই স্যাকেগা আজ। গোলমাল হো যাতা।

জেঁকে নেমেছে শীত। সন্ধ্যা হতে না হতে ঘন কুয়াশায় চারদিক ঢাকা পড়ে। শীতের কামড় কথাটা বিকাশ অনেক শুনেছে। কিন্তু তা কাকে বলে টের পাচ্ছে এখানে। সন্ধ্যার পরে চারদিক নিশুতি। রাত যত বাড়ে অনুভব করে সে একা, বড় একা। অর্জুন সর্দার আসে, ভাল লাগে। মির্জা তার মর্জি মাফিক মাঝে-সাজে ঢু মারে। ভাল লাগে। যদি অমরও আসতো একদিন। মাত্র একদিন। তা হলে বিকাশ অমরের বাসায় যেতে পারতো রোজ একবার, রোজ। কিন্তু অমর আসছে না। অমরের মেয়েটা, অমরের বৌ মালা। মনটা বেশ অধীর হয়ে ওঠে।
অমর সম্পর্কে অর্জুন সর্দারের ধারণাটা মনে ঘুরপাক খায়। অর্জুন সর্দার এ বাগানের প্রাচীন অভিজ্ঞ মানুষ। নানা কুসংস্কার, নানা ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার ডিপো একটি। তবুও লোকটার সান্নিধ্য ভাল লাগে। ক'দিন হল সর্দারের পাত্তা নেই। কেন আসছে না কে জানে। মির্জাও আসছে না। এরা ছাড়া আর কেউ বড়ো একটা আসে না। সেও কারও বাসায় যায় না বিশেষ। সেই পৌষ পার্বণের নেমন্তন্ন খাওয়ার পরে

হেরম্ববাবুর মেয়ে এসেছিল একদিন। ডিব্রুগড় চলে যাবে, তাই দেখা করতে এসেছিল। ডাক্তারি পড়ছে। এবার ফাইনাল ইয়ার তার। ডিব্রুগড়ে যাবার অনুরোধ করে গেছে। কিন্তু ভাল লাগে নি বিকাশের। কিছুটা গায়ে পড়া ভাব যেন। ডাক্তার হয়ে বেরোবে বলে একটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মনোভঙ্গি। সামনের বছর জুনিয়র। তারপর প্র্যাক্‌টিস, না চাকরি? বিকাশ জিজ্ঞেস করেছিল।
বেশ একটু হেসে হেনা বলেছে, চাক্‌রি করবো কেন? প্র্যাক্‌টিসই চাই। এ অঞ্চলে নয়, কলকাতা। আপনি কলকাতার লোক, আপনার সঙ্গে তাই যোগাযোগ রাখতে চাই।
বিকাশ ভাবলেশহীন ভাবে বলেছে, এখন তো চা-বাগানে আছি। কলকাতা এখন কতদূরে! আপনি যখন প্র্যাক্‌টিস করবেন, তখন যদি কলকাতা যাই, অসুস্থ হলে আপনার স্মরণ নেব—
খিল খিল করে হেসেছে হেনা। বিকাশ কেন যে হাসে নি! হাসে নি ঠিক নয়, হাসি আসেই নি।
হেনাকে চা-বিস্কুট খাইয়েছে বিকাশ। নিজে হাতে চা করে কোনো মেয়েকে—কোন দিন কল্পনাও করে নি বিকাশ।
চায়ের সঙ্গে বিস্কুট দেখে হেনা বললে, চা-বাগানের রীতি এটা নয়। চা-বাগানে শুধু চা।
আপনার ডিব্রুগড়েও কি শুধু চা?—জানতে চেয়েছে বিকাশ।
ডিম্ব! ডিম সিদ্ধ। —হেনার চট্‌পট জবাব। মুখে সামান্য হাসির ছোপ।
তখন ততো মনে মাখে নি হেনার কথাবার্তা। এখন যখন মনে পড়ে, কেমন লাগে। মেয়েটা যে খুব বেরসিক, তা বোধ হয় নয়। আসলে সে-ই খুব একটা আমল দিতে চায় নি বলে হয়তো সেদিনের কথাবার্তার স্বাদটা তখন তেমন নিতে পারে নি। নয় তো—
হেনা বলেছিল, আপনি নাকি কবি?
কে বললে?
শুনেছি। আমি কবিতার ক-ও বুঝি না।
সুতরাং কবিদের দু'চক্ষে দেখতে পারেন না নিশ্চয়।
কোনও কবির কাছাকাছি তো এই প্রথম। দু'চক্ষে দেখতে পারবো কিনা এখনই কি করে বলি।
মেয়েটা কথা বলতে জানে। তবুও ভাল লাগে নি। মির্জা বলেছিল, হেরম্ববাবুর মাইয়া দেখতে ভালো, চালাক-চতুর। আলাপ করতে পারেন।

মির্জা কেন হেনার সঙ্গে তাকে আলাপ করতে বলেছে বিকাশ অনুমান করে হাসে মনে মনে। নারী আর পুরুষ নিয়ে সরল ধারণাটা থেকে কবে যে মুক্তি পাবে এদেশের মানুষ! যে কোনও মেয়ের কাছাকাছি এলেই যেন যে কোনও ছেলের মন গলে যাবে। আজকের মানুষ যে কত জটিল—কী নারী, কী পুরুষ। চা-বাগানের এরা তা আজও বোঝে না ভাবলে তাজ্জব লাগে।

রাত হয়েছে। নিশুতি রাত, শীতের রাত। কুয়াশা। রাত-পোকারও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। চমরু খেয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে মোটা কম্বল মুড়িসুড়ি দিয়ে। তার বিছানাটা অদ্ভুত। চার-পাঁচটা বস্তা একটার ওপরে আর একটা পেতে মোটা করে নিয়ে শোয়। মশারি লাগে না। গায়ে-হাতে-পায়ে-মুখে কেরোসিন তেল মেখে শুয়ে পড়ে। হাসতে হাসতে বলে, মছর ক্যা করেগা বাবু। মছরলোগ হামারা সামনা ভি আনে নেই স্যাকেগা।

ভয়ানক মশা। মশারি ছাড়া ঘুমোনো অসম্ভব। চা-বাগানের কুলিদের প্রায় সকলেই মশারি ছাড়াই দিব্বি ঘুমোয়, রাত কাটায়। এই অভ্যাস। অর্জুন সর্দার বলে, এরা মানুষ নয়, জানোয়ার। বিকাশের বড় কষ্ট হয় ভাবতে। এরা সত্যি মানুষ হয়েও মানুষের জীবনযাত্রা, মানুষের মর্যাদার সন্ধান আজও পায় নি।

আজকাল এই এক ব্যামো হয়েছে বিকাশের। যখন তখন যতো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন চিন্তা এসে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কোনোটার সঙ্গে কোনোটার যোগসূত্র নেই, কিন্তু আসে। এ অবস্থায় আর কলকাতার কথা মনে পড়ে না। মনে পড়ে না বিকাশ আচার্যের চিন্তা করার মতো আর কি আছে! তার মা-বাবা ভাই-বোন পারিবারিক জীবন, তার কলকাতার বন্ধু-বান্ধবী। সে সব যেন কত অতীতের। যেন কোনও দিন আর সে সবের সংস্পর্শে সে যাবে না। যেন এই চা-বাগানই ধ্রুব সত্য। কিন্তু এর কোনও ধারণাই তো ঠিক সত্যি নয়—তাও তো জানে বিকাশ। তবে?

বাইরের দরজায় একটা ঠক্ ঠক্ শব্দ। লণ্ঠন হাতে নিয়ে সামনের পর্টিকোতে এগিয়ে এসে বিকাশ বললে, কে?

আমি!—অমরের গলা।

রাতের নিশুতি ভাবটা যেন মুহূর্তে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল! আড়ষ্টের মতো দরজা খুললে বিকাশ। সঙ্গে মালাও! দুজনেই ভেতরে চলে এল। ঠিক কি বলবে বুঝতে পারছে না বিকাশ।

মালা বললে, খাওয়া হয়ে গেছে?

বিকাশ হেসে বললে, কখন !

তাক্ লেগে গেল বোধ হয়, কি বলিস ?—অমর খুব সহজ স্বরেই বললে।

মালা হাসছে। হাসতে হাসতেই বললে, আজ ঘুম হবে আপনার বন্ধুর। আপনি আলাদা বাসায় চলে আসার পর থেকে রাতে আর ঘুমোয় না।

কেন ? —বিকাশ ঠিক ধরতে পারে না।

জিজ্ঞেস করুন আপনার বন্ধুকে। —মুচকি হাসে মালা।

অমরও হাসছে। বিকাশ অমরকে বলে, কি হয়েছে তোর ?

বিকাশের প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে অমর বলে, কাল তো ছুটি। সকালে চলে যাবি আমার বাসায়।

মির্জা সাহেব সকালে আসবে বলেছে। —বিকাশ বললে।

মির্জাকে নিয়েই যাবি। —অমর বলে।

কী ব্যাপার বল তো। —বিকাশের বেশ রহস্য রহস্য মনে হয়।

মালা বলে, কাল মিমির জন্মদিন।

তাই ? খুব ভালো খবর। কিন্তু—

তোকে আর কিন্তু কিন্তু করতে হবে না। মির্জাকে কিছু বলবি না। জানলে, ব্যাটা হয়তো মিমির হাতে একগোছা টাকাই দিয়ে বসবে।

কিন্তু সকালে কেন ? বিকেলে, সন্ধ্যাসন্ধি—

সে কলকাতার ব্যাপার। এটা চা-বাগান, কলকাতা নয়। অনুষ্ঠান নয়, অন্য কাউকে বলছি না। তুই কেবল—

দুপুরে আমাদের ওখানেই খাবেন।—বলে, মালা অমরের দিকে তাকিয়ে বললে, এবার চলো।

হাঁ, যাবো ! —অমর ঘরের চারদিকে তাকিয়ে বললে, আমি ভেবেছিলাম বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছিস। কিছুই তো করিস নি দেখছি।

হাসলে বিকাশ। বললে, হবে।

অমর আর মালা চলে যাওয়ার পরে বিকাশ শুয়ে পড়েছে। শোয়ার আগে লণ্ঠনটা ডিম করে রাখে রোজ, নেবায় না। আজও তাই করেছে। শুয়ে শুয়ে মনে এল, প্রায় দু'মাস হয়ে গেল তার আলাদা বাসা। মানে, সব আলাদা। অমর, মালা, মিমি—সবাই আলাদা। আজ একেবারে স্পষ্ট সব। মিমির জন্মদিনে এখানে অমরের একমাত্র কাছের মানুষ সে, তাও বোঝা গেল। কিন্তু আলাদা।

আমরকে ঠিক ধরা গেল না। এমন আকস্মিক, এমন অসময়ে, এমন অভাবিত অবস্থায় ধরা যাবে তাও তো ভাবা যায় না। তবে, খুব

স্বাভাবিক লেগেছে, খুব স্বাভাবিক। হয়তো তার নিজেরই ভুল। খামোকা যা খুশি ভেবেছে দিনের পর দিন।
ডিম করা লণ্ঠনের আবছা আলোটা আজ ভাল লাগছে না। হয়তো জেগে আছে বলে। উঠে এল বিকাশ। আর একটু বেশি ডিম করতে গিয়ে নিবে গেল লণ্ঠনটা। বিকাশ বুঝতে পারলে না, ঘন অন্ধকারে সে ডুবে যাচ্ছে, না ভেসে উঠছে।

চৌদ্দ

বিকাশের দাদা অমরকে চিঠি লিখেছে কলতাতা থেকে। অনেক দিন হল বিকাশের কোনও খবর নেই। চিঠিপত্র লিখছে না কেন, অসুখ-বিসুখে ভুগছে, না কী—অমর যদি সত্বর জানায়, তা হলে সবাই নিরুদ্বেগ হতে পারে।
মালাকে দেখালে চিঠিটা। চিঠি পড়ে মালা বললে, তুমি আজই জবাব দিয়ে দাও।
অমর বললে, আমি দেবো কেন ? ওকেই লিখতে হবে। কালই ধরবো। বলবো, আমার সামনে বসে আগে চিঠি লিখ্। আমি ডাকে ফেলে দেবো।
যাঃ! ছেলেমানুষ নাকি! —মালা হাসলে।
অমর বললে, তুমি জানো না, বিকাশ ঐ রকম। ঘাড়ে ধরে করাতে হয় সব।
তোমার বন্ধু, তুমিই ভালো জানো। —মালা ফের হাসলে।
অমর বললে, না, হাসির কথা নয়। ওর জন্যে ওর মা-বাবা ভাই-বোন সবাই ভাবছে, এটাও ওর মাথায় নেই।
কি জানি! আমার অতো মনে হয় না।
মিমির জন্মদিনে দেখলে না, কী কাণ্ড করলে।
তা, তোমার বন্ধুর দোষ নয়। এমন জায়গায় আছি, ইচ্ছে মতো কিছু করার জো নেই। কি করবে বেচারা। মিমিকে খুব ভালবাসে তো!
তাই বলে না বলে-কয়ে ছুট্‌বি করিমগঞ্জ! বল্‌লাম সকালে আসতে। সকাল গেল, দুপুর গেল বাবুর পাত্তা নেই। তবু ভাগ্য, চমরুকে বলে গেছিল। নইলে আমাদের দশাটা কী হতো বলো!
তা একটু বাড়াবাড়িই করেছে বিকাশবাবু।
কী বলেছে শোন নি সেদিন ? করিমগঞ্জ ছাড়া যখন এখানে কোথাও মনের মতো কিছু কেনার দোকান-পাট নেই, তখন আর যাবে কোথায় ?

যুক্তিটা বোঝো। যদি দিল্লী ছাড়া,আর কোথাও কেনা-কাটার জায়গা না থাকতো, তা হলে সেদিন দিল্লীই ছুট্‌তো—ভাবখানা এই।
বলতে বলতে অমরও হাসলে।
রাত হয়েছে। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মিমি। অমর আর মালাও খেয়ে-দেয়ে পান চিবুতে চিবুতে শোবার ঘরে খাটের ওপর বসে কথা বলছে। মালা বললে, তুমি চেয়ারে গিয়ে বসো। আমি মশারিটা খাটাই। মিমিকে মশায় কামড়াচ্ছে।
উঠে এসে চেয়ারে বসে খেয়াল হল, নগেন তামাক সেজে গড়গড়ি হুঁকো ঠিক রেখেছে সময় মতো। তারই খেয়াল হয় নি কথায় কথায়। ভুরুক্‌ ভুরুক্‌ কয়েকটা টানে ধোঁয়া টেনে ছড়িয়ে দিলে অমর। মনে হল, এ দৃশ্যটা যদি বিকাশ দেখতো—মিমি ঘুমিয়ে, মালা মশারি খাটাচ্ছে, সে গড়গড়িতে তামাক টানছে—লণ্ঠনের লাল আলোয় বিচিত্র দৃশ্য। আবার মনটা মোচড় খেয়ে উঠল। বিকাশটা যদি তার বাসাতেই থাকতো, কত ভাল হতো। মনখুলে কথা বলা যেত। এই চা-বাগানে বিকাশকে টেনে এনে অমর ভেবেছিল তার একলা ভাবটা ঘুচবে। কিন্তু বিকাশের মতি কলকাতাতে যখন বেকার ছিল একসাথে তখনও বোঝে নি, আর এখন তো দীর্ঘকাল ছাড়াছাড়ির পরের মানুষ দু'জনেই। তা ছাড়া, তার বৌ-মেয়ে আছে, পারিবারিক দায়-দায়িত্ব আছে। বিকাশের তার মতো অমন কিছু নেই। অন্যাদিকে হয়তো তার চেয়েও অনেক বেশি আছে বিকাশের। মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব,লেখাপড়া—অনেক, অনেক। সে সব মনোজগতের ব্যাপার। অমরের তেমন বাড়তি মনোজগৎ নেই। কাজ করে, খায়দায় ঘুমোয়। ব্যস, জীবনযাত্রা। বিকাশটা এসেই যেন কী রকম একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিচ্ছে। না রে, এ-ই সব নয়, আরো আছে। দ্যাখ, একটু তাকিয়ে দ্যাখ। ভালমন্দ দোষ-ত্রুটির মিশেল ছাপমারা মানুষগুলোর মুখে অসহায় স্মৃতি—আমরা চেয়েছিলাম। চাওয়ার এক দুর্বিষহ আকুতি নিয়েই হাঁটা ধরেছিলাম। কিন্তু—
চট্‌ চট্‌ করে দুবার শব্দ হল মশারির ভেতরে। মালা মশা মারছে দু হাতে। অমরের ভাবনাটা ভেঙ্গে গেল। হুঁকোর নলে টান দিয়ে কেবল গুড়গুড় শব্দ তুললে কয়েক বার। কলকের দিকে তাকিয়ে দেখলে, আগুন নেই, কখন নিবে গেছে।
সারাদিনের কাজকর্ম খাটুনি। রাত হলে আর শরীর মানে না। চা-বাগানে কুলি-বাবু সকলেরই একই দশা। তবু মাঝে মাঝে সকলেরই কি মন বলে ব্যাপারটা সজাগ হয় না? হয়। কিন্তু জাগিয়ে রাখতে পারে না। বিকাশ যদি পারে—পারবে কি? অমর বেশ মনমরা হয়ে পড়ে। বিকাশকে

এখানে টেনে আনার জন্যে সে যখন কাঠ-খড় পোড়াচ্ছে তখন একবারও অন্য কিছু মনে আসে নি। এলে হয়তো অমর এখানে বিকাশের চাকরির কথা ভাবতই না। বিকাশের চাকরির খুব দরকার। কিন্তু তার চেয়েও বেশি দরকার তার নিজের জন্যে বিকাশকে—এমনি একটা ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছিল। তাই সে বিকাশের চাকরি যাতে হয় তার জন্যে ছোট-সাহেব বড়সাহেব বড়বাবু চাঘরবাবু ডাক্তারবাবু—সবাইকে ধরেছিল। বুঝিয়েছিল, চা-বাগানে লেখাপড়া জানা মানুষ অতো কোথায়? তারা আসবেই না। বিকাশ আসবে। বিকাশ তার বন্ধু বলে আসবে, মানুষ বলে আসবে, কবি বলে আসবে। নিজে এভাবে বুঝেছে। তারপর সবাইকে বুঝিয়েছে। বিকাশ কিন্তু বলেছিল, 'তুই লিখলি, এলাম চলে। আর কিছু ভাবিই নি।' অমরের মন ভরে গেছিল। তারপর? তারপর যে কি হয়ে গেল তার নিজের!

মালা তাড়া লাগালে, কী ভাবছ? দেখো কত রাত হয়েছে। তুমিও কবি হয়ে গেলে নাকি?

মনে মনে হাসলে অমর। কবি কাকে বলে জানে মালা? যেন বিকাশকে দিব্বি বুঝে ফেলেছে। বললে, ইচ্ছে হলেও তুমি কি আর হতে দেবে?

না বাবা, কবি-টবি চলবে না।—মালা বেশ একটু বিদ্রুপের স্বর তোলে।

অমর বলে, তামাকটা নিবে গেছে।

আমি আর এখন মশারির বার হতে পারবো না।—বলে শুয়ে পড়লে মালা।

অমর আর সাড়াশব্দ তুললে না, চুপচাপ বসে থাকল। তার এখন উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না। সে কথা মালাকে বোঝাতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। তার চেয়ে মালা ঘুমোক, রাত হোক আরো, অমর কিছুটা আত্মস্থ হতে পারবে।

নতুন করে তামাক সাজার জন্যে কলকেটা হুঁকোর মাথা থেকে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে এল অমর। এঘরে নগেন ঘুমোয়। দেয়াল ঘেঁষে এক দিকে বাঁশের মাচা। তার ওপরে বিছানা পেতে মশারি খাটিয়ে শুয়েছে নগেন। হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে। ডাকলে ঠিক উঠবে। কিন্তু ইচ্ছে হল না ডাকতে। বুড়ো মানুষ। সারাদিন খাটাখাটুনি। সে সব ভেবেই লণ্ঠন নিয়ে ঢোকে নি অমর। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে তামাক-টিকে-হুঁকো রাখার জায়গাটায় আন্দাজ মতো আসতে কিসে পা লাগতেই ঠুক করে একটা আওয়াজ হল। ভেবেছিল নগেন জেগে উঠবে। এক পলক থমকে দাঁড়িয়ে বুঝলে, নগেন জাগে নি।

কলকে থেকে আধপোড়া তামাক সব মেঝেতে ঢেলে হাতড়ে হাতড়ে নতুন করে সাজলে অমর। চলে আসবে, তখনই বুঝলে, নগেন জেগে উঠে মশারি তুলে অন্ধকারে ঠাহর করার চেষ্টা করছে। অমর বললে, তোমাকে উঠতে হবে না, ঘুমোও।

সাড়াশব্দ না করে উঠে এল নগেন। পাশের ঘর থেকে ডিম করা লণ্ঠনটার শিখা বাড়িয়ে নিয়ে এসে দাঁড়াল। বললে, আমারে ডাকলেই অইত। দেন—

অমরের হাত থেকে কলকেটা নিয়ে ভাল করে তামাক সাজতে বসে গেল নগেন। এ ঘরে এসে বসলে অমর। এখন এ ঘরে আবছা অন্ধকার। মিমি ঘুমোচ্ছে, মালাও ঘুমোচ্ছে হয়তো। বিকাশও নিশ্চয় এখন অঘোর ঘুমে। মনটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। বিকাশ কি তার মনের অবস্থাটা বুঝেছিল? বুঝুক বা না বুঝুক। সে বিকাশকে নিয়ে মনে মনে বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছিল তা তো সত্যি। কিন্তু কেন? অপরাধ-অপরাধ লাগে। তারই নিজের দুর্বলতা ছাড়া কিছু নয়। চা-বাগানের হাওয়ায় এ দুর্বলতা তাকে পেয়ে বসেছিল। বিকাশ ঠিকই করেছে। আলাদা বাসায় চলে গিয়ে বন্ধুর কাজই করেছে। নয়তো কবে হয়তো মালাকে জড়িয়ে ভাবনা এসে যেত। কিন্তু এসব এমন একান্ত মনের কথা, কাউকে বলা যায় না। বললেও বুঝবে বিশ্বাস করা যায় না।

নিঃশব্দে হুঁকো রেখে লণ্ঠনটা ডিম করে নগেন গিয়ে শুয়ে পড়ল। অমর গুড়ুক গুড়ুক করে তামাক টানতে টানতে চোখ বুঝে কি রকম আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সেই দিনগুলো, কলকাতার দিনগুলো—বিকাশের সঙ্গেই মাত্র সে সব কথা বলা যায়। কিন্তু বলা হয় নি। কে জানে, বিকাশও হয়তো চেয়েছিল। তার ভিন্ন মতি দেখে আর সে সব কথা তোলে নি, হতে পারে। মন খুব অস্থির হয়ে উঠেছে। সে কি চেয়েছিল বিকাশ তার মতে, তার মনমতো, তার ইচ্ছায় চলুক! কেন? সে বিকাশকে চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছে বলে? সে বিকাশকে টেনে নিয়ে এসেছে বলে? এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল, অমর নামে দুটো আলাদা মানুষ আছে। তাদের সূক্ষ্ম বিভিন্নতা অন্য কারও নজরে আসে না। হয়তো বিকাশও, হয়তো মালাও কিছু বোঝে না। কিন্তু শ্রীযুক্ত অমরবাবু, আপনি নিজে তো নিজের কাছে ধরা পড়ে গেছেন। এখন কি করবেন?

ভাবতে ভাবতে তামাক টানা বন্ধ হয়ে গেল। অমরের ইচ্ছে হল ঘরের বাইরে একবার দাঁড়ায়। নিদ্রাভিভূত অন্ধকার পৃথিবীতে অজস্র তারকাবিন্দুর দিকে তাকিয়ে, ইচ্ছে হল রাত্রির শান্ত বাতাসে কিছুক্ষণ শ্বাস

টানে। এখনকার এই অনুভূতিটা অমরের জীবনে এই প্রথম। মনে পড়ে না, জীবনে কোনও দিন এমন মনোভাব হয়েছে। মনে মনে ছট্‌ফট্‌ করে ওঠে অমর। দরজা খুলতে যাবে, তখনই পেছনে নগেনের সাড়া পেল। নগেন খুব ধীরে বলছে, শরীল খারাপ লাগছে নি বাবু ?
নগেন তবে ঘুমোয় নি! ফিরে দাঁড়ায় অমর। বলে, না। একটা গুমোট ভাব লাগছে।
বাতাস করমু ?
না রে বাবা! তুমি যাও, ঘুমোও গে।
তাদের কথাবার্তার শব্দে মালাও জেগে গেছে। বিছানায় উঠে বসে বললে, কি হয়েছে ?
কিছু না।—অমর বললে।
বাবুর শরীল ভালা লাগছে না মা।—বলে নগেন দাঁড়িয়েই থাকল।
অমর এবার খুব বিরক্ত হল। নগেনকে বললে, কিছু হয় নি। যাও তো। তুমি ঘুমোও গে।
নগেন আর সাড়াশব্দ না করে তার ঘরে চলে গেল। মালা উঠে এসে আগে লণ্ঠনের আলোর শিখাটা বাড়িয়ে দিলে। তারপরে অমরের কাছে এসে বড় বড় চোখে ভাল করে দেখে নিয়ে বললে, শোবে চলো।
অমর কিছু বললে না। চুপচাপ মশারির ভেতরে ঢুকে গিয়ে ঘুমন্ত মিমির পাশে শুয়ে পড়লে।

পনেরো

মির্জা ইসমাইলের বৌ মডার্ন। দেখেছেন ?—দীপেনবাবু জিজ্ঞেস করলে বিকাশকে।
বিকাশ একটা চিঠি ড্রাফ্‌ট করছিল। তাকাল দীপেনবাবুর দিকে। মির্জা যে তার বৌকে নিয়ে এসেছে, শুনেছিল। শুনেছিল বড় চাষরবাবু জনার্দন মুখোপাধ্যায়ের কাছে। মির্জা ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিল। ফেরার খবরটা কাল শুনেছে। দেখা হয় নি এখনও। বিকাশ চুপ মেরে তাকাল দীপেনবাবুর দিকে। দীপেনবাবু একটু হেসে বলল, মির্জা তার বৌকে নিয়ে কাল রাতে আমার বাসায় এসেছিল। মুসলমান হলে কি হবে, মেয়েটি বেশ। শিক্ষা-দীক্ষা আছে মনে হল।
এখানে দীপেনবাবুর বৌ-ই একমাত্র শিক্ষিতা, বি. এ. অবধি পড়াশোনা। পাশ করা হয় নি হঠাৎ বিয়ে হয়ে যাবার জন্যে। এ গল্প বোধ হয় এখানকার কাকপক্ষীও জানে। আর যারা বিবাহিত বাবু তাদের বৌরা

লেখাপড়া জানে না, তা নয়। তবে তা বোধ হয় গল্প করার মত নয়। বিকাশ এসব জানে। হুঁ-হাঁ না করে তাকিয়েই থাকল বিকাশ। দীপেন-বাবু বললে, আপনার সঙ্গে মির্জার ঘনিষ্ঠতা। ভেবেছিলাম বৌকে নিয়ে নিশ্চয় মির্জা আপনার সঙ্গে দেখা করেছে।

এবার বিকাশ বললে, সবে এলো, দেখা-সাক্ষাৎ তো হবেই পরে।

মির্জার বৌ মডার্ন—দীপেনবাবুর এ কথাটার মানে ঠিক বোঝে নি বিকাশ। মডার্ন বলে কি বোঝাতে চাইছে কে জানে। যাক্ গে। সেও পরেই বোঝা যাবে। দীপেনবাবু বেরিয়ে গেল। সাড়ে দশটা বাজে। তার অবশ্য বেরুতে দেরী আছে। চিঠিটা ড্রাফ্‌ট্ করে অরুণবাবুকে দিতে হবে টাইপ করতে। সে তো টাইপ জানে না। জানলে ভাল হতো। অরুণবাবুকে টাইপ করে দিতে বলতে কেমন লজ্জা লজ্জা লাগে। ভাবলে, অরুণবাবু বেরিয়ে গেলে সে নিজেই যদি বসে টাইপরাইটার নিয়ে, কেমন হয়?

অরুণবাবু বেরুনোর আগে তাকে বললে, কি, হল আপনার চিঠি?

বিকাশ বললে, না, একটু দেরী হবে।

বেশ, ভাল করে ড্রাফ্‌ট্ করুন। ওবেলা টাইপ করে দেবো। গুছিয়ে লিখবেন। ম্যানেজার ভাল ইংরেজি জানে।

অরুণবাবু বেরিয়ে গেল। বিকাশ ঘড়ির দিকে তাকালে। এগারোটা বেজে গেছে। বাজুক। তার কি রকম একটা জেদ চেপে গেছে। চিঠি ড্রাফ্‌ট্ হয়েছিল অনেক আগেই। এখন অফিস একদম ফাঁকা। ম্যানেজার আসে সাড়ে সাতটায়। যায় নয়টায়। ফের আসে আড়াইটায়। বিকেলে তার বেরুনোর সময়ের ঠিক থাকে না। অনেকটা যেন খেয়ালখুশির ব্যাপার। কোনদিন হঠাৎ গাড়ি নিয়ে ছুটলো টিলায় টিলায় কামজারির পথে, কোনদিন বা দু' মাইল দূরের ম্যানেজার্স ক্লাবে, কোনদিন বা অফিসেই রাত আটটা বাজালে। অরুণবাবু বলে, এ সবই ম্যানেজারের কাজের আওতার মধ্যে, খেয়ালের বিষয় নয়। বিকাশ ঠিক বোঝে না ততো। তার কী রকম খেলো খেলো মনে হয় সব।

দীপেনবাবু ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় আসে, যায় দশ কি সাড়ে দশে। আবার আসে দুটোয়, বাসায় চা খেতে যায় পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটায়। ফের আসে রাত সাতটায়, কাজ করে সাড়ে নয়টা অবধি। একদিনও এর হেরফের ঘটতে দেখে নি বিকাশ। অরুণবাবুও অনেকটা তাই। আর সে জন্যেই যেন বিকাশেরও অফিসের সময় ঐ একই মাপে। অফিস মনে হয় না। কাজ কাজ খেলা।

অরুণবাবুর চেয়ারে বসে টাইপরাইটারে কাগজ আর কার্বন লাগিয়ে

তর্জনী আঙুলে ধরে ধরে একেকটা অক্ষরের চাবিতে চাপ দিতে থাকল বিকাশ। টক্ টক্ শব্দ করে কাগজে ছাপ পড়তে থাকল। মনে হচ্ছিল এক যুগ পেরিয়ে একেকটা অক্ষরের ছাপ ফুটছে।
অফিসের চৌকিদার রামদিন তার কাণ্ড দেখতে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখে হাসলে রামদিন। বিকাশের লক্ষ্য নেই। রামদিন বললে, বাবু, আপ তো টাইপ কর্ রহা হে। তো অরুণবাবু ক্যা করে গা ? ছোঁড় দো। পিছে আপসোস হোগা আপসে। এবার তাকালে বিকাশ। আপসোসের কথা বলছে কেন রামদিন ! বললে, আপসোস হবে কেন ?
হোগা নেহি ! আপ টাইপ স্যাকেগা তো আপকো হি করনে হোগা। অরুণবাবুকো আপ জানতে নেহি। ছোঁড় দে না, উহি সব করে গা। —বলে, রামদিন তার জায়গায় অফিসের দরজায় পাতা তার টুলে গিয়ে বসল।
রামদিন কিছু না বললেও বিকাশকে টাইপ করা ছাড়তেই হতো। তার এক-আঙ্গুলে পদ্ধতিতে টাইপ করতে গেলে দশ লাইন দশ ঘণ্টায় হয়তো করা সম্ভব। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় সে মাত্র টু দি থেকে ডিয়ার স্যার পর্যন্ত এগিয়েছে। কিন্তু টাইপ করতে গিয়ে খুব নতুন একটা শিক্ষা পেল বিকাশ। রামদিন শেখালে। ঠিকই বলেছে রামদিন। এক আঙ্গুলে হোক, বা, আঙ্গুল ছাড়াই হোক, সে যদি টাইপ করতে পারে তা হলে তাকে কেবল অরুণবাবু নয়, ম্যানেজারও ছাড়বে না। মানে, কাজের একটা নয়া বোঝা চাপবে। তার এই বাস্তব বোধ ছিল না, হলো। টাইপের চেয়ে সেটাই বড় লাভ। মনে মনে রামদিনের ওপর তার বেশ একটা আকর্ষণ লাগল।
কাগজপত্র সব গুটিয়ে রেখে উঠল বিকাশ। রামদিনকে বললে, দরজা-জানালা বন্ধ করে দাও।
ঠিক্ হ্যায়। রাম রাম বাবু।—বলে, দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালে রামদিন।
সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। কামজারির ভোঁ এখনই বাজবে ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই বেজে উঠল। আর তখনই মনে পড়ল দীপেনবাবু বলছিল, মির্জার বৌ মডার্ন। মানেটা ঠিক বোঝে নি। কিন্তু বোঝার কথা ভাবতে হচ্ছে। মুসলিম সমাজের মেয়েদের সম্পর্কে তার কোনও ধারণাই নেই। গরীব-দুঃখী-ভিখিরী কি হিন্দু, কি মুসলমান সমান দশা। কলকাতার পথে-ঘাটে তাদের অস্তিত্বে মানুষ এবং ধর্ম, জীবন এবং সমাজ আছে বলে ভাবা যায় না। মির্জা তো সে শ্রেণীর নয়। তাকে দেখে তার পরিবার-

পরিজনের কথা অনুমান করাও সম্ভব নয়। কারণ, তারা মুসলমান। মুসলমানদের পারিবারিক আর সামাজিক অবস্থার কথাও বিশেষ কিছু জানেই না বিকাশ। এমন কি, মির্জা ছাড়া ইতিপূর্বে কোনও মুসলমান ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশাও করে নি।

অফিস থেকে বেরিয়ে হেঁটে তার বাসায় আসতে দশ মিনিট। কিন্তু প্রচণ্ড রোদ। ঘেমে যাচ্ছে। পেছনে সাইকেলের ক্রিং ক্রিং, সঙ্গে একটা ডাক, বিকাশ!

বিকাশ পেছন ফিরে তাকালে। অমর। কামজারি সেরে ফিরছে। তার সামনে এসে সাইকেল থেকে নামলে। বললে, কলকাতায় মা-বাবার কাছে চিঠি-পত্র দিস না। কি ব্যাপার?

আচমকা এ প্রসঙ্গ! একটু ভাবলে বিকাশ। বললে, লিখি, তবে ওরা যতো আশা করে ততো না। এই তো পরশু লিখেছি বাবাকে। অবিশ্যি বেশ কিছু দিন পরে।

অমর ভাবছিল, বিকাশের দাদা যে তাকে চিঠি লিখেছে তা বলবে, কি বলবে না। সে যেভাবে বলছে, তাতে অন্য যে-কেউ আগে জানতে চাইতো সে এসব বলছে কেন। কিন্তু বিকাশ তো অন্য দশ জনের মতো নয়। বিকাশ বিকাশই। এসব ওর মাথায় চট্ করে আসতে পারেই না। অমর আর ও প্রসঙ্গে গেল না। বললে, শুনলাম মির্জার বৌ এসেছে। খুব নাকি সুন্দরী আর মডার্ন।

আমি দেখি নি। —বলে অমরের মুখের দিকে তাকালে বিকাশ।

অমর বললে, সারা বাগানে চাউর মির্জার বৌয়ের খবর। এবার বাসন্তিয়ার ব্যাপারটা ভুলে যাবে সবাই।

বিকাশের পাশে পাশে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে হেঁটে আসছিল অমর। এবার দাঁড়ালে। বিকাশের হাত ধরে বললে, বিকেলে চল মির্জার বৌকে দেখে আসি। যাবি?

না।

কেন?

এমনি। আমার ভাল লাগে না।

মির্জা যদি তার বৌকে নিয়ে তোর বাসায় আসে?

আসবে! তখন দেখব।

অমর বললে, ঠিক আছে। রাতে তোর বাসায় যেতে পারি।

যাস।

অমর সাইকেলে চেপে ছুটলে। বিকাশ চনমনে রোদের কথাটা বেমালুম ভুলে গেছিল। অমর চলে যেতেই মনে হলো, তার অজান্তে রোদটা যেন

তাকে জাপ্‌টে ধরেছে। কিন্তু রাতে কী শীত!

এখানকার ভূগোল, এখানকার আবহাওয়া, গাছপালা, কাজকর্ম, মানুষজন —একেবারে আলাদা মনে হয় বিকাশের। কয়েক মাসে সে যেন একটা নতুন জীবনে জন্মগ্রহণ করেছে। এখন ধীরে ধীরে চোখ ফুটছে, জ্ঞান হচ্ছে, বুদ্ধির বিবর্তন চলছে। নিজে নিজে অনুভব করছে। কিন্তু কাউকে বোঝানো যাবে না। কাউকে না। বেশ একটা হাসির গমক লেগে যায় ভেতরে। এ হাসি যে কেন, জানে না বিকাশ।

রাতে কেউ আসে নি। অমর না, মির্জাও না। এমন কি, অর্জুন সর্দারও না। রাত এগারোটা অবধি একলাই কেটে গেল। শুয়ে শুয়ে কত কথা মনে আসছে। এখানে বিসর্জন-ও আবাহনের পর্ব চলছে। চা-গাছের পুরোনো মরশুম শেষ, নতুন মরশুমের প্রস্তুতি কাজ শুরু হয়েছে। চা-ঘর বন্ধ, মানে এখন আর চা-পাতা তোলা যাবে না, চা-তৈরি বন্ধ। আবার শুরু হবে যখন বাগিচার চা-গাছে গজিয়ে উঠবে নয়া কিশলয়—দু'টি পাতা একটি কুঁড়ির দিন তখন শুরু। এখন সারা বাগিচায় কেবল মরা গাছ উপড়ে ফেলা, নতুন জমি তৈরি করা, নতুন চারা পুঁতে দেওয়া, চা-গাছের গোড়ায় সার দেওয়া, মাথা ছেঁটে দেওয়া, ছায়া দেবার শিরীষ গাছের চারা খানে খানে পুঁতে দেওয়া, নর্দমা পরিষ্কার করা—এইসব কাজ। কিন্তু চা-বাগিচার চেহারাটা যে কী রকম পালটে যায়, কাজের সোরগোলে চট্‌ করে নজরে যেন আসে না কারো। বিকাশকে তো হেসেই উড়িয়ে দেয় সবাই। বলে, নয়া চোখে ওসব ছায়া ফেলবে, মায়া লাগাবে। ছায়া সরবে যখন, মায়া কাটবে যখন তখন বোঝা যাবে কাজই আসল—ইণ্ডাস্ট্রি, টি ইণ্ডাস্ট্রি। আর সবই মিথ্যে মায়া। বিকাশ এসব ঠিক মানতে পারে না। কাজ নিশ্চয়, ইণ্ডাস্ট্রি তো বটেই। তাই বলে যে মানুষ এসব করছে তাদের ওপরে এসবের কোনও প্রভাব পড়বে না ভাবা যায়? কে জানে!

ষোল

বাসন্তিয়ার হাতে ঘাস কাটার কাঁচি। মাথায় বড়ো এক আঁটি কচি ঘাস। এ ঘাস দেবে ডাক্তার ভবতোষ দত্তের বাসায়। তার সাতটা গাভীন গরু। দু'বেলা পাঁচ কেজি করে দুধ। শুকনোর দিনে ভাল ঘাস পাওয়া মুশকিল। বাসন্তিয়ার মতো আরো কয়েকজন ঘাস দেয় ডাক্তারবাবুর গোয়ালে। এখানে প্রায় সব বাবু আর সর্দারেরই পাঁচটা

সাতটা করে গরু আছে। আর তাদের ঘাস যোগায় নির্দিষ্ট কুলি-কামিনরা।
ডাক্তারবাবুর গোয়ালঘরে ঘাসের আঁটি ফেলে বাসন্তিয়া বেরিয়ে আসছিল। ডাক্তার-গিন্নী শান্তা ডাকলে, বাসন্তিয়া, শুনে যা।
শান্তা পর্টিকোর দুয়ারে দাঁড়িয়ে। বাসন্তিয়া ফিরে তাকিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ালে।
শান্তা বললে, হাঁ রে! মির্জা সাহেবের বিবিকে দেখেছিস?
বাসন্তিয়া হাসলে। বললে, না মাই। উ তো মুসলমান আছে।
তা কি হলো! মুসলমানের দিকে তাকাস না তুই?
খুব চটে গেল বাসন্তিয়া। বললে, হাম উ বাত বোলা? মুসলমানী বহু লোগ কভি বাহার হোতা?
শান্তা হেসে ফেললে। বললে, তুই খেপছিস কেন? মির্জা সাহেবের বৌ এসেছে শুনলাম। তোকে দেখে মনে হলো তুই দেখেছিস। কেমন মানুষ, দেখতে কেমন তোর কাছ থেকে শুনবো ভাবলাম।
হাম নেই দেখা। শুনা, আচ্ছি বিবি হ্যায়। লেকিন বাহার হোতা নেহি। দের হো যায়েগা, হাম ঠারা নেহি হোগা আউর।
বাসন্তিয়া বেরিয়ে এল। ডাক্তার-গিন্নীকে সে সত্য কথা বলে নি। মির্জা সাহেবের বিবি যেদিন এসেছে সেদিন থেকে রোজ একবার করে সন্ধ্যার পরে মির্জার বাসায় যাচ্ছে বাসন্তিয়া। মির্জার বিবির সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পসল্প করে আসে, কাউকে সেটা বলতে চায় না। ডাক্তার-গিন্নীর কাছে তাই চেপে গেল সব। ডাক্তার-গিন্নীর তাকে জিজ্ঞাসা করাটা একদম ভাল লাগে নি তার। তা ছাড়া, তাকে ভালও লাগে না। মনে হয় বড় বাইগ্রস্ত। দীর্ঘকাল ধরে ডাক্তারবাবুর বাসায় ঘাস দিতে এসে কত কি দেখলে বাসন্তিয়া। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে মনের অমিল লেগেই আছে। দুই ছেলে, এক মেয়ের মা-বাপ। ছেলে-মেয়েরা বড় হয়েছে। শহরে থেকে পড়াশোনা করে। কিন্তু বাবু-গিন্নীর যেন হুঁশ নেই। কারণে অকারণে তাদের মনোমালিন্য। এমন তো চা-বাগানের কুলি-কামিনেরাও করে না। বাসন্তিয়ার অসন্তোষ সে জন্যে। ডাক্তারবাবু খারাপ মানুষ নয়, যতো গোল পাকাবে গিন্নী—বাসন্তিয়ার ধারণা এ রকম। তাই সে ডাক্তার-গিন্নীকে সব সময় এড়াতে চেষ্টা করে।
পিঠ ঘেমে উঠেছে। চুলকোচ্ছে। হাতের কাঁচিটা উল্টো করে ধরে পিঠটা আস্তে আস্তে চুলকোতে চুলকোতে হাঁটছে বাসন্তিয়া। ডাক্তার-গিন্নীর জিজ্ঞাসাটা তার মাথায় ঘুরছে। মির্জা সাহেবকে নিয়ে এখানে বাবুদের মধ্যে কত কথা! এখন তার বিবিকে নিয়ে বাবু-গিন্নীরা লাগবে। বেশ

মজা লাগে বাসন্তিয়ার। তখন ঘাসের বোঝা মাথায় ছিল বলে রোদটা তেমন ধরতে পারে নি তাকে। এখন মাথায় রোদ, সারা শরীর চন্‌মন করছে। ঘরে গিয়ে চা-পানী খাবে, একটু বিশ্রাম, তারপরে ফের কাজ বেলা পাঁচটা পর্যন্ত। সকালের কাজ ঘাস-জঙ্গল সাফাই, বিকেলে চা-গাছের গোড়ায় সার-মাটি দেওয়া। এই চলবে এখন আরো মাসখানেক। তারপরে আবার অন্য কাজ। তার দিকে ছোট সাহেবের নজর। তাই সর্দার আর বাবুরা তাকে হালকা কাজ দেয়, খাতির করে। মনে মনে বাসন্তিয়া এতেও খুশি নয়। দিশী সাহেব হলে যা হয়! হতো খাঁটি সাহেব, তার জন্যে ব্যবস্থা হতো অন্যরকম। তার ঘর হতো আলাদা, দুজন তিনজন খেদমৎ করতো। চাইলে একটা রসুইও পেয়ে যেতো। ফুলমনি পায় নি? সাদা সাহেবরা কবে ছেড়ে গেছে এই দেশ। কিন্তু ফুলমনির জন্যে কী না করে রেখে গেছে!
হাঁটতে হাঁটতে এক একটা সুখস্মৃতি দুঃখ হয়ে দাঁড়ায়। একেবারে বুকের ওপর চাপে। মাঝে মাঝে এমন হয় আজকাল। তখন বাসন্তিয়ার ইচ্ছে হয় সব ছেড়েছুঁড়ে চলে যায় দূরে কোথাও। কিন্তু কোথায়? এ জিজ্ঞাসার স্পষ্ট জবাব নেই—সব অন্ধকার। তবে, ছোট সাহেবের মোহটা কম নয় তার। প্রায় প্রতি রাতে, অন্ধকারে গুটিসুঁটি হয়ে যখন সে ছোট সাহেবের বাংলোয় এসে ঢোকে তখন সব ওলট-পালট হয়ে যায়। কেন? তারও জবাব নেই। সে বোঝে না।
ছোট সাহেব একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, তুই যে এমনি আসিস্, তোর মরদ কিছু বলে না?
খিল খিল করে হেসেছিল বাসন্তিয়া। সে হাসিতে কী ছিল কে জানে। বাসন্তিয়া স্পষ্ট দেখেছে ছোট সাহেব চম্‌কে উঠেছে। বড় মায়া ধরে গেছিল। ছোট সাহেবকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, হামারা আস্‌লি মরদ তু! উ তো হাঁড়িয়া খা-কে বেহুঁশ। কুছ্ মালুম নেই হোতা।
ছোট সাহেব তার মরদের কথা আর তোলে নি কোনদিন। বাসন্তিয়ার জন্যে তার দান-উপহার বেড়েছে তখন থেকে। বাসন্তিয়া বোঝে, তাই হয়েছে কাল। পেতে সাধও যায়, না পেলে মন পোড়ে, পেলে দগ্‌দগে ঘায়ের যন্ত্রণা। এ সংসারে কে বুঝবে তার কথা। তার কথা না বুঝুক, মির্জা সাহেবের একটা দরদ আছে তার জন্যে। তা ফেলনা নয়। তা ছোট সাহেবের লালসও নয়। তাই মির্জাকে সে বড় ভয় পায়। লোকটা মুসলমান হলে কি হবে, খাঁটি মানুষ। কিন্তু এসব তো কাউকে বলা যাবে না। সবাই ভাববে বাসন্তিয়ার এ আর এক নতুন ছিনালী। তাই মির্জা আর তাকে নিয়ে কানা-ঘুষাটা সে আমল দেয় নি।

নিজের ঘরের দুয়ারে এসেই যেন ক্লান্ত হল বাসন্তিয়া। দরজা না খুলে পৈঠাতে বসে পড়ল ধপ্ করে। আর তখনই নজরে এল সামনে ফুলমনির ঘর থেকে ধোঁয়া উঠছে। ফুলমনির ঘর আর তার ঘর কাছাকাছি। দেখতে দেখতে ধোঁয়া লক্‌লকে আগুন হয়ে উঠল। চিৎকার, চেঁচামেচি। আর কিছু জানে না বাসন্তিয়া। জ্ঞান হলে দেখলে সে আর ফুলমনি হাসপাতালে পাশাপাশি দুই বেড-এ দু'জন। ফুলমনির জ্ঞান ফেরে নি। সর্বাঙ্গে দাগড়া দাগড়া লাল ফোসকা। দেখে শিউরে উঠল বাসন্তিয়া। ধীরে ধীরে সব মনে পড়ে।

ফুলমনির ঘরে আগুন জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘরের চালাও ধরল। তারপরে কি হয়েছে সে জানে না। হয়তো কুলি লাইনকে লাইন পুড়ে ছাই হয়েছে। হতেই পারে। শনের চালা বাঁশের খুঁটি আর নলের বেড়ায় পাতলা মাটির প্রলেপ দেওয়া ঘর। গরমের মাসে তা শুকিয়ে আগুনের সহজ রসদ হয়ে থাকে। কিন্তু ফুলমনির ঘরে তো কতো দামি দামি জিনিসপত্র, কাপড়-চোপর। বিলিতি সাহেব ভালবেসে কত দিয়েছে সারাজীবন। সে সব কি আছে? বাসন্তিয়ার নিজের ঘরের কথা খুব একটা মনে লাগছে না। তার ঘরে আর কি আছে! সে সব ছাই হয়ে গেলেই বুঝি ভাল। কিন্তু তার নয়া মরদ সনাতন তখন কোথায় ছিল? ঘরে ছিল কিনা মনে পড়ছে না। বাসন্তিয়ার মনটা কি রকম হয়ে যায়। এবং এতক্ষণে সে টের পায় সে পোড়ে নি। আগুন তাকে ছুঁতে পারে নি। বেড-এর ওপর উঠে বসলে। আর কোন রোগী নেই এ ঘরে। কাছেপিঠে হাসপাতালের কাউকে দেখতেও পাচ্ছে না। বার বার ফুলমনির দিকেই চোখ যাচ্ছে।

ফুলমনির বয়েস এখন কত? তিন কুড়ি পার হয়েছে, শুনেছে বাসন্তিয়া। তবু এ বয়সেও তার শরীরের গঠন ভাঙ্গে নি। শক্ত-সমর্থ, সৌখিন সাজগোজ। তার সাহেব তাকে ছেড়ে চলে গেলেও অঢেল সুখ দিয়ে গেছে। সেই সুখের ওপর বসে বসে দিব্বি দু'ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে ফুলমনির দিন কাটছিল আরামে। কিন্তু হঠাৎ এ কি হল তার? ভাবতে ভাবতে ভেতরটা যেন হিম হয়ে আসে বাসন্তিয়ার। চোখ বোজে সে। কিন্তু বোজা চোখের ওপরও যেন ফুলমনির পোড়া দেহটা ভাসতে থাকে। ফুলমনি অজ্ঞান, বাঁচবে তো?

সাঁজের বেলা তার মরদ সনাতন এল তাকে দেখতে। বাসন্তিয়া হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। কেন যে কান্না এল তা ঠিক বোঝে নি।

সনাতন বললে, রোতা কাহে। ডাগদরবাবু বোলা, তোহারা কুছ নেহি হুয়া। কাল ছোড় দেগা। লেকিন—

সনাতন একটু থামলে। বাসন্তিয়া অধৈর্য। বলে উঠল, লেকিন ক্যা? বোল্ লেকিন ক্যা হোনা!
উহিতো বাত বাসন্তিয়া। —সনাতন ধীরে ধীরে বলে, সব কুছ জ্বল্ গিয়া। কাহা যায়েগা?
কান্না থেমেছে। আঁচলে চোখ মুছে জিজ্ঞেস করলে, ফুলমনিকা ঘর?
সভি আঙরা হো গিয়া। —সনাতন বলতে বলতে একবার তাকালে ফুলমনির দিকে। তারপর বললে, ডাগ্দর বাবুনে বোলা উভি নেহি রহে গা।
উ বাত মত্ বোলো। —প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে বাসন্তিয়া। শেষে একটু থেমে বলে, হাম ভি নেহি রহেগা।
তোহারা কুছ নেহি হুয়া। —বলে হাসে সনাতন।
একজনই নার্স আছে। দু বেলা রোগীর দেখাশোনা করে। গ্লাসে ওষুধ নিয়ে তাকে আসতে দেখে সনাতন বেরিয়ে যায় উলটো দিকের দরজা দিয়ে। তা নইলে হয়তো ধম্‌কে দেবে।
নার্স এসে বাসন্তিয়াকে ওষুধ খাইয়ে ফুলমনিকে দেখলে একবার। তারপর বাসন্তিয়াকেই জিজ্ঞেস করলে ফুলমনির সাড়া পেয়েছে কিনা।
বাসন্তিয়া মাথা নাড়লে। না, সারাদিনে ফুলমনির কোনও সাড়া পায় নি সে।
নার্স ফুলমনির একটা হাত টেনে তুলে নাড়ি দেখলে। আর কোনও কথা বললে না। খুব দ্রুত ডাক্তারবাবুর ঘরের দিকে চলে গেল।
বাসন্তিয়ার খুব ভাল ঠেকল না নার্সের হাবভাব। ইচ্ছে হল নিজে একবার উঠে গিয়ে ফুলমনিকে দেখে। কিন্তু সাহস পেলে না।
একটু বাদে ডাক্তারবাবু এল। তখন রাতের অন্ধকার নেমেছে। হাসপাতালের চৌকিদার সুইচ্ টিপে এঘর ওঘরের আলো জেবলে দিচ্ছে। বাসন্তিয়া ভেবেছিল ডাক্তারবাবু তাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু ডাক্তারবাবু তার দিকে তাকালই না। ফুলমনিকে বেশ কিছুক্ষণ ভাল করে পরীক্ষা করে ত্রস্ত চলে গেল।
এবার বাসন্তিয়ার চোখ দুটো ভয়ে বড় হয়ে উঠল। ফুলমনি শেষ! বুঝতে পারছে না।
কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসপাতালের কয়েকজন কামিন এসে ফুলমনিকে সরিয়ে নিয়ে গেল। এখন বাসন্তিয়া এ ঘরে একা। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। সারা রাত তাকে এখানে একা থাকতে হবে। না, ঠিক একা বোধ হয় নয়। একজন আয়া আছে, মতিয়া। বুড়ি। ফোক্‌লা দাঁত,

পাকা চুল। তার না আছে মরদ, না আছে ছেলে-মেয়ে। হাসপাতালই তার ঘরবাড়ি। খাওয়া-দাওয়া সবই এখানে। সারাদিন হাসপাতালের মেঝেতে পড়ে ঘুমোয়। সাঁজের বেলা হয়তো কোথাও গেছে চা খেতে বা পান-গুয়া কিনতে। বাসন্তিয়া এখন মতিয়ার পথ চেয়ে। মতিয়া না আসা পর্যন্ত সে ভয়ে সিঁটে মেরে থাকবে। এখন মতিয়াকে কাছে পাওয়া বড় দরকার তার।

লক্ষ্য করলে ডাক্তারবাবু ফের এদিকে আসছে। বাসন্তিয়া একটু নড়েচড়ে বসলে। তার দিকেই আসছে।

ডাক্তার ভবতোষ দত্ত বাসন্তিয়ার বেড্-এর কাছে এসে বললে, এখন তো ভালোই আছিস রে বাসন্তিয়া। কাল ছুটি দেব ভাবছিলাম। তোর মরদ সনাতন হাতে-পায়ে ধরলে। ঘর তো পুড়ে শেষ। গিয়ে থাকবি কোথায়! তাই, নয়া ঘর না তোলা অবধি তোকে হাসপাতালে রাখার কথা বললে। থাকবি?

বাসন্তিয়া মাথা নাড়লে। না, সে থাকবে না।

ডাক্তারবাবু বললে, তবে থাকবি কোথায়?

বাসন্তিয়া চুপ। ডাক্তারবাবু কি বুঝে আর কিছু বললে না। বেরিয়ে গেল হাসপাতাল থেকে।

রাত নামছে। কাচের বড় জানালা দিয়ে কাছেপিঠের টিলা-পাহাড় ঘরবাড়ি গাছপালা সব ঝাপসা হয়ে আসছে। বাসন্তিয়ার ভাল লাগছে না। আকাশও চোখে পড়ছে কিছুটা। পরিষ্কার আকাশ। দু'চারটে তারাও ফুটেছে। একটা মৃদু বাতাসের আভাসও আছে। বাসন্তিয়ার এ সব কিছুই ভাল লাগছে না। কিছু লোকজনের সাড়া আসছে হাসপাতালের বাইরের চত্বর থেকে। বাসন্তিয়া জানে, ফুলমনির শেষ যাত্রার সাড়া সে সব। বাসন্তিয়ার ভাল লাগছে না।

মতিয়া এসে গুটি গুটি বসল পাশের খালি বেড্-এর উপরে। ওখানে সন্ধ্যার আগেও ফুলমনি শুয়ে ছিল। এখন খালি। মতিয়া বললে, বাসন্তিয়া, ক্যা? ডর লাগতা?

নেহি, ডর নেহি। আচ্ছি লাগতা নেহি।

ক্যায়সা?

মালুম নেহি।

উঁহ ডরকা ভাও বেটি।—বলে, একটু হাসলে মতিয়া। অভয় দিতে বললে, হাম তো হ্যায়। কুছ ভাওনা মৎ করনা বেটি।

তিন দিন হয়ে গেছে হাসপাতালে! তার মরদ সনাতন চায় আরও ক'দিন

থাকে বাসন্তিয়া হাসপাতালে। ডাক্তারবাবু তাই বললে। তার মরদ নতুন ঘর তুলবে তবে ছুটি বাসন্তিয়ার! রাত যত বাড়ছে তত মনে আসছে কথাটা। ঘুমুতে পারছে না। মতিয়া পাশের বেড্-এই নিজের শয্যা পেতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঐ বেড্-এ ফুলমনি ছিল। এতক্ষণে ফুলমনির চিহ্ন নিঃশেষ হয়েছে নিশ্চয়। ফুলমনিকে শ্মশানে নিয়ে গেছে কখন সেই সন্ধ্যাবেলা! এখন ভর রাত। বাসন্তিয়ার ঘুম লাগছে না। তার মরদ নতুন ঘর তুলতে লাগবে কাল থেকে। ফুলমনির ঘর পুড়ে ছাই। ফুলমনির সব শেষ। একটা শ্বাস পড়ে নিজের কথা ভেবে। তার কি হবে! ছোট সাহেব যদি বিলিতি সাহেব হতো—নিশ্চয় তাকে দেখতে আসতো হাসপাতালে। বাসন্তিয়া তো ছোট সাহেবের কাছে নিজেকে সঁপেই দিয়েছিল। তার মরদ তার জন্যে একদিনও কিছু বলে নি। মাতাল! বলতো, ছোট সাহেব তোকে খুব ভালবাসে বাসন্তিয়া। তুই ফুলমনি হয়ে যা। সুখে থাকবি। বাসন্তিয়ার ঘেন্না ধরে যেতো। কি বলবে কি করবে কিছু ভেবে পেতো না। এখন মনে হচ্ছে সব সমান। যেমন ছোট সাহেব তেমনি সনাতন। ছোট সাহেব চায় তার দেহ, সনাতন চায় তাকে দিয়ে কিছু রোজগার তুলতে। থুঃ! আবার শ্বাস পড়ে। গভীর রাত। ফাঁকা হাসপাতাল। তার নিজের শ্বাস নিজের কানেই বাজে হিস্ হিস্ করে।

একটা মানুষ চেয়েছিল বাসন্তিয়া। না ঝগড়ু না সনাতন, না ছোট সাহেব—কেউ সে মানুষ নয়। ফুলমনির তা হয় নি। সারা জীবন বিলিতি সাহেব তার বুকে গেঁথে ছিল। ফুলমনির সাহেব দেশে গিয়েও ফুলমনিকে ভোলে নি। বড়বাবুর কাছে চিঠি লিখতো ফুলমনির খবর জানতে। টাকা পাঠাতো। শেষে একদিন খবর এল সাহেব বেঁচে নেই। ফুলমনির কি কান্না! বাসন্তিয়া দেখেছে ফুলমনির ঘরে সাহেবের ফটো। ফুলমনির সঙ্গে সে ফটোও পুড়লো!

বাসন্তিয়া স্পষ্ট বোঝে, তার কেউ নেই। অস্থির হয়ে ওঠে। বেড ছেড়ে মেঝেতে উঠে দাঁড়ায়। দরজা খুলে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসে। গভীর রাত। হাসপাতালের চৌকিদার ঘুমে ঢলে আছে। টের পায় নি। বাসন্তিয়া হাসপাতালের গেট পেরিয়ে পথে নেমে আসে।

সতেরো

কমলা ফুল টি এস্টেটের নিরুত্তাপ দৈনিক জীবনে ফুলমনি আর বাসন্তিয়াকে নিয়ে দিন কয়েক বেশ সোর ওঠে। নানা জল্পনা-কল্পনা। বাসন্তিয়া

হাসপাতাল থেকে উধাও, ফুলমনিও। ফুলমনি তার সম্পর্কে সব কৌতূহল সব জিজ্ঞাসায় ইতি টেনে দিয়ে গেছে নিজেই। আর বাসন্তিয়া যেন নতুন একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে সকলের মনে দুঃসহ কৌতূহল হয়ে উঠেছে। মতিয়া জানে না, হাসপাতালের চৌকিদার জানে না, ডাক্তারবাবু জানে না বাসন্তিয়ার কি হলো! ছোট সাহেব নীরব, কিছু জানে না। সনাতন হাহাকার তুলছে, বাসন্তিয়া কোথায় গেল! বাবুদের মধ্যেও নানা অনুমান। কেবল বিকাশের কোনও কৌতূহল নেই বাসন্তিয়াকে নিয়ে। কিন্তু ঘটনাটা তাকেও অবাক করেছে। বাসন্তিয়া কি মরলে? আত্মহত্যা! মির্জা সাহেব অবিশ্যি হেসে বলেছে, দূর ছাই বাসন্তিয়া! চা-বাগানে কত কি ঘটে বিকাশবাবু। সবই ঘটনা। বাসন্তিয়া মরে নাই, পালাইছে। ছোট সাহেবই তার কাল অইছিল। তার হাত থাকি মুক্তি নিল। বুইজলেন বিকাশবাবু!

এ মুহূর্তে বিকাশ কিছু বুঝতে পারছে না। কিন্তু মানুষের চরিত্রগত একটা অজানা দিকের সন্ধান পেয়ে যাচ্ছে যেন। কিছুতেই তৃপ্তি নেই—বাসন্তিয়া নিরক্ষর কুলি-কামিন হলেও মানবিক অতৃপ্তিতে অধীর হতেই পারে। ভাবতে যেন কেমন অদ্ভুত লাগে। চা-বাগানের এমন নিঝুম বিচ্ছিন্ন পরিবেশেও মানুষের স্বভাবে অন্যথা কিছু নেই। মহানগরী কলকাতার জন-জটিলতায় যে বিচিত্র মানব-চরিত্রের বিকাশ আর প্রকাশ হুবহু সে রকম এ চা-বাগানেও অভাস দিতে পারে এ ঠিক ভাবা যায় না। অন্ততঃ বিকাশ ভাবতে পারে নি। চা-বাগানের কুলি-কামিন মানুষের জীবন সে ভেবেছিল স্থির। সে ভেবেছিল, এদের জীবনে কেবল বেঁচে থাকাটাই নির্দিষ্ট, আর সবই অর্থহীন। কিন্তু তার সে ধারণা খুব দ্রুত পালটে যাচ্ছে একটার পর একটা পরিচয়ে।

মির্জা সাহেবের ধারণা বাসন্তিয়া পালিয়েছে। কিন্তু কেন, তা মির্জা সাহেবের অজানা। বাবুদের মধ্যে অনেকেই মনে করছে অন্য কোনও পুরুষকে ধরেছে বাসন্তিয়া, তাই উধাও। অর্জুন সর্দার ছুটির দিনে প্রায়ই রাতে এসে বিকাশের বাসায় পর্টিকোর বেঞ্চিতে পা মুড়ে বসে গল্প করে। আজও করছিল। এ কথা সে কথা। বিকাশের ভাল লাগে। চা-বাগান সম্পর্কে নানা কথা জানতে পারে। মন্দ কি! তবে ছেঁকে নিতে হয়। অর্জুন সর্দার বলে তার নিজের বিশ্বাস আর সংস্কারে মিশিয়ে। বিকাশ তার থেকে সত্যটুকু ছেঁকে তুলতে চেষ্টা করে।

বিকাশ খুব অবাক হল। বাসন্তিয়া প্রসঙ্গটা তুলছে না অর্জুন সর্দার। সে নিজেই জানতে চাইবে কিনা ভাবলে। কী জানতে চাইবে? সর্দারও তো তার নিজের অনুমানের কথাই বলবে। হঠাৎ ফুলমনির কথা মনে

এলো। ফুলমনির গল্প অমরের কাছে শুনেছে। অমরেরও তা শোনা গল্প। কিন্তু অর্জুন সর্দার ফুলমনির আদ্যোপান্ত জানে ভাবা যায়।
বিকাশ বললে, আচ্ছা সর্দার! ফুলমনির সাহেব চলে গেল কেন?
অর্জুন সর্দার ভারি খরখরে গলায় বললে, ইংরাজ রাজ খতম হুয়া না। আউর দেশমে সাহাবকো মেম সাহাব আউর বেটা-বেটি থা।
এখানে ফুলমনি—
বিকাশকে শেষ করতে না দিয়ে বললে সর্দার, ফুলমনি কা হালৎ আগারিছে আচ্ছি হো গিয়া থা। যানে কো বখৎ সাহেব উনকো আচ্ছি-ওলা ঘর, ক্ষেতি জমিন, ছে-ঠো গাভীন গাই আউর দো নকর. উস্ সাথ সাহেবকো টেবিল-চেয়ার, বর্তন, বিশ হাজার রুপেয়া ইসব দে গিয়া থা। ভগবান কো ক্যা মর্জি বাবু, ফুলমনি কি আগ্মে মরণা হোগা কোন্ সোচা!
একটু থেমে বললে, তব্ বাবু, ই বাত সাচ, ফুলমনি উস্কো মরদকো ভাগা দিয়া থা। উ তো পাপ হ্যায়, কি বাবু! পাপ বাপকো ভি নেহি ছোড়তা, হাঁ!
তোমাদের বাসন্তিয়া তা হলে ফুলমনির মতো পাপ কাজ করেই ভেগেছে সর্দার! —বিকাশ এতক্ষণে বাসন্তিয়ার প্রসঙ্গটা তুলতে পেরে বেশ কিছুটা হাল্কা হলো।
সর্দার বললে, বাবু, বাসন্তিয়া আউর ফুলমনি বহুত তফাৎ। ফুলমনি আপছে সাহেব কো ধরা থা। আউর ছোট সাহেব বাসন্তিয়াকো আপনা মর্জিসে টানা থা। ঝগড়ু আউর সনাতন—বাসন্তিয়াকো দো মরদ, কইভি ঠিক নেহি থা। দারু পী-কে হরবখৎ বাসন্তিয়াকো পর জুলুম, তব না বাসন্তিয়া বিগড় গিয়া। বাসন্তিয়া ভাগা, ঠিক কিয়া। জেনানা আদমি। একেলি ক্যা করে গা। উস্কো কসুর হোনেছে উ কসুরকো পাপ ঝগড়ু, সনাতন আউর ছোটা সাহেবকো। বাবু, এক বাত—আপ সব শুনেগা, সব দেখেগা, লেকিন কুছ্ মত বোলনা। বাগানমে ক্যা নেহি হোতা, সব হোতা, কুছ সোচেগা, কুছ নেহি সোচেগা, হাঁ!
বিকাশ কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। পাঞ্জাবীর পকেট থেকে সিগারেট আর দেশলাই বার করলে। বাসায় বিকাশের পোশাক পাঞ্জাবী-পায়জামা। এখানে সবাই লুঙি-গেঞ্জি পরে বাসায়। সিগারেট খায় বাইরে, অফিসে। বাসাতে সবাই তামাক টানে। গড়গড়া হুঁকো, লম্বা রবারের নল। যখন তামাক খায় হুঁকোর জলে গুড়গুড় শব্দ ওঠে প্রতি টানে। ভুরভুর করে তামাকের ঘ্রাণ ছড়ায়। কেউ কেউ আবার সুগন্ধি খাম্বিরা তামাকও খায়। তার ঘ্রাণ সত্যি চমৎকার। সিগারেট

তার কাছে কিছু না। কিন্তু বিকাশ হয়তো আর সবই পারবে, কেবল তামাক খাওয়াটা তার সইবে না। মনে হয় বড় হুজ্জোতে ব্যাপার। অমর বলে, তামাকে সিগারেটের চেয়ে খরচা অনেক কম, কিন্তু আরাম আর আমেজের তুলনা নেই। জীবনে আমিরী এই একটাই চা-বাগানে, আয়েস করে বসে তামাক টানা। ছোকরা বয়সের বাবুরা পর্যন্ত তামাকে অভ্যস্ত। বিকাশের চোখে তা বেশ হাস্যকরই ঠেকে, অবাকও হয়।
সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে তামাকের কথাটা মনে এসে যায়। অর্জুন সর্দার চুপচাপ বসে আছে। বিকাশও চুপ। চমরু চা নিয়ে এল। সর্দার তার নিজের ঘরে ছাড়া অন্যত্র চা, জল বা অন্য কিছু খায় না। তার সংস্কার চা-বাগানে তার চেয়ে উঁচো জাতের কেউ নেই। ছোট জাতের ছোঁয়া তো চলবেই না, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পর্যন্ত তার কাছে অচ্ছুৎ। কারণ তারা মাছ-মাংস খায়। সর্দার ডাল-রুটির আহারী। বিহারের ছত্রী। অকপটে সর্দার এসব বলে। কোনও সংকোচ বা দ্বিধা নেই। সর্দারের এই সরলতা বিকাশের ভাল লাগে। নইলে সে তার যে সব সংস্কার আর ধ্যানধারণার কথা বলে, তাতে বিকাশ কখনো বিরক্ত হয়, কখনো কৌতুক বোধ করে মনে মনে। কিছু বলে না। আর একটা ব্যাপারও আছে। বাবুদের কাছে সর্দারদের খাতির থাকলেও চায়ের আপ্যায়নটা কেউ করে না। বিকাশ যদিও এখানকার ঐ সব সাহেব-বাবু সর্দার-কুলির শ্রেণী-বিলাস মানে না। তবু দেখেছে, অনেক সর্দার-চৌকিদার বা কুলি-কামিন তার অনুরোধেও তার বাসাতে চা বা অন্য কিছু খেতে রাজি হয় নি। হয়তো দীর্ঘকালের সংস্কার আর অভিমান মিলেমিশে আজ একটা কিম্ভূত আকারে চেপে বসেছে এদের মনের ওপরে।
বিকাশ যখন এসব ভাবে থৈ পায় না। অর্জুন সর্দারের কথাটাই মনে হয় ঠিক, বাগানমে ক্যা নেহি হোতা, সব হোতা। কুছ্ সোচেগা, কুছ্ নেহি সোচেগা। এখানে মানুষজনের আচার-আচরণ আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রেম-ভালবাসা বিবাদ-বিদ্বেষ ঈর্ষা-বিরাগ সব স্পষ্ট, কিন্তু এতো গভীর যে তল পাওয়া যায় না। কলকাতার জীবনে মানুষ-জনের এই দিকটায় তত নজরই পড়ে না। যে যার মতো চলছে, কারও কিছু ভাবার বা বলার নেই। এখানে তা ভাবাই যায় না যেন। সীমাবদ্ধতা? কলকাতায় সকলের কোন অসীম জীবনচর্যা। আসলে এখানে হয়তো বুদ্ধির প্রখর-তার চেয়ে প্রাণের সচলতাই বেশি। তাই প্রাণ যা চায় অনায়াসে এখানে তা করা স্বাভাবিক। বুদ্ধি এসে জটিল করে তোলে না সব।
বাসন্তিয়া উধাও। ক'দিন ধরে কত জল্পনা-কল্পনা। তারপর ধীরে ধীরে তা থেমেও এসেছে। একটা গভীর স্থির জলাশয়ে ছোট ঢিল পড়ে

যেমন কিছুক্ষণের জন্যে কয়েকটা ঢেউ তুলে মিলিয়ে যায়, এও যেন সেই রকম। আর ঢেউ-কল্লোলিত অনন্ত সমুদ্রে জাহাজ ডুবে গেলেও তার বিশেষ আলোড়ন টের পাওয়া যায় না। কারণ সমুদ্রে স্রোতাবেগ বড় জটিল। চা-বাগানে জীবনের বহুতা স্রোত বলে কিছু আছে মনেই হয় না। তাই হয়তো জটিলতা বলতে যা বোঝায় তা তেমন আছে ভাবা যায় না।

সিগারেট শেষ করে চায়ের কাপ তুলে নিলে বিকাশ। সর্দার চুপ করেই আছে। বিকাশ বললে, কথা বলছো না যে সর্দার।

ক্যা বোলেগা বাবু। —সর্দারের মুখে একটু নীরব হাসি ফুটে ওঠে। লণ্ঠনের লাল আলো সম্পূর্ণ অপরিচিত করে তুলেছে তাকে। বিকাশ একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

ক'দিন আগে হোলি উৎসব গেছে। এখানে এটা একটা বড় পরব। চা-বাগানে ছুটি থাকে। কুলিরা স্ত্রী-পুরুষ সবাই হাঁড়িয়া আর ভাঙ খেয়ে নেশায় ভোর হয়ে রঙ্খেলায় মত্ত হয়ে ওঠে। দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে নাচতে নাচতে হৈ-হুল্লোড় করে। বাবুদের বাসায় বাসায় লাল আবীর হাতে নিয়ে এসে পায়ে-মাথায় মাখিয়ে দেয়। আর গান, 'আজ হোলি খেলব রে শ্যাম তোমার সনে, একলা পেয়েছি তোমায় নিধু বনে।' সুরটাও যেন নেশায় টলমল করা। সারাটা চা-বাগানে সারাদিন ধরে একটা রঙের রোশনাই। এমন হোলি খেলা বিকাশ দেখে নি! আনন্দ জিনিসটা কত সহজ-সরল হতে পারে হোলির দিনে সেটা জীবনে প্রথম বুঝেছে বিকাশ। মির্জা সাহেবকে পর্যন্ত এরা রঙে রাঙাতে ছাড়ে নি। রঙে রঙে ছয়লাপের সে অনুভবের কথা বোঝানো যায় না। এ রঙ খেলার সঙ্গে ধর্মটর্মের কোনও সম্পর্কের কথা মনেই আসে না।

মির্জাকে বিকাশ বলেছিল, আপনাকে রঙ্ দিলে, আপনি আপত্তি করলেন না?

আপত্তির কী আছে মশয়? মুসলমানে যে রোজ মসজিদে আজান দেয় হিন্দুরার কানে যায় না? —মির্জা বেশ সিরিয়াস।

বিকাশ বললে, তা নয় ঠিক, সংস্কার বলে একটা ব্যাপার আছে না?

আছে। সংস্কারের পানী খাইয়া আনন্দ মাটি করমু ক্যানে বিকাশবাবু। রাখেন ঐ সব ফালতু কথা। —মির্জার কাছে এসব একেবারে ধর্তব্যের বাইরে।

কিন্তু অর্জুন সর্দার বা এখানকার বাবুশ্রেণী, তারা কেউ যে সংস্কার-মুক্ত ভাবাই যায় না। আর সে সব মনে এলেই মির্জা সম্পর্কে একটা খট্কা লেগেই থাকে মনে। কিছুতেই তা থেকে মুক্ত হতে পারে না।

কলকাতাতে হোলির রং খেলা বিকাশের ভাল লাগতো না। একবার সুমিতা তাকে গালে-মাথায় লাল রং মাখিয়ে দিয়েছিল। সে রেগেমেগে তেড়ে যেতে না যেতে সুমিতা হি হি করে হাসতে হাসতে দে ছুট। তার পর থেকে কোনোদিন দোলের সময়ে ঘর থেকে বেরুতো না। সে সব মনে এলে বেশ লাগে এখন। সে কবের কথা! তখন তারা কাঁকুড়গাছি রেলের ধারের একই বস্তী বাড়িতে থাকতো। সিক্স কি সেভেনে পড়ে। সুমির সঙ্গে তখন রোজ ভাব, রোজ ঝগড়া। চড়-চাপড়ও বসিয়ে দিতো খেপে গেলে। আর সুমি সুযোগ পেলে চিমটি কাটতো, ভেংচে দিত। কিন্তু ভাব হতে খুব সময় লাগতো না।

তাই কি বাল্যপ্রেম? এখনও বিকাশ ঠিক বোঝে না। প্রেম ব্যাপারটাই তার কাছে একটা ঝাপসা মনোভাব।

দোলের দিন বাসন্তিয়া কি কাণ্ড না করেছিল। বাবুদের কাউকে বাদ দেয় নি—কারো গায়ে, কারো কপালে লাল আবীর মাখিয়ে দু'টাকা পাঁচ টাকা বকশিস নিয়েছে। সেও দিয়েছে। সন্ধ্যের পরে দোলপূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় যখন আকাশ ভেসে যাচ্ছে বাসন্তিয়া তার বাসায় এসে হাজির। হাতে একটা বড় ঠোঙা। তাকে প্রণাম করে পায়ের কাছে ঠোঙাটা রেখে বললে, মিঠাই। তুই খাবি বাবু। তুই বাহ্মন আছিস কি না!

আর দাঁড়ায় নি। ঢুলতে ঢুলতে জ্যোৎস্নায় ছায়া ফেলতে ফেলতে চলে গেছে।

ঠোঙাটা হাতে তুলে খুলে দেখলে ক'টা লাড্ডু আর সাদা বাতাসা। রঙের নেশায়, না মদের ঘোরে বাসন্তিয়া পরবের দিনে বামুনকে প্রণাম আর মিঠাই দিয়ে গেল বিকাশ বোঝে নি। ভেবেছে, হয়তো রেওয়াজ, সংস্কার। কিন্তু তা হলে আরও দু'একজন কোন্ না আসতো তাকে প্রণাম করতে বা মিঠাই খাওয়াতে! আর কেউ আসে নি।

বাইরে থেকে হাঁক পাড়লে মির্জা, বিকাশবাবু!

মির্জার হাতে টর্চ। পর্টিকোর দরজায় দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে বললে, আও না!

বাইরে অন্ধকার। মির্জার ডাকে বিকাশ ভাল করে তাকালে। মির্জা বললে, দ্যাখেন বিকাশবাবু, চিনেন নাকি?

মহিলা! মির্জার বৌ? বিকাশ অবাক। মহিলা উঠে এল পর্টিকোতে। দু'হাত জোড় করে নমস্কার করলে তাকে আর অর্জুন সর্দারকে। সর্দার হা হা করে উঠে দাঁড়ালে। বললে, নেহি মাই, হাম আপকে গোড় লাগি। মহিলা কি বুঝলে কে জানে। কিন্তু খুব সপ্রতিভ। হেসে বলে, কেনে?

আপনে আমার বাবার বয়সী।
অর্জুন সর্দার বলে, উ তো ঠিক বাত মাই। লেকিন—
সর্দারকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মির্জা বলে, লেকিন্ ফেকিন নেই সর্দার। তুমি বসো!
আশ্চর্য! অর্জুন সর্দার স্পেল বাউন্ড। বসে পড়ল। বিকাশেরও কোনও কথা ফুটছে না মুখে। মির্জা তার বৌকে বললে, বসো।
বিকাশ লজ্জা পেল। কথাটা বলা উচিত ছিল তার। মির্জা মানুষটা সত্যি অদ্ভুত। কিছুটা রোমান্টিকও হয়তো বা। বিকাশের এখন কি করা বা কি বলা উচিত ভেবে পাচ্ছে না। মির্জা ধরেছে অবস্থাটা। তার বৌকে বললে, দ্যাখো, কইলকাতার কবি, তার চা-বাগানৎ কি হাল। মশয়, কলকাতার পুয়া শুনি কত স্মার্ট! আপনে আমার বৌরে দেইখ্যা ভ্যাবা-চ্যাকা!
ধ্যাৎ! কী যা-তা কও!—মির্জার বৌ মির্জাকে শাসায়।
বিকাশ বলে, আপনি কিছু মনে করবেন না। মির্জা সাহেব তার বিবিকে নিয়ে এসে হঠাৎ হাজির হবে ভাবি নি। তাই কিছুটা অপ্রস্তুত তো হয়েছি ঠিকই।
তবে আমরা উঠি!—মির্জার বৌ উঠে দাঁড়ায় আর কি।
বিকাশ হা হা করে উঠল। অর্জুন সর্দার এই সুযোগটা নিয়ে বললে, আপলোগ বয়ঠিয়ে, হামারা খানে কো টাইম হো গিয়া মাই। হাম যাতা।
অর্জুন সর্দার বেরিয়ে যাওয়ার পরে মির্জার বৌ জিজ্ঞেস করলে মির্জাকে, কে?
অর্জুন সর্দার। কট্টর হিন্দু কিন্তু খুব ভাল মানুষ। কি বলেন বিকাশ-বাবু?—মির্জা বিকাশের দিকে তাকায়।
বিকাশ বলে, সে তো আপনারাই ভাল জানেন। আমি তো—
নয়া!—বিকাশের কথা টেনে হেসে ওঠে মির্জা। বলে, আর কত নয়া থাইকবেন। একটুন পুরান হওন ভালা।
আমি তো তা বুঝি। কিন্তু পুরোনো হতে পারছি না যে! এই যে বিবিসাহেবা সহ মির্জা সাহেব, এও তো আমার কাছে নতুন ঘটনা। ক'-দিন আগে বাসন্তিয়ার অন্তর্ধান সেও নয়া। কাল আবার কি ঘটবে—সবই আমার কাছে নয়া। পুরোনো কিছু মনে হয় না। নয়া ছোঁয়ায় নয়াই থেকে যেতে হচ্ছে। কি বলেন আপনি?—মির্জার বৌয়ের দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে বিকাশ হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ায়।
উঠছেন যে!—মির্জা তাকায় বিশেষ ভাবে।

চা হবে না একটু?—বিকাশ জিজ্ঞেস করে।
মির্জার বৌ বলে, চা খাইয়া আইছি আমরা। আপনে ব্যস্ত হইবেন না।
মির্জা বলে, না বিকাশবাবু, চা থাউক। আপনে বসেন। কয়েন, আমার বৌরে দেইখ্যা কি মনে লয়!
আশ্চর্য! নিজের বৌকে নিয়ে বৌয়ের সামনেই এমন মস্করা যে করতে পারে কেউ বিকাশ কল্পনা করতে পারে না।
মির্জার বৌও কম নয়। সঙ্গে সঙ্গে বলে, বিকাশবাবু নিশ্চয় ভাইবছেন, কী বেহায়া, কী নির্লজ্জ। বোর্খা নাই, কথায় কথায় আল্লার নাম তোলে না। মুসলিম নারীর ছিটাফোঁটা চিহ্নও নাই—
মির্জা বলে ওঠে, ঠিক! ঠিক কইছ। মুসলমান মাইয়ার সম্পর্কে বিকাশ-বাবু তারার ধারণা খুব ভালা হওয়ার কথা না। কি বলেন বিকাশবাবু? সাচা না মিছা কইলাম!
বিকাশ কি বলবে বুঝতে পারে না, হাসে।
মির্জা খেপেছে মনে হয়। বিকাশকে বলে, হাসেন যে! হাইসবার কথা না বিকাশবাবু।
বিকাশ ধীরে ধীরে বলে, হাসছি আপনাদের কথাবার্তা শুনে। আমি তো ভেবেছিলাম—
জানি। ভাইবছেন আমার বিবি আপনেগো মুখ দেখাইব না।—মির্জা হেসে বলে, তাও ঠিক বিকাশবাবু। কিন্তু কথা কি জানেন, আইজের জগৎ একলা মুসলমানের না, একলা হিন্দুরও না। কইতে পারেন আইজের জগৎ হুন্দা মানুষের। বিবি হউক মোল্লা হউক, নারী হউক পুরুষ হউক কে কারে ছাইড়া চল্‌ব কয়েন? সম্ভব?
কী জানি, বিকাশ তো এসব নিয়ে কখনো ভাবে নি কিছু। ভাবার দরকারই পড়ে নি। চা-বাগানের হাওয়ায় যে এসবও আছে তাও তো কল্পনা করে নি। বিস্ময়! মির্জা আর তার বৌ এখন বিস্ময় তার কাছে। মুসলমান সমাজ নিয়ে আজন্মের শোনা কথার সঙ্গে কিছুই মেলাতে পারছে না বিকাশ। অবশ্য মির্জা বলে, সে মুসলমানের কিছুই মানে না। তাকে দেখে মুসলমান বোঝা যাবে না। এখন বিকাশের মনে হচ্ছে, মির্জার বৌকে দেখেও মুসলিম নারীর সন্ধান মিলবে না। হঠাৎ মনে পড়ল, বলেছিল তার দুটো বাচ্চা। তারা গেল কোথায়? মির্জা আর তার বৌ তাকে বেশ তাক লাগিয়ে দিচ্ছে যেন!

আঠারো

মাঘ মাস থেকে বৈশাখের শুরু পর্যন্ত প্রস্তুতি পর্ব। চা-বাগান তৈরি হতে থাকে কোমর বেঁধে। লক্ষ্য একটাই—লাখ লাখ কেজি চা। তার জন্যে যে আয়োজন তাতে কোনও ত্রুটি থেকে গেলে বিপত্তির সম্ভাবনা। ম্যানেজার থেকে বাবু আর সর্দারদের এ সময়টায় সব কিছুতেই কড়া নজর। কেউ ফাঁকি না দেয়, কাজে গাফিলতি না করে। খা খা রোদ, দুঃসহ গরম, একটা নিদারুণ রুক্ষ শুষ্ক স্বভাব ফুটে ওঠে চারদিকে। পাঁচশো-সাতশো একর টিলা-পাহাড়ের জমিতে মানুষের হাত—পোড়োকে সৃষ্টিশীল করার অদম্য উদ্যোগ। কিন্তু মানুষগুলো? তাদেরও স্বপ্ন-সুখ-দুঃখ জড়িয়ে এই পরিবেশ! এই পরিবেশে ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির প্রতিফলন প্রধান। তাই ব্যক্তি হয়তো সুস্পষ্ট নয়।

ফাল্গুন-চৈত্রে হঠাৎ কখনও বৃষ্টি নামে। ঝড় ওঠে। তার আগেই সাহেব-বাবু-কুলিদের বাসগৃহ মেরামত, শনের নতুন ছাউনি, বেড়া বা দেওয়ালে মাটি আর চুনের প্রলেপ—এসব কাজের জন্যে কন্ট্রাক্টারের শ্রমিক আসে বাইরে থেকে। তারা চা-বাগানের পুজো-মণ্ডপে ছাউনি ফেলে। তিন-চার মাস ধরে কাজ। বৈশাখে আকাশ ভেঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির সূচনা হবার আগেই তাদের কাজ শেষ করা চাই। বহিরাগত এই কর্মীদলের তাই অন্যকিছুতে আর মন দেবার সময় থাকে না।

চা-বাগানের শ্রমিক নারী-পুরুষদেরও একই অবস্থা। চা-বাগিচায় নয়া মরশুমের জন্যে হাজারো কাজ। কিছুই ফেলে রাখা চলবে না। কেবল কারখানা ঘরের বাবু আর শ্রমিকদের এ সময়ে একটু ঢিলেমি লাগে। চা উৎপাদন বন্ধ, তাই তাদের কেবল কারখানার যন্ত্রপাতি, ঘরদোর ধীরে-সুস্থে মেরামত আর সাফসুফ করে তৈরি হয়ে থাকা।

চা-গাছে নতুন পাতা গজাতে শুরু করে বৈশাখে। তারপর বর্ষা যত এগিয়ে আসবে চা-গাছগুলো নবীন সতেজ হয়ে উঠবে। চা-বাগিচার সমতলে, টিলায় তখন সবুজের স্থির ঢেউ।

ইতিমধ্যে চা-বাগানের দুটো পরব—টুসু আর হোলি পার হয়ে গেছে। শীতে টুসু পুজো, শীত শেষে হোলি, তারপরই যেন গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়ানো—কাজের সাড়া।

এসব দেখতে দেখতে বিকাশও যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। অমর সে বিস্মৃতি ভেঙ্গেছে। ঠিক্! সে বড় একটা চিঠিপত্র লেখে না কাউকে। এটা স্বাভাবিক যে নয় সে বোঝে। কিন্তু ইচ্ছে হয় না। অমর যখন

চিঠি লেখার কথা তুললে, তখনই মনে হয়েছে, ঠিক হচ্ছে না। সকলের কাছেই চিঠিপত্র লেখা দরকার। দূর থেকে এ-ই তো একমাত্র যোগাযোগের পথ। তখনই স্থির করেছে কলকাতা থেকে আসার পরে যাদের কাছে চিঠি দেওয়া হয় নি, দু'দিনের মধ্যে তাদের সকলের কাছে লিখবে।
চিঠি লিখতে বসে সমস্যা। কি লিখবে, কাকে লিখবে! সুমিতাকে লেখা উচিত ছিল। লেখে নি। তনিমাকে ও টাকাটা দিতে পারলে কিনা—এই সূত্রে শঙ্করের খবরও হয়তো কিছুটা জানা যেতো। রবীনের খবর, সুধাকে নিয়ে ওর ভুল, 'হালচাল' পত্রিকা প্রতি সংখ্যা তার নামে আসছে, সেখানে ক'টা কবিতা—এখানে এসে তো কয়েকটা লেখা হয়েছে—এসব ভাবতে ভাবতে বিকাশ অন্যমনা হয়ে যায়। ছেড়ে আসা কলকাতা তার মনে তোলপাড় তোলে।
কোথায় কলকাতা, আর কোথায় কমলাফুল টি এস্টেট্! এ দুয়ের কম্যুনিকেশন যেন সে, বিকাশ আচার্য। ভাবতে মন্দ লাগে না। কিন্তু তার অবস্থাটা কি কলকাতার কেউ বুঝবে? না বুঝুক, সে কেন বিচ্ছিন্ন থাকবে!
টেবিলের পোস্টকার্ড, ইন্ল্যাণ্ড লেটার, খাম, কলম যেন তার দিকে তাকিয়ে পিট্পিট্ করে হাসছে—হাসিটা হেনার হাসি। হেরম্ববাবুর মেয়ে, যে ডাক্তার হবে। তাকে একটা চিঠি দিয়েছিল। হেনা কলকাতা যায় নি কখনো। নতুন যাবে। তাই সে জানতে চেয়েছে কোনও মেয়ে একা যদি কলকাতা যায়, পাঁচ-সাত দিন থাকতে হলে কোনও ভাল হোটেল বা লজ-এর হদিশ যদি দেয় বিকাশ। হেনা ধরে নিয়েছে, সে যখন কলকাতার লোক, কলকাতার সবকিছু তার নখদর্পণে। চিঠিটা পড়ে হাসি পেয়েছিল বিকাশের। ইচ্ছে হয়েছিল বেশ একটা চতুর বিদ্রূপ ছাড়বে হেনাকে। লিখবে, সে কখনো 'গাইড়'-এর কাজ করে নি। লেখা হয় নি। সে-ও তো হয়ে গেল দেড় মাস। এতদিনে হেনা নিশ্চয় কলকাতা ঘুরে এসেছে। কাজেই হেনা এখন থাকবে।
আগে দাদা। দাদা মানে, মা বাবা বাড়ির সবাই। ওরা সব তার জন্যে উদ্বেগে আছে! তার যেন উদ্বেগ নেই কারো জন্যে। কেমন আছে তা না জানার উদ্বেগ তেমন না হলেও মাঝে মাঝে মন তো কেমন করেই সকলের জন্যে। তা কি বলা যায়, না লেখা যায়। অমর আচ্ছা করে যা খুশি বলেছে। বিকাশ তাতে কান দেবে না সে তো ঠিক নয়। দাদাকে চিঠিটা লিখে ফেললে বিকাশ। এতদিন একটা কথা বার বার মনে এসেছে। কিন্তু ঐ, মনে আসে। কিছু করতে পারে নি। দাদাকে সেটা লিখলে। কাল সে চিঠিও ছাড়বে, মানি অর্ডারও করবে বাবার নামে।

বাবার নামে ? নাঃ, মায়ের নামে।

মায়ের মুখটা ভেসে উঠছে। নীরব ম্লান প্রতিমা। মায়ের নামে দুশো টাকা পাঠাবে কাল। মা জানবে না এই মুহূর্তে তার সন্তান বিকাশের মনে মায়ের কি রকম অধিষ্ঠান। তার কেন যে কান্না পাচ্ছে মায়ের কথা ভাবতে। মা, মাগো! দু' চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে। জল! অন্তরের উষ্ণ বাষ্প জল হয়ে গড়িয়ে আসছে দু'চোখে। মা, মাগো!

রাত গভীর। ঘড়ি দেখলে। দুটো। পর পর সবাইকে চিঠি লিখেছে। দাদা, শংকর, সুমিতা, রবীন। বাকী থাকল—'হালচাল' পত্রিকা আর হেনা। কিছুক্ষণ ভাবলে। না, হেনাকে যখন লেখা হয় নি সময়মতো, আর লিখবেই না এখন। 'হালচাল'-এ এখানে এসে লেখা কয়েকটা কবিতা পাঠাবে। কপি করতে হবে। আজ আর হবে না।

বিকাশ উঠে দাঁড়াল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তার আর চোখের পলক পড়ে না। গভীর রাতের এমন একটা ছবি তার জীবনে এই প্রথম। সাড়া নেই, শব্দ নেই—প্রাকৃতিক একটা নিজস্ব নিভৃতিতে সব যেন সম্মোহিত। এই মুহূর্তে ঘুমিয়ে আছে কথাটা বড় অবাস্তব মনে হচ্ছে। বিকাশের মনে হচ্ছে ঘুমে নয়, একটা অলৌকিক শান্তির সমুদ্রে সব ডুবে আছে। ভোর হলেই সব তচ্‌নচ্‌—আলোর উষ্ণতায় আবেগ মোহ সব প্রলাপের মতো মনে হবে।

আলোর বাস্তবতা, আলোর জয়গান কত সহজ! গভীর রাতের এই নিভৃতি, ভাবা যায় না, কত মরমিয়া, কত নিদ্‌ভুক—আলোর চেয়ে গভীর অন্ধকারেই বুঝিবা এই প্রত্যয়ের সহজ আনাগোনা! আমাদের দেশের বহু বহু কবি-সাহিত্যিক গভীর রাতের এই অনুভবের কথা বলেছেন যার যার ব্যক্তিগত আবেগে। সাধারণ ব্যক্তিজীবনে তা প্রায় বোধ-বুদ্ধির অগোচর। তাই হয়তো এক ধরনের ভাবাবেগ প্রসূত অবাস্তব কল্পনা ভেবে লোকে প্রত্যাখ্যান করে। তার তো এভাবে কখনও মনেই আসে নি এসব।

দু'চোখের ঘুম সরে গেছে। আকাশের দিকে আর চোখ ফেরাতে পারছে না। আকাশ শব্দটার একটা গভীর অর্থ যেন তাকে পেয়ে বসেছে। এত তারা! বিকাশ কেমন হয়ে যাচ্ছে। একটা তারা ছিট্‌কে গিয়ে আরেকটা তারায় মিশে গেল। উল্কা! উল্কা-পতন শব্দটার অর্থ এতদিন যেভাবে বুঝে এসেছে আজ মনে হচ্ছে তা ভুল। উল্কার ঠিক পতন নয়, অভিসার। মহাকাশে গভীর রাতের নিস্তব্ধতায় এক তারার আরেক তারার সঙ্গে মিলন—কথাটা ভাবতেই সজাগ হল বিকাশ। এ কী ভাবাবেগে পেয়ে বসলো তাকে! উল্কা কাকে বলে তা

তো জানে সে। কিন্তু আজ উল্কা পতনের দৃশ্যটা দেখে তার মনে হচ্ছে সে জানা ব্যবহারিক। সঠিক জানা তা নয়।
বিকাশ আর চোখ ফেরাতে পারছে না আকাশ থেকে। ঠিক বিস্ময় বা প্রত্যয় নয়, দুয়ে মিলেমিশে তাকে যেন একটা অবর্ণ অস্তিত্বের কাছে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, এতকালের জ্ঞান-বিশ্বাস-চেতনা সব যেন অর্থহীন। মনে হচ্ছে, প্রেম-ভালবাসা-মমতা অস্তিত্বের একটা সামান্য ব্যাপার মাত্র। জীবনের, এই পৃথিবীর প্রতি প্রাণী প্রতিটি অণু-পরমাণুর অনুরণন যেন সে এই মুহূর্তে অনুভব করতে পারছে। সে অনুভবের জোয়ারে সব ভেসে যায়—কমলা ফুল টি এস্টেট, কলকাতা সে তো এক কণারও শতাংশের একাংশ নয়। শেষ রাতের এই পৃথিবীর অনুভব, শেষ রাতের ঐ বিশাল আকাশের ব্যাপ্তি, হাজার হাজার হাজার তারার বিচিত্র আলো—বিকাশ নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে, হ্যাঁ রে, পাগল হয়ে গেলি না তো?
পাগল হয়ে যাওয়াটা অতো সহজ নয়। মনে মনে সেটা জানে বিকাশ। তাই একা একা নিজের হাসিটা নিজেই উপভোগ করে। চারদিকের অন্ধকারটা কি রকম ঘোলাটে হয়ে আসছে। তারার আলোর উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে আসছে। দূরে কোথাও ক'টা কুকুর খেঁকিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মোরগের ডাক—কুক্কুরু কু! একটা কী পাখি মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। তখনই চমরু এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে। তার অবাক প্রশ্ন, বাবু, আপ নিদ্ গিয়া নেহি!
বিকাশ ঘুরে দাঁড়ায়। একটু হাসে। চমরুকে কি বলবে ভেবে পায় না। চমরু ফের বলে, ক্যা হুয়া বাবু?
কিছু না, এমনি।—বলে ভেতরে চলে আসে বিকাশ।

উনিশ

এসব অঞ্চলে গরমের সময় প্রচণ্ড গরম, শীতের সময় হাড়কাঁপানো শীত। আর বর্ষা? নামে তো থামে না, পাঁচিয়ে মারে। সাতদিন দশদিন ধরে কালো মেঘে আকাশ ঢেকে রাত-দিন অঝোর বর্ষণ। শীত গ্রীষ্ম বর্ষার অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে বিকাশের। বসন্তকালটা এখানে দখল করে উত্তাপ। বসন্ত কালের বাহারি কল্পনা-বাসনা হোলি উৎসবেই শেষ। তারপর তো কাজ-কামের নিটোল সময়। বসন্তের হাওয়া খেলা করে ঠিকই। ন্যাড়া চা-বাগিচা ছুঁয়ে তা বিলীন হয়ে যায়। মানুষ-জনের মনে তার স্পর্শ-শিহরণ আছে কি নেই বোঝা যায় না। কিন্তু শরৎ কালটা

চা-বাগিচার বাইরে-ভেতরে সমান আবেগ তোলে। অথচ এ সময়টাই চা-বাগিচার ভরা মরশুমের সময়। ছোপ ছোপ সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায় অসম্ভব নীল আকাশের সমুদ্রে। গাছ-গাছড়া মায়াময় সবুজ।

কিন্তু শরতের আগে তো বর্ষা! সেই অঝোর বর্ষণের এক রবিবার সকাল বেলা বর্ষাতি গায়ে দিয়ে মাথায় ছাতা ধরে হেনা এসে হাজির। বিকাশ অপ্রস্তুত। চা-বাগানে কোন মেয়ের পক্ষে, সে যে-ই হোক, এমন বৃষ্টি মাথায় করে বিকাশের মতো কোন ছন্নছাড়া বাবুর বাসায় এসে অকারণে উঠবে না। কিন্তু কারণটা যে কী মুহূর্তে অনুমান করে ভেতরে ভেতরে এতটুকু হয়ে গেল বিকাশ। তবু বেশ অবাক হবার ভঙ্গিতে বললে, আরে! আপনি! কবে এসেছেন?

কাল বিকেলে।—বলতে বলতে ছাতা বন্ধ করে, প্লাস্টিকের রঙিন বর্ষাতি গা থেকে ছাড়িয়ে পার্টিকোর এক কোণে রেখে বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে।

বিকাশ তখনও অপ্রস্তুত। সেটা কাটিয়ে উঠতেই বললে. এখানে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে। ভেতরে বসবেন?

চলুন! শীত শীত ভাব আছে একটা। আমাদের অভ্যাস আছে। আপনি তো নয়া।—বলতে বলতে বিকাশের পেছনে পেছনে ঘরের ভেতরে চলে এল হেনা।

সমরুকে ডেকে চায়ের জল চাপাতে বললে বিকাশ। হেনা ঘুরে ঘুরে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে বললে, রান্নাঘরটা দেখে আসি।

বলতে না বলতেই রান্নাঘরের দিকে চলে গেল হেনা। বিকাশ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। হেনা এই ঝড়জল মাথায় করে কেন এসেছে ভাবতে চঞ্চল হয়ে উঠল মনে মনে। বাইরে বর্ষণের অবিরাম শব্দ। সে শব্দ যেন তার কানে লাগছে না। কী রকম একটা সংকোচ বার বার তাকে এতটুকু করে ফেলছে। এতদিন বাদে মনে হচ্ছে হেনার চিঠিটার জবাব দেওয়া উচিত ছিল তার। হেনা হয়তো তারই শোধ নিতে এসেছে আজ। বাইরে অঝোর বর্ষণ, সারা আকাশ থেকে আজ বুঝি কালি মুছবে না। অসম্ভব কালো মেঘ—বিকাশ মেঘের এমন ঘটা কখনও দেখে নি। ঘরের ভেতরটা আবছা হয়ে আছে। সেই আবছাতে দাঁড়িয়ে বিকাশ যেন ভূতগ্রস্ত হয়ে উঠছে। কি বলবে হেনা কে জানে। সে যা ভাবছে যদি তাই হয়, তা হলে তো হেনাকে খুব সহজ মেয়ে বলা যাবে না। এই ঝড়জল মাথায় করে যে মেয়ে কোনও ভদ্রলোককে দু'কথা শোনাতে আসতে পারে তাকে তো দজ্জাল ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। অবশ্য ডাক্তারী পড়া মেয়ে, যে আর কিছু কাল বাদেই ডাক্তার হয়ে

বেরুবে সে কিছুটা সাহসী, কিছুটা বেপরোয়া হতেই পারে। কিন্তু এ মুহূর্তে এসব ভেবে বিকাশের ভয়ানক অস্বস্তি লাগছে।

কিছুক্ষণ বাদে হেনা এল দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে। দেখে বিকাশ এতটুকু। মুখে তার রা সরে না। হেনা হাসছে মুচকি মুচকি। গরম চায়ের কাপ দুটো টেবিলের ওপরে রেখে বললে, কলকাতার ছেলেরা চা বানাতে জানে কিনা আমি জানি না। আমি চা-বাগানের মেয়ে, আমার না জানাটা ডিস্ক্রেডিট।

বিকাশ বলে ফেললে, অতো ক্রেডিটেড হবার দিকে নজর কেন আপনার!

বাঃ রে! একজন অপ্রস্তুত মানুষকে নাকাল করতে যাবো কেন?—বলে চায়ের কাপের দিকে তাকালে।

বিকাশও তাকালে। ধোঁয়া উঠছে চায়ের কাপ থেকে। সেই ধোঁয়া এঁকে বেঁকে একের পর এক অদৃশ্য হচ্ছে। হেনা বললে, চা খান!

আশ্চর্য! কথাটা বলার কথা তার। হেনা তারই বাসায় এসেছে। কিন্তু সব যেন উলটে-পালটে গোলমালে ফেলে দিচ্ছে তাকে। চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে বিকাশ বললে, শুধু চা খাবেন?

হেনা জোর হাসি লাগালে। বললে, আপনি সত্যি কবি। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। কিছু খাবো না। যে জন্যে এসেছি সেটা বলে বিদায় হবো।

বিকাশ সন্দেহ এবং কৌতূহলের মিশ্র আবেগে অস্থির। কিন্তু তার প্রকাশ যাতে না হয় সেদিকে সতর্ক হয়ে তাকালে হেনার দিকে। হেনা বললে, কাল কলকাতা যাচ্ছি। আপনাকে যে লিখেছিলাম, তখন যাওয়া হয় নি। আপনি তো কিছু জানালেনই না। যাক্। আমার সঙ্গে একটি মেয়ে ডাক্তারি পড়ে ডিব্রুগড়ে। তাদের বাড়ি কলকাতা। ও যাচ্ছে কাল। আমিও ওর সঙ্গেই যাচ্ছি—শিলচর থেকে প্লেনে। থাকবো ওদেরই বাড়ি। আট-দশ দিন থেকে ডিব্রুগড়ে চলে যাবো দু'জনেই। আজ বিকেলে শিলচরে যাবো। দাদুর বাড়ি থাকব। আমার সঙ্গিনীও কালই শিলচরে গেছে। ওদের আত্মীয়ের বাড়ি থাকবে। কাল দুজনের দেখা হবে এয়ার অফিসে। টিকিট হয়ে গেছে।

বিকাশ শুনছে আর ভাবছে, তাকে অতো বিবরণ দিচ্ছে কেন হেনা? আর এসব কথা শোনা ছাড়া সে যে কি বলবে তাও ভেবে পাচ্ছে না। আবার হেনার কথায় অমনোযোগ হলে কি ভেবে বসবে। সে এক কেলেঙ্কারী। বাইরে বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। ভেতরে অন্ধকারটা যেন আরও অনেকটা ঘন হয়ে আসছে। বৃষ্টি যদি থামতো, অন্ধকারটা যদি কেটে যেত তা হলে হয়তো হেনাও অতো আলগোছ হয়ে বসে

পড়তো না। এখন এই হতচ্ছাড়া বৃষ্টির ওপরেই বিরক্ত হয়ে উঠল বিকাশ।

হেনা বলছে, কলকাতা যাচ্ছি। বাবা বললে একবার আপনার সঙ্গে দেখা করে যেতে। যদি আপনাদের বাড়ির কোনও খবর-টবর থাকে। বা, আমিও আপনাদের বাড়ির খবরাখবর নিয়ে আসতে পারি।

বিকাশ কিছুটা সহজ হল এবার। জিজ্ঞেস করলে, আপনার সঙ্গিনীর বাড়িটা কোথায় ?

লেক টাউন। চেনেন নাকি ?

আমাদের বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়।

আপনাদের বাড়িটা কোথায় ?

কাঁকুড়গাছি।

লেকটাউন থেকে কি ভাবে যেতে হয় ?

বাস, ট্যাক্সি।

কতক্ষণ লাগে ?

মিনিট কুড়ি।

ওহ্ ! তা হলে আর দূর কি ! দিন আপনাদের বাড়ির ঠিকানা। পারলে দেখা করে আসবো। কোন খবর থাকলে বলুন, তাঁদের বলে আসবো।

বিকাশ উঠে গিয়ে এক টুকরো কাগজে ঠিকানাটা লিখে হেনার হাতে দিয়ে বললে, যদি যান বলবেন ভাল আছি। সময় পাবেন ?

দেখি।—বলে উঠে দাঁড়ায় হেনা।

বিকাশ বলে, আপনার চিঠির জবাব না দেওয়ায় খুব অভদ্র ভেবেছেন তো !

প্রথমে সে রকমই খারাপ লেগেছিল। পরে বুঝেছি মেয়েদের থাকার জায়গার খবর সব ছেলেই রাখে না।—বলে, পর্টিকোতে বেরিয়ে এসে বর্ষাতি পরে ছাতা হাতে নিয়ে, ফিরে তাকালে একবার। একটু হেসে বললে, চলি।

তাকিয়ে দেখলে বিকাশ, হেনা যেন বৃষ্টির ভেতরে ডুবে গেল। কিছুক্ষণ ধরে হেনার কথাই ভাবতে হল। তারই ভুল। হেনাও তো একালেরই মেয়ে। অতো ভাবাভুবির ধার ধারতে যাবে কেন সে ? নেহাৎ দরকার, স্বভাবজ সৌজন্য-ভদ্রতা, ব্যস ! তারই ভুল। ব্যাটা বিকাশ, তুমি একটা ভূষণ্ডির কাক। যতো বার-জ্বালার জ্বলুনি তোমাকে পেয়ে বসে। তার চেয়ে এই বর্ষার দিন—বর্ষার দিন না বলে বর্ষার রাত্রি ভাবাই যেন বা ঠিক। ঘরের ভেতরটা ঘন অন্ধকারে জমে গেছে। এই ভালো।

তোমার জন্যে ঘন অন্ধকারই উপযুক্ত।

হেনা চলে যাবার পরে বিকাশ চুপচাপ বসে থাকল অনেকক্ষণ। বৃষ্টিটা আরও জোর এখন। বৃষ্টির একটানা শব্দ তাকে সম্মোহিত করে ফেলছে যেন। রবিবার আজ। বিকেলে বাজার আছে। যেতে হবে। কিছু কেনাকাটা তো সারা সপ্তাহের জন্যে করতেই হবে। কিন্তু এখন যা অবস্থা, মনে হয় না আজ আর বেরুনো যাবে। এখন চিন্তা ক'দিন এমনি চলবে? শুনেছে, এখানে এমন বৃষ্টি টানা পাঁচ-সাতদিন চলে। তার জন্যে থেমে থাকে না কিছু। বিকাশের কিন্তু কিছুতেই মন যাচ্ছে না এখন। চমরু রান্নাঘরের পৈঠায় বসে ঝিমুচ্ছে। উঠে গিয়ে ডাকলে. চমরু! ও চমরু!
ব্যস্তত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় চমরু। বলে, ক্যা বাবু?
আজ কি করা যায় বলো দেখি?
কিছু বুঝতে না পেরে চমরু হাসে।
বিকাশ বলে, তোমার ভাল লাগছে কিছু?
নেহি! ভাল নেহি লাগ্‌তা বাবু।
তা হলে কি করা যায় বলো দেখি। খিচুড়ি কি করে রাঁধে জানো?
নেহি বাবু। পকায়গা? তব্‌ হেনা মাইকো পুছা নেহি কাহে!
বিকাশ হেসে ফেললে। মনে মনে বললে, দূর ব্যাটা! তা হয় নাকি?
যাক গে। ডাল-চাল-আলু একসঙ্গে সেদ্ধ করে তো তোলা যাবে। একটা পরীক্ষাও হয়ে যাবে।
এপর্যন্ত ডাল, তরকারী, মাছ রান্নাটা আয়ত্তে এনে ফেলেছে বিকাশ। তাই খিচুড়িটা পারবে না ভাবতে খারাপ লাগে।
রান্নার উদ্যোগে লেগে গেল বিকাশ। ডাল-চাল-আলু যখন একসঙ্গে সিদ্ধ হয়ে এসেছে প্রায় তখনই বাইরের দরজায় একজনের সাড়া পাওয়া গেল।
এই বাদলায় আবার কে? বিকাশ ছুটে এল পার্টিকোতে, দরজা খুলতেই একজন অপরিচিত মধ্যবয়েসী লোক তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, আপনে বিকাশবাবু? আমারে ইসমাইল আইতে কইছিল।
কেন?
আপনের একজন ঠাকুর লাইগব।
ঠাকুর!—বিকাশ দেখলে দাঁড়িয়ে ভিজছে লোকটা। ছাতা আছে। কিন্তু এমন বৃষ্টি ছাতায় কুলোবে কেন? বললে, ভেতরে আসুন।
লোকটা যখন ভেতরে ঢুকলে, দেখলে বিকাশ, একটা বড় সাইজের পোঁটলাও

আছে সঙ্গে। বিকাশ জিজ্ঞেস করলে, ইসমাইলের বাসা হয়ে এলেন?
না। সোজা গাড়ি থাকি নাইম্যা আপনের বাসাত। ইসমাইল সব ভালা কইরা কইছিল। আমার অসুবিধা হয় নাই।
পোঁটলাটার দিকে তাকিয়ে বিকাশ বললে, একদম ভিজে গেছেন। জামা-কাপড় আছে সঙ্গে?
আছে। আপনে ভাইববেন না।—লোকটা ঘরের ভেতর দিকে তাকাতে তাকাতে বললে, আপনে একলা থাকেন?
হুঁ! ইসমাইলের সঙ্গে আপনার পরিচয় কি করে হল?
লোকটা একগাল হেসে বললে, একগ্রামের মানুষ।
আপনি ঠাকুরের কাজ করেন?
করি।
আগে যেখানে কাজ করতেন ছাড়লেন কেন?
আমি ছাড়ি নাই, তারা ছাড়াই দিল।
কেন?
তারা লোক ভালা না।
ওঃ! আপনি কাপড়-জামা বদলান। আমি আসছি।—বিকাশ ছুটলে রান্না ঘরে। তার খিচুড়িতে পোড়া ধরেছে। পোড়া গন্ধে ছেয়ে গেছে রান্নাঘর। ঝটপট উনোন থেকে হাঁড়ি নামিয়ে ঢাকা তুলে দেখলে, না, এখন পর্যন্ত পুড়ে আঙরা হয় নি। কিন্তু লোক তো একজন বেড়ে গেল। এতে হবে?

নাম সুকুমার ভট্টাচার্য। মির্জা ইসমাইলের গ্রামের লোক। গরীব বামুন, লেখাপড়া জানে না। ছেলেবেলাতে মা-বাবা গত হয়েছে। তাই দশ-বারো বছর বয়স থেকেই বাড়ির কাজ করে চলে তার। রান্না করাটা রপ্ত করেছে যুবা বয়সে। এখন তার বয়স পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ। এ পর্যন্ত কম করে আট-দশ জায়গায় রাঁধুনীর কাজ করেছে। কোথাও স্থায়ী থাকতে পারে না কেন—এমন একটা কথা মনে এসেছিল বিকাশের। মির্জাকেও জিজ্ঞেস করেছিল। মির্জা বলেছিল, আপনে নিজেই বুইজবেন। লোক ভালা, চোর-চামার না। বিয়া করে নাই। পিছটান নাই।
মির্জা যখন জোগাড় করেছে তখন তার অবিশ্বাসের কারণ নেই। কিন্তু মির্জাও অদ্ভুত মানুষ। বৌকে আনতে যখন বাড়ি গিয়েছিল তখনই সুকুমারকে বলে এসেছে সব। কিন্তু তাকে সে কথা একবারও বলে নি। সুকুমার যখন এল সেই আশ্চর্য বর্ষার দিনে, বিকাশ ভিজতে ভিজতে ছুটে গিয়েছিল মির্জার বাসায়। মির্জা তখন তার দুই ছেলে-মেয়ের

সঙ্গে খেলা করছে, বিবি কি সেলাই করছে মাচার বিছানায় বসে।
বিকাশকে দেখে মির্জা অবাক। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে, আরে আরে, কী ব্যাপার! আসেন।
বিকাশ নিজের দিকে তাকিয়ে বুঝলে যতদূর ভেজার ভিজেছে। তাই দেরী করা চলবে না। বললে, সুকুমার ভট্টাচার্যকে চেনেন?
মির্জার বিবি সেলাই রেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল। মির্জাকে বললে, সুকুমার-দা। তুমি তারে বিকাশবাবুর রান্ধনের কথা কইছিলা না!
হঃ! আইছে নাকি?
কিছুক্ষণ হল এসেছে।
আপনে নির্ভয়ে তারে রাখেন। আমি আপনেরে তার কথা কইতে ভুলি গেছলাম। যাউক, আইছে, ভালা।—বলে হাসতে হাসতে ফের বললে, মনে লয় আপনের থন মন বইসব সুকুমারদার।
বিকাশ তাকিয়ে থাকল মির্জার দিকে। কি বলতে চাইছে বোঝার চেষ্টা করলে। মির্জাই বুঝিয়ে বললে, খুব অভিমানী। মর্যাদাজ্ঞান টনটনে। নিজের মত সব কইরব। ভালা না লাগলে ছাড়ব।
বিকাশ বললে, মাইনে—
মির্জা বিকাশকে বাধা দিয়ে বললে, যা পারেন হাত খরচ একটা দিবেন। পরে যা হয় করণ যাইব।
মির্জার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বিকাশ বার বার দেখছিল তার ছেলে আর মেয়েকে। ছেলে বড়, বছর পাঁচেক হবে। মেয়ে ছোট, বছর তিনেক। বড় সুন্দর, ফুট্‌ফুটে। এই প্রথম তাদের দেখল বিকাশ। একটা অভিযোগ তুলতে পারতো। বলতে পারতো, আপনার ছেলে-মেয়ের কথা কিছু বলেন নি তো। কিন্তু এখন ইচ্ছে হল না। মা-বাবা আর সন্তানদের এমন দিনে এমন একান্ত পরিবেশে কী যে ভাল লাগে—সে কথা ভেবে আর সব তুচ্ছ লেগেছে সেদিন।
কিছুক্ষণ বসার জন্যে মির্জা জোরাজুরি করেছিল। তার বাসায় বিকাশের সেই প্রথম যাওয়া। মির্জা একটা অস্ফুট আবেগ তুলেছিল, আইলেন, কিন্তু এমন দিনে—
বিকাশ হেসে বলেছে, মনে রাখার মতো, কী বলেন?

বর্ষার শেষাশেষি বৌদির এক চিঠি এসে হাজির। চিঠির বয়ান বড় মজার। লিখেছে, 'তোমার ডাক্তার এসে খবর নিয়ে গেছে আমাদের। বললে, তুমি দিব্বি আছো। চা-বাগানে মন লেগে গেছে। আমরা জেনে খুশি হয়েছি। কিন্তু তুমি একেবারে ডাক্তার ধরে বসেছ যে। সেটা

আমাদের কাছে সমান কৌতূহল, আশঙ্কা আর কৌতুকের। মেয়েটির কথা বলার ধরন বড়ো অদ্ভুত। উচ্চারণ? থাক্ বাবা। শেষে তুমি যদি রেগে যাও?'

বৌদিও তো একালের মেয়ে। কিন্তু ধ্যান-ধারণা বড়ো সেকেলে। হেনা যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতো, তা হলে কি ভাবতো? যত্তো সব ব্যাঙ্। ব্যাঙ্ শব্দটা বিকাশ রপ্ত করে ফেলেছে। এখানকার লোকেরা ও শব্দটি 'বাজে বা কিছু না' অর্থেই বলে থাকে। প্রথম প্রথম উদ্ভট মনে হতো। এখন মনে হয় বেশ জুৎসই। সেও বলে এখন সহজেই। কিন্তু বৌদির চিঠির কী জবাব দেবে সে? বর্ষা গিয়ে শরৎকাল এসে গেছে, হেনা কিন্তু আজ পর্যন্ত জানায় নি যে, সে কলকাতাতে তাদের বাড়ি গিয়েছিল। বৌদিকে তা লিখবে?

কুঁড়ি

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি পুজো। সেপ্টেম্বরের গোড়াতে নাচঘর সাফসুরৎ করে প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু। নাচঘর মানে পুজোমণ্ডপ। বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে নাচঘর। উত্তরদিকে দক্ষিণমুখো মূল মণ্ডপ, সেখানে প্রতিমা আর পুজো। তারপরে কিছুটা ফাঁকা উঠোন মতো, তার লাগোয়া বিরাট ঘর, সেখানে এক-দেড় হাজার লোক বসতে পারে। সে ঘরের কেন্দ্রে উঁচো মাটির মঞ্চ নাচ-গান-যাত্রা পালার জন্যে। মণ্ডপঘর চৌচালা। শনের ছাউনি। সারা বছর নাচঘরের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। কিন্তু শরৎকালের কমলা রঙের রোদ উঠতে না উঠতে সেদিকে নজর পড়ে সকলের। কুলি-কামিন সর্দার থেকে বাবু-ম্যানেজার সকলেই তখন নাচঘর সাফাই-সাড়াইয়ের দিকে সজাগ হয়।

আচার্য ঠাকুর এসে পড়বে প্রতিমা গড়তে। এখানে কুমোর প্রতিমা গড়ে না। এক শ্রেণীর আচার্য বামুন এ কাজ করে। যাত্রার দল আসবে বায়না ধরতে। পুরোত আসবে ফর্দ মাফিক সব যোগাড়-যন্ত্রের কথা বলতে। ঢাকি আসবে পাকা কথা বলতে। কাজেই সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে পুজোর আভ্যন্তরীণ সাড়া পড়ে। কয়েকজন বাবু আর সর্দারের ওপরে এ সবের দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় ম্যানেজার। এদের ওপরে পুজোর সর্বময় কর্তা বড়বাবু—হেড ক্লার্ক। প্রায় সব চা-বাগানেই বরাবরের এই রীতি। পুজোর খরচা বড় অংশ কোম্পানীর। মাথাপিছু সামান্য চাঁদা নেওয়া হয় শ্রমিক-সর্দার-চৌকিদারদের তলব থেকে। বাবুরাও দেয় যার যার

পদমর্যাদা অনুসারে। কিন্তু তা আর কত ? তাতে কি হয় ? ম্যানেজার দুজনে দেয় মোটা অঙ্ক। পুজোর খরচা তো কম নয়। এক-দুদিন যাত্রা পালা হবে। তারই খরচা কত ! পুজোর পরে উট্‌কো খরচও আছে। ম্যাজিকওলা আসবে, নাচের দল আসবে, পুজোর আগেই রামলীলার দল এসে ঘাঁটি গাড়বে। পনেরো-বিশ দিন ধরে চলবে তাদের নাচ-গান। এদেরও কিছু দিতে হবে। এসব মিলে পুজোর মাসখানেক আগে থেকেই সারা চা-বাগিচা মশগুল হয়ে ওঠে। পুজোর ক'দিন আবার নাচঘরের চারদিক ঘিরে বসবে মেলা। দশমীর দিন দশরা উৎসব—রাবণ দাহ। আবার দু সপ্তাহ যেতে না যেতে কালী পুজো। কালী পুজোয় তেমন ঘটা নেই। কিন্তু সে উপলক্ষে কোনও কোনও চা-বাগানে যাত্রাপালা হয়। কোথাও বা চা-বাগানের বাবু-শ্রমিকেরা নাটক করে। তাই আনন্দের আমেজটা থাকে কালীপুজো পর্যন্ত। তারপরে আস্তে আস্তে সব নিস্তেজ হয়ে আসে। শীত নামে। শীতের কাঁপুনি লাগে। কাম-কাজে মন বসে ধীরে ধীরে।

চা-বাগানের পুজো এখনও অনেকটা সাবেক কালের মত আছে বিকাশ-বাবু। আপনাদের কলকাতার মতো না।—হাসতে হাসতে বলেছিল অরুণবাবু। পুজোর বর্ণনাও অরুণবাবুর মুখ থেকেই শুনেছে বিকাশ। সন্ধ্যার মুখে অফিস ফাঁকা। ম্যানেজার চলে গেছে বাংলোয়। দীপেন-বাবুও বাসায় গেছে। আসবে আবার রাত সাতটায়। অমর বিকেলের কামজারিতে চা-পাতা তোলার হিসেব সেরে বাসায় যায়। চা-জলখাবার খেয়ে সাড়ে ছটায় অফিসে আসে। হেরম্ববাবু, মির্জা এই দুজনের কাজ অফিসে বিশেষ নয়। তাদের কাজ বাগিচা-বাড়িতে। অফিসে তাদের আসতে হয় ম্যানেজারের সঙ্গে কাজের কথাবার্তা বলতে। সাধারণভাবে তারা সকালের দিকেই সে সব সেরে যায়। কখনো সখনো সন্ধ্যায় এসে বসে মির্জা বা হেরম্ববাবু, আড্ডা জমে। এ কথা সে কথার গুলতানি চলে। কিন্তু আজ তারা কেউ নেই। অরুণবাবুরও এ সময়ে অফিসে থাকার কথা নয়। বিকাশের সঙ্গে গল্প করতে করতে ভদ্রলোক যেন ভুলেই গেছে যে এ সময়ে একবার বাসায় ফিরে চা-টা খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে কিছু বাদে ফের তার অফিসে আসার কথা। সত্যেনবাবু যায় ছ'টায়। ফের আসবে সাতটায়। অমরও আসবে। অমর আর সত্যেন-বাবুর কাজের দায়িত্ব অনেক। তারা হাজিরাবাবু। সন্ধ্যার পর ফের বিকাশও আসে সাতটায়। তখন তার বিশেষ কাজ থাকে না। সে অন্যদের কাজ দেখে তখন।

অরুণবাবু বলছিল, পুজোর ছুটিতে যাবেন নাকি কলকাতা ?

বিকাশ বললে, এখনও কিছু ভাবি নি।

বলেন কি ?

ছুটি কি পাবো ?

তা, বড় সাহেবকে ধরলে সপ্তাহ দুই পাবেন নিশ্চয়। বাপ-মা ভাইবোন ছেড়ে দূরে আছেন। বড়বাবুকে বললে উনিই ম্যানেজারকে বোঝাবেন সব।

বিকাশ একটু ভাবলে। দোমনা লাগে ঠিকই। কিন্তু কলকাতা যাবার খুব একটা ইচ্ছা তার নেই। তার চেয়ে এখানকার পুজোটা দেখাই ভাল। নতুন একটা অভিজ্ঞতা হবে। কলকাতা পুজোর সময় গিয়ে কী হবে! কলকাতার পুজো তো আজন্ম দেখেছে। দেখে দেখে একঘেয়ে হৈ-হট্টগোল ভিড়ভাট্টা ছাড়া আর কিছু মনেই হয় না এখন। সে সব ভেবেই বললে, ছুটি যদি পাই পুজোর পরেই এক সময় যাবো। এবার এখানকার পুজোটা দেখি।

তা ভাল। আমি বেরুবো ভাবছি। ছুটির কথা বলেছি বড় সাহেবকে। জানেন তো, আমরা মেদিনীপুরের লোক। বাবা কি করে ছিটকে এসে পড়েছিল আসামের চা-বাগানে। তারপর থেকে ধীরে ধীরে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন।

যাবেন কোথায় ?

তা ঠিক নেই। ইচ্ছা তো অনেক। রেস্ততে কুলোলে হয়। শেষমেশ হয়তো শিলচর কি করিমগঞ্জ ভাইয়ের আর বন্ধুদের বাড়ি ঘুরে আসতে হবে। তবে, ইচ্ছা কি জানেন ? বর্ধমানে শালারা থাকে। সেখানে গেলে, কলকাতা কাছেই, ঘুরে আসা যায়। আমার স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েরা কলকাতা বা আমাদের দেশের বাড়ি কিছুই দেখে নি।

তা হলে ঘুরে আসুন।

শুনেছি, খুব পালটে গেছে সব। দেশ আর সে দেশ নেই, কলকাতা আর আগের কলকাতা নেই।

আগের বলতে কত আগের কথা বলছেন ?

তা হবে তিরিশ বছর। আমি তখন ছয় মাস ছিলাম কলকাতায় জ্যাঠার বাসায়। তারপরে চা-বাগানের চাকরি। এখানে নয়, আমার প্রথম চাকরি দুর্লভছড়া চা-বাগানে। মাইনে ছিল দেড়শো টাকা। কলকাতা থেকে টাইপ শিখে এসেছি। ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতা ছিলাম ভাগ্য অন্বেষণে। শিলচর শহরে তখন আমাদের আস্তানা। বাবা কাছের এক চা-বাগানের ডাক্তার। হঠাৎ একদিন চিঠি পেলাম, 'চলে এসো। কলকাতাতে কবে কি হবে ঠিক নেই। দুর্লভছড়া চা-বাগানে টাইপ-ক্লার্ক

চায়। তুমি সিলেক্টেড।'

সিলেক্টেড ?

হাঁ! অবাক হচ্ছেন কেন ? আপনি যেমন হলেন। অমরবাবু আপনার ডিটেল বড়বাবু আর বড় সাহেবকে বলে আপনার চাকরি করে দেয় নি ? আমারও সে রকম। বাবার জানাশোনা একজন দুর্লভছড়া চা-বাগানের টিলাবাবু ছিলেন। তাঁকে বাবা ধরেছিলেন। আর তিনি আমার হয়ে ধরেছিলেন ম্যানেজারকে। তখনও সাহেবি আমল যায় নি। সাহেবী কোম্পানী, সাহেব ম্যানেজার—খাস ইংরেজ। চা-বাগানে এভাবেই চাকরি হতো। এখন কিছুটা কোয়ালিফায়েড চায়।

শুনেছি, সাহেবদের আমলে চা-বাগানের হাল অনেক ভাল ছিল। এখন তেমন নয়—দেশী কোম্পানী, দেশী সাহেব সব নাকি ঠক্‌বাজ !

সাহেবরাও কম ছিল না। কিন্তু তাদের তখন রাজত্ব। তাদের দাপট সবাই মাথা পেতে নিত। এখন স্বাধীন দেশ। সবাই রাজা। চা-কোম্পানীর সব এখন দেশী ব্যবসায়ীদের হাতে। তাদের কাজ-কারবার সোজাসুজি চোখের সামনে। সাহেবদের তো তা ছিল না। তারা চোখের আড়ালে না করেছে কী ? ধরুন এই চা-শ্রমিকদের তাঁবে রাখতে শ্রমিকদের মধ্যেই নানা বিভেদ তৈরি করে দিত। বাবুশ্রেণী শ্রমিকদের মানুষ মনে করতো না। এসব এই সেদিনও ছিল। সাহেবরা শ্রমিকদের ইউনিয়ন করতে দিয়েছে ? এখন দেখুন, কোন্ চা-বাগানে একটা-দুটো ইউনিয়ন নেই ? দিনকালের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সেটা মেনে নিজেদের যদি তার সঙ্গে হাত মেলানোর যোগ্যতা না থাকে তা হলে আর কি করা যাবে ? চা-বাগানে বাবুশ্রেণীর মধ্যেই এ ধরনের অযোগ্যতা বেশি।

বিকাশ হাঁ করে শুনছে সব। মনে মনে বেশ সিরিয়াস হয়ে উঠছে। অরুণবাবু বললে, দেরী হয়ে গেল। আজ উঠি, চলুন।

রাতে আসবেন ?

আসবো হয়তো।

আমাকে তো আসতেই হবে। অনেকগুলো খাতাপত্র আপডেটেড করা নেই।

আসবেন। এখন তো চলুন।

অফিস থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলে চলেছে অরুণবাবু। বিকাশ শ্রোতা। নীরব।

এ কথা সে কথার মধ্যে অরুণবাবু হঠাৎ বললেন, লেবারবাবুর কথা শুনেছেন তো ?

বিকাশ শোনে নি। বললে, সে আবার কি? শুনি নি তো!
অরুণবাবুর মুখে একটা হাসির আভাস ফুটল। কিন্তু পথের আবছা অন্ধকারে তা তেমন বোঝা যায় না। রাস্তায় বেশ কিছুটা দূরে দূরে বিজলি বাতি। লালচে মিটমিটে। সে আলোতে হালকা অন্ধকারেও স্পষ্ট কিছু ঠাহর করা যায় না। বিকাশের নজরে আসে নি অরুণবাবুর হাসির আভাস। অরুণবাবু বললে, কাছাড়ের এক চা-বাগানের এক শ্রমিকের ছেলে। বছর কয়েক আগে মাধ্যমিক পাশ করে। চা-বাগানের শ্রমিক আর সর্দার-চৌকিদারদের কাছে তা এক বিরাট গর্বের ব্যাপার। ম্যানেজার খুশি হয়ে শ্রমিকের সেই ছেলেকে একশো টাকা বখশিস দিলে। ছেলেটির বাবা সে সুযোগে ম্যানেজারের কাছে আর্জি পেশ করলে, তার ছেলেকে একটা বাবুর চাকরি দিতে হবে। ম্যানেজারও কথা দিলে। কিছু দিন বাদে একটা পোস্ট খালিও হল। অ্যাসিস্টান্ট টিলাবাবুর পোস্ট। সর্দার-চৌকিদাররা সেই পোস্টে ঐ ছেলেকে নেবার দাবী তুললে। ম্যানেজার রাজি। বাবুরা আপত্তি তুললে। তাদের বক্তব্য কুলির ছেলে, একটা পাশ করেছে বলেই বাবুর আসন পেয়ে যাবে, তা হয় না। বাবুদের একটা মর্যাদা আছে না? শ্রমিকরা পালটা বললে, লেখাপড়া শিখে যোগ্য হয়েছে। যোগ্যকে যোগ্যস্থান দিতে হবে না? বাগানে তো দু'চারজন ছাড়া সব বাবুই মাধ্যমিক পাশও নয়। অনেক ভেবেচিন্তে ম্যানেজার জানালে, চা-বাগানের চাকরিতে লেখাপড়াই সব নয়, অভিজ্ঞতা দরকার। অন্য কোনও বাগানে অ্যাপ্রেন্টিস হতে চেষ্টা করুক। তারপর যা হয় করা যাবে। এবার শ্রমিক ইউনিয়ন চাপ দিলে। অ্যাপ্রেন্টিস আবার অন্য কোথায় হতে যাবে? এ বাগানেই তার ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যবস্থা হলও। কিন্তু বাবুরা সেই শ্রমিক-যুবার সঙ্গে অসহযোগ শুরু করলে। তাকে তারা চেয়ারে বসতে দেবে না, তাদের এক টেবিলে কাজ করতে দেবে না। সে তো কুলির ছেলে।
শুনতে শুনতে বিকাশ স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিল। অরুণবাবু থেমে গেলেন দেখে জিজ্ঞেস করলে, তারপর?
তারপর সেই কুলির ছেলেকে ব্রাঞ্চ বাগানের ইনচার্জ করে বহাল করলে ম্যানেজার। ব্রাঞ্চে এক-দুজন বাবু থাকে। তারা এত ঘোঁট পাকাতে সাহস পায় নি। ম্যানেজার, শ্রমিক শ্রেণী, ইউনিয়ন—সবই তাদের তুলনায় বৃহত্তম শক্তি। তার বিরোধিতা তো সহজ নয়।
হঠাৎ একটু থেমে অরুণবাবু তাকালে বিকাশের দিকে। অন্ধকারে কিছু ভাল বোঝা যায় না। বললে, এবার তো আমার পথ আলাদা।

যাই এখন !

আপনি আসবেন ?

ভাবছি। বাসায়ই বা কি করবো ?

ঠিক আছে, আমি চা-টা খেয়েই চলে আসছি।

বিকাশও তার পথ ধরলে। কিছুটা এলে রাস্তার পাশে নাচঘর। দেখলে পুজো মণ্ডপে বিজলি বাতি জ্বলছে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাকালে। প্রতিমার কাঠাম তৈরি হচ্ছে। কাঠাম, খড়ের ধড়, একমেটে, দোমেটে, শাদা খড়ির প্রলেপ তারপরে রঙ-তুলি। এসব তার শোনা কথা। স্বচক্ষে বিশেষ দেখে নি। কলকাতায় শেয়ালদার মুখে মির্জাপুর স্ট্রিট যেখানে সার্কুলার রোডে মিলেছে সেখানে কুমোরদের ছোট একটা ঘাঁটি আছে। বারো মাসে তেরো পার্বণের নানা দেবদেবীর মূর্তি গড়া হয় সেখানে। ফুটপাথ জুড়ে প্রতিমা সাজিয়ে রাখে। অনেক দেখেছে। কিন্তু প্রতিমা গড়ার কাজটা শুরু থেকে সমাপ্তিটা কখনো লক্ষ্য করে নি। কলকাতার কুমার-টুলিতো পৃথিবীখ্যাত কুমোরপাড়া। সেখানেও কখনো যায় নি। এখন যেন ভাবতে কেমন লাগছে। কলকাতা তোমাকে চাকরি দেয় নি সেই অভিমানে চা-বাগানে এসেছো ! অথচ তুমি আজন্ম কলকাতায় থেকেও কলকাতার কত কিছু চেয়েও দেখ নি, নিতেও পারো নি।

ব্যাপারটা যেন হঠাৎ একটা আবিষ্কারের মতো। মনে মনে খুব থমকে যায় বিকাশ। পাছে চা-বাগানের কোনওকিছু হারায় সে কথা এখন খুব মনে বসে গেল। পুজো মন্ডপের দিকে এগিয়ে গেল বিকাশ। তিনজন আচার্য বামুন—তাদের চিনতে অসুবিধে নেই। তিনজনেরই গেঞ্জির ফাঁকে কাঁধ বেয়ে ধবধপে পৈতে চোখে পড়ে। আরও দু'জন চা-বাগানের শ্রমিক তাদের যোগালি—ফাইফরমাস খাটার জন্যে। পুজামন্ডপের কাছে এসে দাঁড়াতেই তারা সবাই বিকাশকে দেখে একগাল হেসে নমস্কার জানালে। এদের কারও সঙ্গেই বিকাশের পরিচয় নেই। একটা কিছু তো বলা দরকার ভাবছিল বিকাশ। তাকে দেখে যোগালি দু'জন ঠাকুরদের বললে, লতুন বাবু।

আচার্যদের একজন তাকে বললে, শুইনছি আপনে কইলকাতার মানুষ। আমরার গড়া ঠাকুর নি ভালা লাইগব ?

কথা বলার সুযোগ পেয়ে বিকাশ খুশি হল। বললে, ভাল লাগবে না কেন ঠাকুর মশায় ? শুনেছি, আপনারা শিল্পীর বংশ। প্রতিমা গড়াই আপনাদের বংশগত পেশা। তা কি ভাল না লাগার মতো হতে পারে ?

বিকাশের কথা শুনে আচার্য তিন জনের কি হল কে জানে। একজন

খুব উৎসাহে বললে, বাইরে খাড়াই কেনে, ঘরৎ আসেন, বসেন আইয়া।
বিকাশ বললে, এখন তো সময় নেই। পরে একদিন আসবো।
আইবেন কিন্তু। আমরার খুব ভালা লাইগ আইলে! —বলে, দেয়ালের গায়ে টাঙানো খুলে রাখা জামার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বার করে বিকাশের দিকে এগিয়ে এসে প্রধান আচার্য বললে, নেন, সিগারেট খান।
না না! সেকি? আমি দিচ্ছি।—বলে বিকাশ তার নিজের পকেটে হাত ঢোকালে।
প্রধান আচার্য বললে, তা হয় নাকি? আমারটাই আইজ আপনে নিবেন। পরে একদিন আপনের বাসাৎ যাইমু। তখন আপনের চা-সিগারেট পান-গুয়া খাইয়া আইমু।
চা-সিগারেট ঠিক আছে, কিন্তু পান-গুয়া? মনে মনে হাসলে বিকাশ। পান-গুয়া এদের আদর-আপ্যায়নের একটা বিশেষ অঙ্গ। পান-গুয়া খায়ও প্রায় সকলে। শ্রমিক মেয়ে-পুরুষরা পোঁটলা করে রাখে সঙ্গে। বাবুরা বা ঐ শ্রেণীর লোকেরা ছোট টিনের কৌটোয় রাখে পান-গুয়া-সাদাপাতা (তামাক পাতা) আর চুন নিজেদের সঙ্গে। গুয়া মানে, পাকা সুপোরি জলে ভিজিয়ে রাখে বেশ কিছুদিন, তারপর খোসা ছাড়িয়ে পানের সঙ্গে বা এমনি খায়। অনেকটা নেশার মতোই। কী রকম বিটকেল গন্ধ সে সুপোরির। এক টুক্‌রো চিবোলেই মাথা ঘুরবে, ঘাম ছুট্‌বে, মনে হবে যেন সারা গায়ে আগুন ধরে গেছে। বিকাশ আচার্যদের বললে, নিশ্চয়, আপনারা আসবেন একদিন আমার বাসায়। আজ এখন থাক সিগারেট।
তারা কি ভাবলে কে জানে। বিকাশ আর দাঁড়ালে না। সত্যি তার দেরী হয়ে যাচ্ছিল।

প্রথম দিকে রাতে আর অফিসে যেতে হত না বিকাশকে। এপ্রিল মাস থেকে কাজের বহর বেড়েছে অনেকটা। তাই সকাল সাতটা থেকে সাড়ে বারোটা, দুপুর দুটো থেকে সন্ধ্যে সাড়ে পাঁচটা, ফের রাত সাতটা থেকে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত অফিস করতে হচ্ছে। সকল বাবুরই কাজের এই ধারা।
বাবুদের একটা ক্লাব আছে। ক্লাবে দুটো বড় আলমারিতে গল্প-উপন্যাসের বই, কিছু ঘরোয়া খেলার সরঞ্জাম—তাস, ক্যারাম, দাবা, লুডু, ব্যাডমিণ্টন। মাঝেমধ্যে কেউ কেউ আসে ক্লাবে। তাস খেলে, ক্যারাম খেলে। একটা পুরোনো রেডিও রয়েছে এককোণে টেবিলের

ওপরে। কেউ শোনে না। কারণ সকলেরই নিজের রেডিও আছে বাসায়। বইয়ের আলমারি কেউ খোলে না। ছুটির দিনে দুপুর বেলা বা রাত্রে অনেকে আসে ক্লাবে। তাস, দাবা, ক্যারাম খেলা হয়। নানা খোসগল্প চলে। বিকাশও আসতো গোড়ার দিকে। কিন্তু এখন ভাল লাগে না। তার তো কোনও খেলাতে মন যায় না, সে আসতো আলমারির বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে। বইপত্র যা আছে, দেখে খুব একটা উৎসাহ-আগ্রহ লাগে না।

ক্লাবঘরটা পাশে রেখে অফিসে যাতায়াত করতে হয় রোজ। নাচঘর ছেড়ে যখন ক্লাবঘরের পাশে এসেছে, দেখলে দরজা-জানালা খুলে আলো জেবলে ভেতরে কি হচ্ছে যেন। বিকাশ ক্লাবঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালে। দীপেনবাবু আর হেরম্ববাবু ভেতরে কথা বলছে। বিকাশকে দেখে দীপেনবাবু বললে, আরে আসুন!

বিকাশ ভেতরে ঢুকলে।

দীপেনবাবু ফের বললে, পুজোর তো আর মাত্র মাস দেড়েক বাকি। আচার্য ঠাকুররা এসে গেছে। তাদের থাকার ব্যবস্থা এবার ক্লাবঘরেই করে দিলাম।

বিকাশ শুনছে তাকিয়ে থেকে। দীপেনবাবু বলে চলেছে, অন্যান্য বার হেরম্ববাবুর কাছারিঘরেই ওদের থাকার ব্যবস্থা হতো। এবার ওর অসুবিধে আছে। তাই এখানেই—

বিকাশ হঠাৎ বলে ফেললে, আমার বাসাতেও ব্যবস্থা করতে পারতেন। আমার কোনো অসুবিধে হতো না।

বিকাশের কথা শুনে দীপেনবাবু আর হেরম্ববাবু মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করলে। বিকাশ বুঝিয়ে বললে, আমার তো এখন রান্নার লোকও আছে।

দীপেনবাবু প্রবল উৎসাহে বললে, ঠিক তো, সে সব তো আমার মনে আসে নি। এখনও অবিশ্যি আপনার বাসাতে ওদের থাকার কথা বলতে পারি। সবে তো কাল এসেছে। ক্লাবঘর থেকে ওদের জিনিসপত্র সব নিয়ে ইচ্ছে করলে আজই আপনার কাছারিঘরে গিয়ে উঠতে পারে ওরা।

বিকাশ বললে, বেশ তো, তাই করুন।

চাল-ডাল-তেল-নুন যা লাগবে গুদামবাবু কালই আপনাকে পাঠিয়ে দেবে। আপনার রাঁধুনীকে সব বুঝিয়ে বলে রাখুন গিয়ে। আজ থাক, কাল থেকে ওরা থাকবে গিয়ে আপনার বাসায়। কি হেরম্ববাবু? তাই তো ভাল হবে!

হেরম্ববাবু বললে, মন্দ কি? কবির বাসাৎ শিল্পীর ঠাঁই অনুচিত ভাবমু ক্যানে!

বলে হা হা করে হেসে তাকালে বিকাশের দিকে।

চা-জলখাবার খেয়ে রাতে সাড়ে-সাতটা নাগাদ অফিসে গিয়েছিল বিকাশ। অরুণবাবু আসে নি। অমর আর সত্যেনবাবু এসেছে। তারা কাজ নিয়ে ব্যস্ত। বিকাশকে দেখে অমর বললে, তুই বেশ মানিয়ে গেছিস বাগানে। রান্নার লোক হয়ে গেছে, অতিথি-অভ্যাগতের ব্যবস্থাও হচ্ছে। এবার বাকী রইল একটা বৌ।
অমরের কথা শুনে সত্যেনবাবু মুচকি মুচকি হাসছিল। সেদিকে এক পলক তাকিয়ে বিকাশ বললে, অতিথি-অভ্যাগতের কথা কে বললে তোকে ?
অফিসে আসার পথে ক্লাবঘরের কাছে দীপেনবাবু আর হেরম্ববাবুর সঙ্গে দেখা হল। তারাই বলল। ভাল করেছিস। আচার্য ঠাকুররা লোক ভাল।
তুই বলছিস ?
হাঁ! আজ দশ বছর ধরে ওদের দেখছি না! আমি যদি বামুন হতাম আমার বাসাতেই হয়তো থাকতো ওরা।
ওদের বুঝি জাতপাতের বাই আছে ?
বাই না, বিশ্বাস। তাতে তোর অসুবিধা হবে না। ওরা ওদের মনে থাকবে।
তাই ?
তোর বেলায় তাই হবে।
কেন ? আমার বেলায় কেন ?
তুই কলকাতার লোক। তোকে ওরা সমীহ করবে।
তোদের করে না বুঝি! তুইও তো কলকাতার লোক।
আমি কলকাতা ভুলে গেছি।
সত্যেনবাবু এবার মাথা তুলে বিকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, অমর-বাবু যে বৌয়ের কথা বলল, তা কবে হচ্ছে বিকাশবাবু ?
বিকাশ হেসে বললে, এখানে বাবুদের সবারই তো বৌ আছে। একজন না হয় বৌ বিহীনই থাকল। আপত্তি আছে আপনাদের ?
হ্যাঁ, আপত্তি আছে। মির্জা সাহেবকে বৌ নিয়ে আসতে হল, দেখলি না ?—বলে, সত্যেনবাবুর দিকে তাকিয়ে হো হো করে হাসলে অমর।
বিকাশও বলে, বাসন্তিয়া তো এখন আর নেই। তবে আর ভয়টা কিসের রে ?
এক গেছে, আর এক হতে কতক্ষণ ?—সত্যেনবাবু কথাটা বলে অমরের

দিকে তাকালে। অমর তাকালে বিকাশের দিকে।
বিকাশ বললে, আজ আর কাজকর্ম হবে না দেখছি। আচ্ছা, ঐ আচার্য ঠাকুররা নিরামিষ, না আমিষ?
মুরগী খায় না। পাঁঠা-খাসি চলবে। একটু-আধটু গঞ্জিকাও হয়, তুই টের পাবি না।—অমর হাসি টেনে বললে।
বিকাশ জিজ্ঞেস করে, কেন, কেন? আমি টের পাব না কেন?
তোকে দেখিয়ে টানবে নাকি গাঁজা?—অমর বলে।
নেশা হলে তো বুঝতে পারবো।—বিকাশ বলে।
ওসব নেশার তুই কিছু বুঝবি না। তুই নেশার কি জানিস? —অমর বলে, নেশার ব্যাপার বুঝতে হলে আরো ক'বছর লাগবে তোর।
সত্যেনবাবু বলে, অমরবাবু ঠিকই বলেছে। বাবুদের মধ্যে কে কি নেশা করে আপনি কিছু বুঝেছেন?
বিকাশ অবাক হয়ে বলে, বাবুরাও গাঁজা টানে নাকি?
গাঁজা, ভাঙ, মদ কোনটা নয় বল? তবে সবাই নয়, সব সময় নয়। যাক গে! এসব নিয়ে আর কিছু জানতে চাইবি না। একে একে সব জানবি, সব বুঝবি।

রাতে বাসায় ফিরে এসে সুকুমারকে সব বুঝিয়ে বলে দিলে। আচার্য ঠাকুররা তার কাছারি ঘরে থাকবে কাল থেকে। তাদের জন্যে সকালে চা-জলখাবার, দুপুরে আর রাতে ভাত। বিকাশ সব জানিয়ে বললে, মাসখানেক আপনার একটু কষ্ট হবে।
সুকুমার বললে, না বাবু। কষ্ট কি? ভালাই লাইগব। একলা থাকি। তেনারা থাকলে একটুন দোকা দোকা লাইগ্‌ব, ভালাই ত। আপনে ভাববেন না।
না, বিকাশ ওসব নিয়ে তেমন কিছু ভাবছে না! এখন তার মাথায় অন্য ভাবনা। অমর সেই কবে মাধ্যমিক পাশ করে আসামের চা-বাগানে চলে এসেছিল তার কাকার বাসায়। তার কাকা চাকরি করতো চা-বাগানে। সে-ই ঢুকিয়েছে অমরকে চা-বাগানে। তারপর বিয়ে। মালাও কোন্ চা-বাগানের এক বাবুর মেয়ে। অমর আর বিকাশ স্কুলে এক ক্লাশে পড়তো। সে কবেকার কথা! তারপর স্কুল-জীবন শেষ হলে ছাড়াছাড়ি। অমর চলে এল আসামে কাকার কাছে। তার মা-বাবা ছেলেবেলাতেই মারা গেছে। কলকাতাতে তার একমাত্র দিদির কাছে থেকে মানুষ হয়েছে। সেই দিদিও মারা গেছে। তাই কলকাতার টানটা অমরের অন্যরকম। বিয়ের পরে মালাকে নিয়ে একবার গিয়েছিল কলকাতা।

তখন দেখা করেছে বন্ধু-বান্ধব সকলের সঙ্গে। বিকাশের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বরাবরের। দেখা-সাক্ষাৎ না হলেও চিঠি-পত্রের যোগাযোগ মোটামুটি ছিল। মাঝেসাজে অমর লিখতো, 'একবার চলে আয় চা-বাগানে। দ্যাখ এসে আমাদের জীবন। তোর কাজে লাগবে'। ভাল লাগবে লিখে নি, লিখেছে 'কাজে লাগবে'। সে সব কথা মনে আসছে এখন। 'দ্যাখ এসে আমাদের জীবন'—অমরের কথাটা মনে হচ্ছে আজ তার নিজের কথা। কলকাতার সবাইকে যদি চেঁচিয়ে বলতে পারতো বিকাশ 'দ্যাখ এসে আমাদের জীবন' তা হলে বোধ হয় কিছুটা স্বস্তি পেত। কলকাতায় থেকে থেকে অন্য জীবন আর জগতের কথা যে মনেই আসে না কারো। তারও তো মনে আসে নি। নেহাৎ দায়ে পড়ে খেয়ালের ঝোঁকে অমরকে লিখেছিল চাকরির কথা। ভাগ্যিস লিখেছিল!

একুশ

ডিসেম্বর থেকে নভেম্বর—এক বছর এক মাস। স্থায়ী বহাল করার পত্র বিকাশের হাতে দিয়ে দীপেনবাবু বললে, নিন, এবার জোয়ালটা ঠিক এঁটে বসবে, জান দিয়ে টানতে হবে এখন।

চিঠিটা পড়ে বিকাশ খুশি হল। মাইনে বাড়ছে। চাকরির অন্যান্য সুবিধা-শর্ত সব ঠিক আছে। এসব নিয়ে তার তত মাথাব্যথা ছিল না। যাক্, ভালই হল। বললে, এখন তবে আমি আপনাদেরই লোক!

আপনি যেমন মনে করবেন! ভাল কথা। কলকাতা যাবার ইচ্ছে আছে নাকি? মা-বাবা—

দীপেনবাবুকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললে বিকাশ, না। তেমন ইচ্ছে নয়।

কেন? টাকা-পয়সার অসুবিধা?

তা তো আছেই। তা না থাকলেও আরও কিছু দিন বাদে যদি ছুটি দেন, যাবো। এখন নয়।

ঠিক আছে। বলবেন।

দীপেনবাবু বেরিয়ে গেল অফিস থেকে। বিকেল পাঁচটা হয়েছে। অন্ধকার হয়ে এসেছে চারদিক। দূরে কুয়াশা। কামজারি সেরে এখন হেরম্ববাবু, মির্জা, অমর, সত্যেনবাবু একবার আসবে অফিসে। অরুণবাবু কলকলিঘাট স্টেশনে গেছে অফিসের কি কাজে। বোধহয় ওয়াগন বুকিং-এর খোঁজখবর নিতে। বড় চা-ঘরবাবুর রিপোর্ট, কলঘরে আড়াই

শো পেটি চা প্যাক করা হয়ে আছে। কলকাতা পাঠাতে হবে।
অমর ঢুকল অফিসে। বিকাশ তাকে ডেকে চিঠিটা দেখালে। অমর তার পিঠে আলগোছে একটা কিল মেরে বললে, সাব্বাস্। এক গোয়ালের হয়ে গেলি! দড়ি ছিঁড়ে পালাবি না তো?
তা বন্ধনের ওপরে নির্ভর করে। বাঁধনটা যদি যন্ত্রণার হয়, দড়ি ছিঁড়তে ইচ্ছে হবে না?
হেরম্ববাবু তক্ষুণি ঢুকছিল অফিসে। অমর আর বিকাশের কথা কানে গেছে তার। কাছে এসে বললে, অভিনন্দন বিকাশবাবু। কাইল দীপেনবাবুর থন্ শুইনছি আপনের কনফার্মেশনের কথা। বড় সাহেব কাইলই দীপেনবাবুরে কইলকাতার হেড অফিসের চিঠি দিছে। অখন একে একে সব গুছাই লয়েন বিকাশবাবু। চা-বাগানের যত দুষই থাকুক না কেনে শান্তি আছে জানবেন।
অমর বললে, চল। বাসায় যাবি তো?
বিকাশ উঠে পড়লে। অমরের সঙ্গে অফিস থেকে বেরিয়ে হাঁটা ধরলে।
অমর বললে, তোকে একটা কথা জানাই। আর কাউকে কখনো কিছু বলবি না কিন্তু।
বিকাশ খুব অবাক হয়ে বলে, বল। কি কথা?
দীপেনবাবুর কয় ছেলেমেয়ে জানিস?
না তো!—বলে, বিকাশ তাকায় অমরের দিকে। দীপেনবাবুর ছেলেমেয়ের কথা বলছে কেন বুঝতে পারে না।
ধীরে ধীরে অনুচ্চ স্বরে বলে অমর, এক মেয়ে, দুই ছেলে। মেয়ে বড়। মেয়ের নাম সোনালী। করিমগঞ্জে কলেজে পড়ে। এবার বি. এ. ফাইনাল দেবে। হোস্টেলে থাকে। ছেলেরাও ওখানেই থাকে। বড় ছেলে উচ্চ-মাধ্যমিক পড়ছে, ছোটটি পড়ছে স্কুলে, নাইনে।
বিকাশ শুনেছে কিন্তু এসব খবর বিকাশকে কেন শোনাচ্ছে অমর বুঝতে পারছে না। বললে, বাবুদের ছেলেমেয়েরা অনেকেই করিমগঞ্জ বা শিলচরে থেকে পড়াশোনা করছে। পুজার সময় তো অনেককে দেখেছিও। তো দীপেনবাবুর ছেলেমেয়ের খবর শোনাচ্ছিস কেন?
তোকে নিয়ে মুশ্‌কিল এই যে, চট করে কিছু ধরতে শিখিস নি। আমার সেই স্কুল জীবনের কথা মনে পড়ছে।—অমর একটু হাসির রেশ টেনে বললে, আমাদের অনুমান, আমাদের মানে, আমার আর বড় চা-ঘরবাবু—দীপেনবাবু যে তোকে একটু বিশেষ নজরে দেখে তা এমনি নয়। ওর মেয়ের কথা ভেবে তোকে খাতির করে। তোর কনফার্মেশানটাও ম্যানেজারকে বলে ভদ্রলোক বেশ তাড়াতাড়ি করিয়ে দিলে।

সে কি ?
হ্যাঁ। দীপেনবাবুর নজরে পড়েছিস বলেই তাড়াতাড়ি হল। জনার্দন-বাবু, মানে বড় চা-ঘরবাবু দীপেনবাবুর খুব ঘনিষ্ঠ লোক। দীপেনবাবু তাকে তোদের পারিবারিক খবর জানার কথা বলেছে। বড় চা-ঘরবাবু আবার আমার কাছে তোর সব জানতে চেয়েছে। অনুমানটাও অবিশ্যি বলেছে। তবে তা অন্য কেউ যাতে না জানে সে অনুরোধও করেছে।
এ তো বেশ জ্বালার ব্যাপার।—বিকাশ মনে মনে খুব থমকে যায়।
অমর বলে, আরো আছে। হেরম্ববাবুর মেয়ে হেনা তোকে চিঠি লিখে-ছিল, সে চিঠি তুই পাস নি।
কবে ?
পুজার আগে। চিঠিতে অবশ্য গোপনীয় কিছু ছিল না। হেনা কল-কাতায় তোদের বাড়ি গিয়েছিল সে সব কথা।
সে চিঠি আমি পেলাম না, কিন্তু তুই সব জানলি কি করে ?
জনার্দনবাবুকে বলেছে দীপেনবাবু, হেনার সেই চিঠি তোকে দেয় নি। কারণ, তোর সঙ্গে হেনার যোগাযোগ হোক এটা চায় না দীপেনবাবু। ইনল্যান্ড লেটারে লেখা চিঠি। যে লিখেছে তার নামধাম ওপরে লেখা ছিল।
বুঝলাম। কিন্তু সোনালী তো আমার কাছে বাচ্চা মেয়ে। আমার বয়েসটা দেখবে না ?
না! সোনালীরও বয়েস হয়েছে রে। তেইশ-চব্বিশ হবে। তবে, বোঝা যায় না।
তোর বয়েস কত ?
কেন ? তোর আর আমার বয়েসে খুব একটা তফাৎ নেই। আমার পঁয়ত্রিশ চলছে।
আমারও তো। তবে ?
দূর দূর। বয়েস এখানে ফ্যাক্টার নয়। এখানে ফ্যাক্টার হল চয়েস অ্যান্ড ফ্যাসিনেশন। বুঝলি ?
না, বুঝলাম না। কার চয়েস অ্যান্ড ফ্যাসিনেশন ? সোনালীর না তার বাবার ? তার বাবার নিশ্চয়। এসব ব্যাপারে আজকাল বাপগিরি অসম্ভব। তুই দেখবি, দীপেনবাবু মাস্ট ফেল।
তোর অমন মনে হচ্ছে কেন ?
হবে না ? সোনালী এতদিন চুপচাপ বসে আছে ? আর আমি! আমি শালা বিয়ে-ফিয়ে কল্পনাই করি না।

কেন ?
তা তোকে ঠিক বোঝাতে পারবো না। তবে জেনে রাখ, বিয়ে হয়তো আমি করবই না। যদি করি তা হলে হেনা বা সোনালীর মতো কাউকে নয়। —বিকাশ কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বলে।
বুঝেছি। তো তুই সব খুলে বলবি তো আমাকে !
তুইও দেখছি ভোঁতা হয়ে গেছিস। না, আমি কোন মেয়েকে ভালবাসি না। ভাল যে বাসবো তাও ভাবতে পারি না।
বিকাশের স্বরে একটা অপ্রত্যাশিত প্রত্যয় ফুটে উঠল। অমর তাতে সতর্ক হল। এ প্রসঙ্গে আর কিছু না বলে, বললে, যাবি ? আমার বাসায় ?
বিকাশ বললে, চল।

ডাকঘর চাঁদখিরা। আশপাশের সব চা-বাগান থেকে রোজ একজন করে চৌকিদার আসে ডাকঘরে। তার কাজ চা-বাগানের চিঠিপত্র সব ডাকে দেওয়া আর ডাকে যা আসে তা দেওয়া। ডাক নিয়ে বড়বাবুর টেবিলে রাখবে। বড়বাবু সব চিঠিপত্রের বিলি-ব্যবস্থা করবে। তারপরে যার চিঠি বা অন্য কিছু, সে পাবে। এই নিয়ম। বিকাশ ভাবছিল, সে সুযোগটা নিয়েছে দীপেনবাবু। নইলে হেনার চিঠিটা সে পেত। রাতে বাসায় ফিরে অমরের কথাগুলো বার বার তাকে কাঁটার মতো খোঁচাচ্ছে। সে ভেবেছিল দীপেনবাবু একজন সৎ ভদ্রলোক। তলে তলে সে যে এমন একখানা ছক কেটে চলেছে মনে এলেই পিত্ত জ্বলে ওঠে। ভাবলে, পালাবে নাকি চা-বাগান ছেড়ে ? কলকাতা, তার কলকাতাই ভাল। কিন্তু সে তো হেরে যাওয়া। সে হেরে যাবে ? তা ছাড়া, এখনও দেখার কত বাকি ! আরও তো অনেক আছে।
বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না। এ পর্যন্ত পুজা থেকে কালীপুজোর দিনগুলোর আমেজে মন ভরে ছিল। এখন সে সব ধুয়েমুছে ম্লান। মনে কিছুতেই স্বস্তি লাগছে না। একটা ছটফটানি টানা চলছে। পুজোর পরটাতে কলকাতা থেকে চিঠি এসেছে সুমিতা, রবীন আর শংকরের। সেগুলোর জবাব দেওয়া হয় নি। ওদের চিঠিগুলো আর একবার পড়ে দেখলে হয়। বিছানা ছেড়ে উঠে এল বিকাশ। ডিম করা লণ্ঠনের শিখাটা চড়িয়ে দিয়ে চিঠিগুলো বার করে এক এক করে পড়তে থাকল। তাকে যেন আজ কিসে পেয়ে বসেছে। সব কী রকম ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। তাই এই চিঠিগুলোর মধ্যে যেন কী একটা পেতে চাইছে সে।

শংকর লিখেছে, "এত দিনে তোর কথা ভুলে যাওয়া উচিত ছিল। ভুলে যাই নি, তার কারণ একটাই। আমাদের মধ্যে একমাত্র তুই কলকাতা ছেড়েছিস। শুধু যে ছেড়েছিস তা তো নয়, একবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিস। যদিও তোর চিঠিটা পড়ে মনে হল আমার সে ধারণা ভুলও হতে পারে। হঠাৎ এক দিন কলিং বেল-এর আওয়াজ শুনে দরজা খুলে দেখব তুই দাঁড়িয়ে।

আমরা সল্ট লেক-এ চলে এসেছি। আমি এখন একজন সরকারি কণ্ট্রাক্টার। নানা জায়গায় কাজ। ঘুরে বেড়াতে হয়। সময় কম পাই। ভাবি, তুই থাকলে তোকে পার্টনার করে নিতাম। তা, তুই কি আর ফিরে আসবি ?

কিছু পারিবারিক খবর আছে। তুই চলে যাওয়ার কিছু দিন বাদে দিদি দীপকদাকে বিয়ে করেছে। কিন্তু ওদের এখন ভয়ানক অশান্তি চলছে। শুনেছি দীপকদার স্বভাবচরিত্র সুবিধের নয়। দিদি ডিভোর্সের কথা ভাবছে। এ ব্যাপারে বাবা বা মা কিছু বলছে না। আমার ভাল লাগে না। দিদির বন্ধু তনিমাদিকে তো চিনতিস ? কিছু দিন হল সে আমেরিকা চলে গেছে। এখানে কোন্ এক সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তারপর তার সঙ্গে চলে গেছে। শোনা যাচ্ছে, সে নাকি আসলে ছিল একজন কলগার্ল। দিদি কিছুটা জানতো, সব নয়। মা কিন্তু ওকে দুচোখে দেখতে পারতো না। বাবাও তনিমাদির কথা উঠলে কটুকাটব্য করতো। আমার কিন্তু ওরকম কিছু মনে হয় না। তনিমাদির সব খবর শুনেও আমার ভালমন্দ কিছু মনে হয় নি। দিদির মুখে শুনেছি, তনিমাদি বেশ কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছে। বাড়ির অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। তাই তাকে আর্থিক প্রয়োজনে কত কি করতে হয়েছে। সে যদি যে করেই হোক একটু সুখের মুখ দেখে তাতে বিরূপ হবার কি আছে বল !

ভাল কথা। মাঝখানে একদিন তোদের বাড়ি গিয়েছিলাম। বৌদি বললে, তোদের ওখান থেকে কে এক ডাক্তার মেয়ে কলকাতা বেড়াতে এসেছিল। কে রে ?"

সুমিতার চিঠি, "চিঠির শুরুতেই গালমন্দ করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। হ্যাঁ রে, এতদিনে তোর আমাদের কথা মনে পড়ল ? সন্দেহ হলেও মনে হয় তুই পালটে যাস নি। তাই এতদিনের জমে ওঠা কথা তোকে আজ উজাড় করে জানাব। তুই বিরক্ত হবি না তো ? অবশ্য বিরক্ত শব্দটা তোর বেলায় কখনো খাটবে বিশ্বাস হয় না। তোকে তো কখনো বিরক্ত হতে দেখি নি। তবে আমি তোর উপরে ভয়ানক চটে আছি। কারণ

অনেক। একে একে জানাচ্ছি।

তুই চলে যাওয়ার পরে এ পর্যন্ত আমাদের কলকাতায় কত কি ঘটে গেল। আমাদের মানে, আমার, তোর, রবীনের অর্থাৎ আমাদের সে একজোটের কলকাতা। কী রে? তুই এখন বিচ্ছিন্ন? আমি কিন্তু মনে করি না।

যে খবর তোর সব আগে জানা দরকার, যেমন তনিমা। তুই চলে যাবার কয়েকদিন বাদে তোর সেই দুশো টাকা নিয়ে তনিমাকে দিয়ে এসেছি। প্রথমে খুব ভালই লেগেছিল। আমি গিটার বাজাই শুনে বেশ উৎসাহ আগ্রহ দেখাল। আমি তারপরে দু'বার গেছি। একবার ওকে না পেয়ে ফিরে এসেছি, আর একবার, সেটাই শেষ যাওয়া। গিয়ে দেখি এক সাহেবের সঙ্গে বসে গল্প করছে। সামনে টি টেবিলে মদের বোতল আর গ্লাশ। আমার মনটা খুব বিগড়ে গেল। আমাকে দেখে ও একটু গম্ভীর হয়ে উঠে এসে বললে, 'আজ ভাই বড্ড ব্যস্ত আছি। তুমি অন্য দিন এসো।' আমি আর যাই নি। হ্যাঁ রে, তোর সঙ্গে ওর পরিচয় কত দিনের? আমি যে তোর হয়ে গেলাম, তা তোর কথা কিছু জানতেই চায় নি। যেদিন টাকাটা দিলাম গিয়ে, বললাম, বিকাশ দিয়েছে। ও বললে, 'তাই? দাও।' হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিলে কিন্তু তোর নাম একবারও মুখে আনলে না। আমিই বললাম, তুই চা-বাগানে চাকরি পেয়ে চলে গেছিস। ও একটু হাসলে, কিছু বললে না। তোর তনিমা চরিত্রটি আমার কাছে রহস্যময়ই রয়ে গেল।

এবার রবীনের গল্প বলি। তুই কলকাতাতে থাকতেই ওর সঙ্গে ওর বৌ সুধার যে একটা মানসিক গোল বেঁধেছিল তা তো তুই জানতিস, রবীন বলেছে। তুই চলে যাবার পর হঠাৎই রবীন আমাদের বাড়ি ঘন ঘন আসতে লাগল। আমার ভাল লাগতো না। একদিন সব বললে। আমি শুনে তো থ। কি বলি ভেবে পাচ্ছি না। রবীন বললে, আমি যদি সুধার সঙ্গে দেখা করে ওর সঙ্গে কিছু ঘনিষ্ঠ হয়ে সব বোঝার চেষ্টা করি তা হলে রবীন একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারে। প্রথমে আমি রাজি হই নি। কারণটা তুই বুঝবি। শত হলেও আমি তো একটা মেয়ে। তুই তো জানিস রবীনের ব্যবহারে আমি কতটা বিরক্ত। ও আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আমি পাত্তা দিই নি বলে পরে আমার কত নিন্দা ছড়িয়েছে। রবীন তোর ঘনিষ্ঠ। তাই তোকে সব জানিয়েছিলাম। তুই-ই তখন ওকে বাধা দিয়েছিলি। নইলে আমি হয়তো রবীনকে বেইজ্জৎ করে ছাড়তাম। আমি অবশ্য গোপনে সব খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। রবীন তখন ছন্নছাড়ার মত। বলে বেড়াচ্ছে, চাকরি ছেড়ে দেবে। শ্বশুরের দেওয়া চাকরি করবে না। বাইরে কোথাও চলে যাবে—মা-বাপ-বৌয়ের সঙ্গে

কোনও সম্পর্ক রাখবে না। আমাকেও বলেছে। সুধার সঙ্গে তো আমার তেমন পরিচয় ছিল না। তাই এমন একটা ব্যাপারে আমি কী বলবো তাকে? মন স্থির করতে সময় লাগল। রবীন ছাড়ছে না। একদিন দুদিন পরই আসে। আসে রাতে। মা আর বাবাও বিরক্ত হতে থাকল। আমি শেষে একদিন গেলাম ওদের বাড়ি। রবীনের মা তো আমাকে ভালই চেনে। দেখে খুব অনুযোগ, যাওয়া-আসা কেন বন্ধ করলাম। এখন তো সুধা আছে। বেচারা একা। আমি এলে-গেলে ও কথা বলার লোক পায়। সত্যি রে, তাই। আমি গিয়ে ভাল করেছিলাম। প্রথম আমার কাছে মুখ খোলে নি সুধা। আমি গিটারের টুইশনি সেরে ফেরার পথে রাত সাতটা-আটটায় মাঝে মাঝে যাওয়া শুরু করলাম। তখন একদিনও রবীনকে দেখি নি। রবীন তখন রাত দশটা-এগারোটার আগে বাড়ি ফেরে না। একদিক থেকে সেটাই ভাল হয়েছিল। সুধার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। সুধাকে যত দেখি ততই অবাক হই। এমন একটা মেয়ের কথা ভেবে আমার বেশ গর্বও হয়। এমন জেদ, এমন নিষ্পাপ মন, আর এমন আত্মবিশ্বাস আমি দেখি নি। রবীনটা একটা চোয়াড় ছাড়া কিছু নয় রে। তবে হ্যাঁ, সুধা ওকে ঢিট্ করে ছেড়েছে।"

বিরাট চিঠি! সুমিতা সত্যি এত দিনের সব কথা প্রাণ খুলে লিখেছে। চিঠিটা আসার পরে তত মন দিয়ে ধীরে-সুস্থে পড়ে উঠতে পারে নি। আরও অনেকটা পড়া বাকি। যদিও একবার তো সবই পড়েছে। কিন্তু আর একবার ভাল করে না পড়লে সব যেন ঠিক ধরতে পারবে না। চিঠিটা এ পর্যন্ত পড়ে সুধার মূর্তিটা ফুটে উঠছে মনে। মূর্তি! না, প্রতিমা? প্রতিমাই বলতে হয়। আঃ, যদি এখন সে কলকাতায় থাকতো।

আবার মন দিলে চিঠিতে—"রবীন কি করেছে জানিস? ওর শ্বশুরকে গিয়ে বলেছে সুধাকে ডিভোর্স করবে। চাকরি ছেড়ে দেবে। বিয়েতে যেসব যৌতুক পেয়েছিল ফেরত দিয়ে দেবে। বোঝ্! সুধার বাবা ছুটে এসেছে রবীনের বাবার কাছে। রবীনের বাবা-মা সব শুনে হতবাক। সুধার কাছে জানতে চেয়েছে সব। সুধা তার শ্বশুর-শাশুড়িকে খোলা-খুলি বলেছে, আমি কি করবো? আপনাদের ছেলে যদি মাথা খারাপ করে, আমার কাজ চিকিৎসা করা। আমি তাই করব। আপনাদের আমি ছেড়ে যেতে পারবো না। বিশ্বাস করুন, আমি আপনাদের সকলকে ভালবাসি, হ্যাঁ, ভালবাসি!

রবীন চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। কয়েক মাস আলাদা থেকেছে কোথায় কোন্ মেসে। রেগে গিয়ে ওর বাবা-মা তাদের বাড়িঘর সম্পত্তি সব সুধার নামে উইল করে দেয়। ওর বাবা-মা যেমন ওর ওপরে বিশ্বাস

হারিয়েছে তেমনি ওর শ্বশুরবাড়ির সবাই। সবাই ওকে এখন ঘেন্না করে বলতে পারিস। কিন্তু সুধা? সুধা কি বলে জানিস? বলে, ভুলের খেসারৎ দিতে হবে, সে যেই হোক। তাই বলে তাকে ত্যাগ করবো আমি ভাবতে পারি না। রবীন কিন্তু সুধাকে ত্যাগের কথাই ভেবেছিল। আমার তো খট্‌কা, এই সুযোগে ও আমাকে কাছে টানার চেষ্টাই করেছিল। ভেবেছিল হয়তো ওর দিকে আমার সহানুভূতি লেগে যাবে। তুই কি এসব ভাবতে পারিস? কলকাতা ছেড়েছিস, হয়তো ভালই করেছিস। এসব অদ্ভুত জটিল অবস্থা তোকে দেখতে হচ্ছে না।"

সামান্য হাসি ফুটে উঠল বিকাশের মুখে। সুমি তো জানে না চা-বাগান কি? যেখানে মানুষ আছে সেখানেই যে মানবিক সবই আছে, কলকাতায় থাকলে সে বোধটাও কি হারিয়ে ফেলে সবাই?

আবার পড়া শুরু করলে, "মাঝখানে রবীন কোথায় উধাও হয়ে গেল। রবীনের মা-বাবা উচ্চবাচ্য করে না। সুধা এতটুকু হয়ে যায়। এ অবস্থাতে আমি গিয়ে অপ্রস্তুত হওয়া ছাড়া গতি ছিল না। তবু যেতাম। একদিন গিয়ে বেশ একটা নাটুকে অবস্থায় পড়ে গিয়েছিলাম। যে ঘটনা নিয়ে এত কাণ্ড, যে সেই ঘটনার নায়ক তাকে সঙ্গে নিয়ে রবীন তাদের বাড়িতে এসে হাজির। আমি তখন সেখানে। সুধা তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, 'বেরোন, বেরিয়ে যান। আপনি আবার কেন এসেছেন? শয়তান!' বাড়িশুদ্ধ সবাই হকচকিয়ে নির্বাক। রবীন পর্যন্ত কিছু বলছে না। ঝণ্টু, সেই ছেলেটা খুব নিস্তেজ গলায় বললে, 'সুধা, তোমার বাবা আমাকে সব বলেছে। আমাকে ক্ষমা করো। রবীনবাবুকে আমি সব বুঝিয়ে বলেছি। চলি।' এসব বলে সে বেরিয়ে গেল। রবীনকে কেউ কিছু বলছে না। সুধা না, তার মা-বাবা না। আমার খুব খারাপ লাগছিল। আমি ওকে ভেতরে যেতে বলে বেরিয়ে এলাম। তারপর আর রবীনের সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। কিন্তু সুধার সঙ্গে যোগাযোগ বেড়েছে। এখন সুধাও আসে মাঝেসাজে আমাদের বাড়ি। তার কাছেই শুনলাম, রবীন একটা নতুন চাকরি পেয়েছে। সুধা বলে, সে তাই চেয়েছিল। তার বাবার দেওয়া চাকরি রবীন করছে সুধার এটা একদম মনঃপূত না। আরো একটা ব্যাপারে সুধা যা বলে তা তোদের ভাল লাগবে না। কিন্তু আমার মনে হয় মিথ্যে কিছু বলে না সুধা। তোকে হয়তো মুখে তা বলতে পারতাম না। কিন্তু লিখতে অসুবিধে হবে না। কিছু সংকোচ লাগে সত্যি। সুধা বলে, পুরুষরা কেবল নারীর দেহটাকেই বড় করে দেখে। দেহে তো কত অসুখ-বিসুখ হয় আবার সারেও। তা

বুঝে দেখতে হবে না? নারীর সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক কি কেবল দেহের? রবীন সে সব ভেবেছে কিনা কে জানে। তবে, ও এখন একদম নিশ্চুপ। আমার নিজের মনে হয়েছে সব দিক থেকে কাঙাল হয়ে গেছে। এখন সুধাই ওদের বাড়ির সব। বাড়িঘর, শ্বশুরের টাকা-পয়সা সব সুধার। আর ভালবাসা? রবীনকে এত কিছুর পরেও সুধা ভালবাসে আমার মনে হয়েছে। এই সবকিছুই এখন রবীনকে কাঙাল বানিয়ে ছেড়েছে। এসব ভাবতে কি রকম লাগে আমার। কিন্তু সুধা সাধারণ যে নয়, তাও সত্যি। এমন মনের বল আমাদের ক'টা মেয়ের আছে বল? তারা তো কেঁদেকেটে জঞ্জাল জমিয়ে তুলতেই সব ওস্তাদ।
চিঠিটা বড্ড লম্বা হয়ে গেল। উপায় নেই। তোকে এসব না জানিয়ে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। আমার খবর শোন। গিটারে কিছু খ্যাতি পেয়েছি। একটা রেকর্ডও বাজারে ছেড়েছে একটা রেকর্ড কোম্পানী। কিছু টাকাও পেয়েছি। গিটার শেখার টুইশনিও বেড়েছে। তাতে এখন আয়টা মন্দ হচ্ছে না। ভাবছি গিটার শেখানোর একটা স্কুল করবো। আরও কয়েকজন মেয়ে থাকবে। মেয়েদেরই প্রতিষ্ঠান হবে। সুধা বলেছে ও-ও গিটার শিখে আমাদের সঙ্গে থাকবে। একটা হোটেলে সপ্তাহে একদিন রাত্রে গিটার বাজাবার চাকরি পেয়েছিলাম। মাইনে ভাল। আমি নিই নি। কেন নিই নি জানিস? হোটেল তো! গিটারের বাজনার চেয়ে আমি যে মেয়ে তারই চাহিদা। গিটার উপলক্ষ মাত্র।
একটা সমস্যায় পড়েছিলাম। মা-বাবা ক্ষেপে উঠেছিল আমার বিয়ের জন্যে। সাফ জানিয়ে দিয়েছি, বিয়ে করবো না। ভাল করি নি, বল? বিয়ে-ফিয়ে কি আমার পোষাবে?
তোদের কি ছুটিছাটা নেই? চলে আয় না একবার। অনেক দিন তো হলো। এবার একবার সকলের সঙ্গে দেখা করে যা।
ভাল কথা। একদিন তোদের সি. আই. টি. বিল্ডিং-এর নিহাল সিংয়ের সঙ্গে দেখা রাস্তায়। আমাকে বললে, বিকাশের খবর জানেন? যে ভাবে বলছিল, আমি চমকে উঠেছিলাম। বললাম, না তো! কি হয়েছে? ও বললে, ওর একটা কবিতা ছাপা হয়েছিল 'হালচাল' পত্রিকায়। আমি ওকে ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ও পেল কিনা জানি না। ওদের বাড়িতেও খবর নিয়েছিলাম। ওদেরও কিছু জানায় নি। আমি বললাম, আপনি লেখেন নাকি? ও বললে, না। ও পত্রিকা যারা বার করে তাদের আমি কাগজ সাপ্লাই দিই। তারা জানে, বিকাশ আমার বন্ধু। তাই পত্রিকাটা আমাকে দিয়েছিল বিকাশকে পাঠাতে।
মোটামুটি তোর যা জানা দরকার সব জানালাম। চিঠির জবাব আশা

করি না। তবু যদি জবাব দিস্, জানাবি, ডাক্তার মেয়েটি কে? যে কলকাতা এসেছিল, তোর বৌদির সঙ্গে গল্প করে গেছে।"
একটু হাসি ফুটল বিকাশের মুখে। হেনা সকলের জিজ্ঞাসা! অদ্ভুত। এখন রবীনের চিঠি। রবীনও কী লিখেছে মোটামুটি মনে আসছে। তবু আর একবার ভাল করে না পড়ে স্থির হতে পারছে না। পর পর শংকর আর সুমিতার চিঠি দুটো পড়ে মনে হল চিঠি আসার পরে একবার পাঠ করে সেই কবে ফেলে রেখেছে! কেবল মাঝে মাঝে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো একেকটা কথা মনে এসেছে আর ভেবেছে। তারপর তা উড়ে উধাও হয়েছে। আবার ধোঁয়া উঠেছে, আবার উড়েছে। একেক বার একেক রকম। এখনও সেই একই অবস্থা। কত কি মনে আসছে! কিন্তু এখানে সেও তো বিভিন্ন অবস্থার মুখোমুখি। শংকর, সুমিতা, রবীন বা কলকাতায় তার নিজের কেউ হয়তো তা কল্পনাই করতে পারে না। ওরা হয়তো ধরেই নিয়েছে, চাকরি হয়ে গেছে। বেশ আছে বিকাশ। হেনার মতো একটা মেয়ে যেচে সেধে তাদের বাড়ি গিয়ে খবর দেয়—বিকাশের দিনকাল এখন সুবর্ণ। আশ্চর্য, এরা কেউ জানতে চায় নি, এখানে কিভাবে দিন কাটছে, কেমন লাগছে, মানুষজন কেমন, কেমন পরিবেশ। বিকাশ চোখ বুজে ভাবে কিছুক্ষণ। মনে একটা তোলপাড় করা প্রশ্ন ওঠে—কেন? কেন? কেন? ধ্বনি প্রতিধ্বনি মনের ভেতরে ওঠে, মিলিয়ে যায়, ওঠে, মিলিয়ে যায়। তার কথা কেউ জানতে চায় নি। কেন, কেন, কেন?
রবীনের চিঠি তুলে ধরলে বিকাশ। লিখেছে, "তোকে আমি চিঠি দিতাম। তুই চলে যাবার পর আমার সময় বড় অস্থিরতার মধ্যে কেটেছে কিছু দিন। তাই চিঠি লিখি লিখি ভেবেও লিখে উঠতে পারি নি। অবশ্য মনে মনে একটা প্রত্যাশা ছিল, তুই চিঠি দিবি। তোর চিঠিটা পড়ে মনে হচ্ছে সব ভুলে যাস নি। তাই প্রথমেই জানাই, আমি এ পর্যন্ত কেবল ভুলই করে চলেছি আর তার জন্যে খেসারৎ দিতে হচ্ছে অনেক।
আমার আগের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। এখন নতুন যেটা জুটেছে আগের চেয়ে ভাল না হলেও আমি অনেক স্বস্তিতে আছি। সুধা নাকি তাই চেয়েছিল। সুধার মতে চাকরির বিনিময়ে বিয়ে করাটা অত্যন্ত অমর্যাদার। দেরিতে হলেও আমি যে শ্বশুরের দেওয়া চাকরি ছেড়ে আর একটা ধরেছি, তা নাকি আমার যোগ্যতাই প্রমাণ করে।
ইতিমধ্যে আমার দাম্পত্য জীবনে অনেক অঘটন ঘটে গেছে। দায়ি অবশ্য আমি। কিছুটা তো তুই জেনেই গেছিস। বাদবাকী সব শোনাবো যখন আবার দেখা হবে। তবে হ্যাঁ, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন,

এরকম একটা বিশ্বাস আমার দৃঢ় হয়েছে। তুই নিশ্চয় হাসবি। ভাববি, এও আমার আর এক ভুল। না রে, এ আমার ভুল নয়, বিশ্বাস। এ পর্যন্ত সুধাকে কেন্দ্র করে আমি যা করেছি তার জন্যে আমার এখন গ্লানির শেষ নেই। এখানে আমার কথা শোনার মতো কেউ নেই। তোর অভাবটা সে জন্যেই মর্মান্তিক মনে হয়। ভেবেছিলাম, সুমিতা বোধ হয় বুঝবে সব। ও কিছু বোঝে নি বা বুঝেও হয়তো সাড়া দিতে পারে নি। কিন্তু সুধাকে ও কাছে টেনে নিয়েছে।
যাক ওসব। সুধা সম্পর্কে আমার ভুলই কেবল ভেঙেছে তাই নয় শুধু, আমি ওকে যত দেখছি, যত এখন ওর কথা ভাবছি ততই যেন খেই হারিয়ে ফেলছি। আমি যে এত কাণ্ড করলাম, শেষ পর্যন্ত সেই ঝণ্টু ছেলেটাকে অবধি আমাদের বাড়ি টেনে নিয়ে এসেছিলাম সুধার মন বুঝতে, সুধা কিন্তু সে সব কোনও ব্যাপারেই আমাকে কিছু বলে নি, বাধা দেয় নি, প্রতিবাদ করে নি। সব কিছুতেই সে যেন নীরব দর্শক। গোড়ার দিকে সুধার এই স্বভাব আমাকে ক্ষিপ্ত করেছে, অস্থির করেছে। সহ্য করতে না পেরে আমি সুধাকে আরও ভুল বুঝেছি। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এত অঘটন, এখন মনে হচ্ছে তা নিছক একটা সাধারণ উচ্ছৃংখলা। ঝণ্টু আমাকে বলেছে, ওরা ভেবেচিন্তে কিছু করে নি। ওদের ওরকম করার জন্যে যে সুধাকে এমন একটা ভয়ানক অবস্থায় পড়তে হবে তা ওরা কল্পনাও করে নি। Practical joke বলে একটা কথা আছে না, এ যেন তাই। হঠাৎই খেয়ালের বশে নাকি দক্ষিণেশ্বরে ওরা সেদিন ও কাণ্ড করেছিল। তাই যদি হয়, ভেবে দ্যাখ, আমার কি সর্বনাশটা হয়েছে তাতে। ঝণ্টু অবশ্য সুধার কাছে ক্ষমা চেয়েছে। তখন সুধার সেই উগ্র মূর্তি, তুই কল্পনাও করতে পারবি না। আমি সেই প্রথম সুধার ভয়ংকর বিরূপ রূপ দেখলাম। নিজেকে সেই মুহূর্ত থেকে অপরাধী মনে হচ্ছে, আর তোর অভাবটা লাগছে বড়, যদি তুই এখন কলকাতায় থাকতি! কী যে ভাল হত।
চা-বাগানে গিয়ে তোর এই অজ্ঞাতবাস আমি ভাবতে পারি না। চলে আয়। আজন্মের কলকাতা ছেড়ে থাকবি তুই?"
রবীনের চিঠি শেষ। রাত অনেক হয়েছে। পাশের ঘরে সুকুমার গভীর ঘুমে। নাক ডাকছে তার। চমরু পোর্টিকোতে কম্বল মুড়ি দিয়ে হয়তো নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমোচ্ছে। বিকাশও শুয়ে পড়ল। একটা হালকা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। পাতলা চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে আর ঘুম আসছে না। অনেকক্ষণ ধরে চোখ বুজে থাকল বিকাশ। তিন জনের তিনটে চিঠি থেকে তার নিজের ঘরোয়া কলকাতার একটা চিত্র এঁকে

তুলতে চেষ্টা করছে। যত চেষ্টা করছে ততই মনে হচ্ছে, না, ঠিক হয় নি। শুধুমাত্র ঘটনা থেকে পুরো মানুষকে ধরা যায় কি ? যায় না। যতদূর মনে হচ্ছে, তনিমাকে যা ভেবেছিল সে ঠিক তা নয়। রবীনকে অপদার্থই মনে হয়েছিল। রবীন কি তাই ! শংকর বড়লোকের ছেলে। তার একটু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য হেলাফেলার স্বভাব হতেই পারে। কিন্তু ওর চিঠিটা পড়ে তো মনে হচ্ছে, ও মোটেই তা নয়। সুমিতা ? সুমিতাকে কিছুতেই আর দশটা মেয়ের সঙ্গে এক করে দেখা যায় না। এতকাল বিকাশ কিন্তু সুমিতার কথা সেভাবে কখনও ভাবেই নি। এও ভাবে নি সুধার মতো একটা মেয়ে দরকার হলে সব কিছু আগ্রাহ্য করতে পারে। ভাবতে ভাবতে বেশ অস্থির হয়ে উঠল বিকাশ। শুয়ে থাকতে ভাল লাগছে না। বিছানা থেকে নেমে টর্চ জেবলে ঘড়ি দেখলে। রাত খুব বাকী নেই, সাড়ে চারটে।

ঘরের অন্ধকারে কিছুক্ষণ পায়চারি করতে করতে এক সময় চেয়ারে বসে চোখ বুজে কি সব ভাবতে শুরু করলে। কোন ভাবনার সাথে কোন ভাবনার যোগ নেই। বিচ্ছিন্নভাবে কেবল কল্পনা। এক সময় মনে এল, যাবে নাকি কলকাতা ! যাবে ?

বাইশ

সুকুমারের খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস। ঘুম ভাঙ্গার পরে বিকাশের ঘরে এসেই সে আঁতকে ওঠে। দেখে, চেয়ারে বসে টেবিলের ওপরে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে বিকাশ। বিকাশকে একটু আলগোছে ঠেলা দিয়ে ডাকলে সুকুমার, বাবু !

ঠিক ঘুম নয়, তন্দ্রার মত লেগেছিল। সুকুমারের সাড়া পেয়ে তাকালে। সুকুমার ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। বিকাশ একটু হেসে উঠে দাঁড়ালে। বললে, ঘুম আসছিল না, তাই উঠে একটু বসেছিলাম।

সুকুমার আর কিছু না বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাইরে ফর্সা হয়ে আসছে। বিকাশ একটা জামা গায়ে দিয়ে বিছানা থেকে চাদরটা টেনে নিয়ে সামনের পর্টিকোর দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। পর্টিকোর সামনে ছোট লন মতো জায়গাটায় চমরু আর সুকুমার দুজনে ফুলের বাগান করেছে। নানা জাতের নানা রঙের মরশুমি ফুল। রোজই চোখে পড়ে। কিন্তু আজ যেন নতুন করে নজরে এল। মনে হল, বাঃ, বেশ তো। কত ফুল ফুটেছে ! কত রকমের। ফুলের পাঁপড়িতে শিশির টলমল করছে। চারদিকে শিশিরের প্রণিপাত। শিশিরে ভিজে আছে

সব। ঘরের শনের চালা পর্যন্ত ভেজা। মনে হয় যেন নীরব বর্ষণে সব নির্মল হয়ে উঠেছে। পূবে সামান্য লালচে আভা দেখা দিয়েছে। সারা পরিবেশের দিকে তাকিয়ে দৃশ্যটা সে ভাষায় আনতে চাইছে, পারছে না। পাখির ডাক কানে আসছে। তক্ষুণি মনে পড়ে 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল / কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।' আশ্চর্য! সরল ভাষাও এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে অনবদ্য, প্রতীকি, অন্তত তার মনে হচ্ছে 'কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল' সে যেন স্পষ্ট অনুভব করছে। তার জীবনে যাবতীয় অফোটা কুসুমকলি সব ফুটে উঠছে। শংকর, সুমিতা আর রবীনের চিঠিতে তার নব বোধোদ্গম ঘটল কি? বিকাশ তার ভাবনার খেই পায় না।

বেলা দশটা নাগাদ অমর এল।
কী রে, অফিস যাস নি যে! শরীর খারাপ?—বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়।
বিকাশ হাসে। বলে, কিছু না। এমনি। ভাল লাগছিল না।
কেন?—অমরের চোখে সব তন্ন তন্ন করে দেখার দৃষ্টি।
বিকাশ বলে, একদিন অফিসে না গিয়ে দেখছি কেমন লাগে।
তা না হয় বুঝলাম! কিন্তু অফিসশুদ্ধ সবাই যে চিন্তা করছে।
তুই তো জেনে গেলি। গিয়ে বলবি।
কি বলবো? একটা কারণ তো বলা চাই!
কেন? আমার ইচ্ছে হয় নি সেটা কোনো কারণ নয়?
আমি বুঝলাম। আর সবাই বুঝবে না। ম্যানেজার বুঝবে না, বড়বাবু বুঝবে না।
তুই বুঝিয়ে বলবি।
ধুর! তুই সাবালক হবি কবে?
নাই বা হলাম। তোদের মধ্যে একজন থাক না নাবালক।
ইয়ার্কি রাখ। কী হয়েছে বল।
বিকাশ বললে, বোস্। বলছি।
অমর বসলে। বিকাশ বলে, এ পর্যন্ত একদিনও কামাই করি নি। ভেবে দেখলাম, একটা দিন অন্তত বাসায় বসে কাটাই। কলকাতার কথা খুব মনে আসছে। বন্ধু-বান্ধবদের চিঠি-পত্র নাড়াচাড়া করছিলাম কাল রাতে। তারপরই মন ছটফট্ করছে।
তা ঘুরে আসতে পারিস একবার।
টাকা?

বছরে একবার বেড়াবার খরচা তো পাবিই।
সবে কনফার্ম হলাম। এখনই দেবে?
সে সব তোকে ভাবতে হবে না, বড়বাবু করে দেবে। তুই এখন তার সুনজরে। ছুটিও পাবি, টাকাও পাবি।
বিকাশ চটে গেল। বললে, আমি তা চাই না।
তুই চটছিস কেন? ওসব বড়বাবুর কৃপা নয়। তোর ন্যায্য পাওনা। আমরা আছি না?
বিকাশ ঠান্ডা মেরে যায়। বলে, তা ঠিক।
ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে পড়ে অমর। বলে, রাতে আসবোখন।
অমর বেরিয়ে যেতে না যেতে দীপেনবাবুর চাকর এসে হাজির। বললে, বড়বাবু ভেজায়া। আপকো তবিয়ৎ ক্যায়সা হ্যায় বাবু?
বিকাশ বিরক্ত হয়। গম্ভীর মুখে বলে, ভাল আছি। বলবে, কাল অফিসে যাবো।
বড়বাবুর লোক চলে গেল। বিকাশের মনে অস্বস্তি লাগে। ভাবে, দীপেনবাবুকে একবার বললে কেমন হয়, 'আপনি হেনার চিঠি আমাকে দেন নি কেন?' কিন্তু এখন তা বলে কি হবে! দীপেনবাবু যদি পালটা চ্যালেঞ্জ করে বসে, 'আপনার চিঠি দেবো না কেন? কে বলেছে এসব আপনাকে?' বিকাশ জবাব দিতে পারবে না। জবাব দিতে গেলে যা বলতে হবে তা বলা যায় না। বলা যায় না বড় চা-ঘরবাবু বলেছে অমরকে। সে এক বিশ্রী ব্যাপার। তবু একটা প্রতিবাদ তো দরকার। নইলে দীপেনবাবু সম্পর্কে তার বিরূপ মন ঠিক হবে না। কিন্তু দীপেনবাবু যদি বিরূপ হয় তা হলে এখানে চাকরি করাই দায় হবে। এত দিনে এসব তার বোঝা হয়ে গেছে।

সন্ধ্যার মুখে গুদামবাবু ধীরেন সোম আর মাস্টারবাবু পুলক নাথ একসঙ্গে এল বিকাশের খবর নিতে। তাদের দেখে খুশি হল বিকাশ। বললে, কিছু না। ভাল লাগছিল না, তাই একটা দিন বাসায় কাটিয়ে দিলাম।
পুলকবাবু বললে, ভাল করছেন। খালি কাম করলেই হয় নাকি! বিশ্রাম লাগে না?
ধীরেনবাবু হাসে। মাস্টার পুলকবাবুর কথায় তার সায় আছে কিনা বোঝা যায় না।
বিকাশ গুদামবাবুকে বলে, আপনি তো কিছু করছেন না। চাল-ডাল-গুড় সব ইঁদুরে আর আরশোলায় শেষ কর দেবে যে!

মাস্টার অবাক হয়ে তাকায় বিকাশ আর ধীরেনবাবুর মুখের দিকে। বলে, কী ব্যাপার ?
কিছু না, কিছু না।—ধীরেনবাবু বলে, আচার্য ঠাকুররা দুর্গা প্রতিমা গড়তে এসে থেকেছিল না বিকাশবাবুর বাসায়, তখন তাদের র‍্যাশন দিয়েছিলাম। তার যা রয়ে গেছে সে সবের কথা বলছে বিকাশবাবু।
ও হরি ! আপনে দেখছি বড় অবুঝ। আপনে নিজে খরচ করেন !—বলে হাসে পুলকবাবু।
ধীরেনবাবুও বলে, ওসব আর ফেরত দেয় নাকি কেউ ?
বিকাশ বলে, আমার তো ওসব দরকার হবে না।
মাস্টার বলে, হবে না কেন, হবে। আপনের ঠাকুররে কইবেন লাগাইতে, তইলেই হইবে।
সেটা কি ঠিক হবে ?—বিকাশ দ্বিধার স্বর তোলে।
মাস্টার বলে, ঠিক আছে। আমারে দিবেন ?
গুদামবাবু বলে, সেই ভাল, তুমি নিয়ে যাও মাস্টার।
আইচ্ছা। কাইলই লোক পাঠাইমু বিকাশবাবু। দিয়া দিবেন।—বেশ আগ্রহ নিয়ে বলে মাস্টার।
চা-বাগানে কলকাতার র‍্যাশন ব্যবস্থার মতো একটা ব্যবস্থা আছে। শ্রমিক, সর্দার-চৌকিদার আর বাবুরা বরাদ্দ মতো চাল-ডাল-আটা-ময়দা তেল-নুন-গুড় সব পায় সস্তা দামে। গুদামবাবু হল সে সবের কর্তা। সে ইচ্ছে করলে তার যা খুশি তাই করতে পারে গুদামের জিনিসপত্র নিয়ে। এসবের তবে হিসেব-নিকেশ নেই কিছু ? খুব অবাক হয় বিকাশ। অবাক হয় মাস্টারের লোভ দেখেও। মাস্টার মানে, চা-বাগানের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। বাবুদের সমপর্যায়ে মাইনে, বাসা, চাকর—সব সুবিধা পায় সে। তবু কিছু ফোকটে পাওয়ার লোভ তার কী প্রকট ! কী শেখায় শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের এই শিক্ষক ? কী শেখায় ? মন তোলপাড় করে জিজ্ঞাসাটা।
চা খেয়ে বেরিয়ে যায় গুদামবাবু আর মাস্টারবাবু। বিকাশের কেমন বিষাদ লাগে। ঐ চাল-ডাল-তেল-নুন নিয়ে একটা নীতিবোধ তাকে টোকা মারে ভেতরে। ভাল লাগে না। মাস্টারবাবু নিয়ে যাবে ? তা নিক। কিন্তু এসব থেকে যে সত্যটা বেরিয়ে আসছে তা বড় যন্ত্রণার। সে নিজেও এখন চা-বাগানের একজন বাবু। তাই হয়তো সুযোগ-মওকা হাতাবার বুদ্ধিটা ভেতরে ভেতরে তাকে কামড়ায়।
এসব ভাবতে ভাবতে গুম হয়ে বসে আছে, তখন অর্জুন সর্দার এল। মাথায় গরম ফেট্টি বাঁধা। গায়ে কম্বল। তাকে দেখে কিছুটা সহজ হয়ে এল

বিকাশ। মাঝখানে বেশ কিছু দিন অর্জুন সর্দার আসে নি। অফিসেও দেখা হয় নি। জিজ্ঞেস করলে, সর্দারজী গেছিলে নাকি কোথাও?
গেড় লাগি বাবু।—নির্দিষ্ট বেঞ্চে বসতে বসতে বলে সর্দার, কাঁহা যায়েগা? তবিয়ৎ ঠিক নেই লাগতা। শীত আ গিয়া না, আভি কর্মতি বাহার হোনা চাহিয়ে। জারা লাগ যায়েগা। আপ ক্যায়সা হ্যায় বাবু?
ভাল আছি।—বিকাশ বুঝলে, তার অফিসে না যাওয়ার কথাটা সর্দারও জানে। তাই প্রশ্ন করলে, কেন?
নেহি। অ্যায়সা হি পুছতা। শুনা আপ আজ অফিস নেহি গিয়া। সমঝা ক্যায়া, ব্যামার-উমার হুয়া কি নেহি—
আরে না না।—হাসে বিকাশ। বলে, একদিন একটু বাসায় থেকে দেখছি কেমন লাগে।
সর্দারও হাসে। বলে, আভি অ্যায়সা মালুম হোতা। পিছে বোলেগা বাসামে ঠিক নেহি লাগতা, আপিস হি আচ্ছি হ্যায়। হাঁ!
বিকাশেরও হাসি পায়। মনে মনে বলে, তেমন দিন যেন না হয় মা তারা।

সর্দার জিজ্ঞেস করে, গুদামবাবু আউর মাস্টরবাবু আয়াথা!
হ্যাঁ, একটু আগে।
মাস্টরবাবু ঠিক আদমি নেহি বাবু।
বিকাশ জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকায় সর্দারের দিকে। সর্দার বলে, আপকো ইয়াদ হ্যায়, কালী পুজাকি বাদ ম্যাজিকওয়ালা আয়া থা। এক রাত ম্যাজিক দেখায়া গিয়া। মাস্টারবাবুকো হাম পুছা কি, ম্যাজিকওয়ালা জো খেল্ দেখা গিয়া—রবীন্দরনাথ, আপকো খেয়াল হোগা, থোড়া সমঝ দেনা, উ খেলকা মজা কাঁহা! তো মাস্টরবাবু বোলা, উ খেল্ বাগানকো ওয়াস্তে নেহি। আপ বোলো, উ বাত ঠিক আউর বেঠিক?
কত দিন আর হবে! মাস খানেক। কালী পুজার পরে একদিন ম্যাজিক শো হয়েছিল বাগানে। রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়ে একটা ম্যাজিক দেখিয়েছিল। ম্যাজিকটা মামুলি, কিন্তু যেভাবে দেখালে সেই কায়দাটা খুব ভাল লেগেছিল বিকাশের। ম্যাজিশিয়ান ভদ্রলোকের প্রদর্শন ভারি সুন্দর এবং নতুন ধরনের। তবে সর্দার বা অন্যান্য অনেকে সে ম্যাজিকে মজা নাও পেতে পারে। খুবই স্বাভাবিক। মাস্টারবাবু হয়তো তাই বলেছে। সে কথা সর্দারের ভাল লাগবে কেন? বিকাশ বোঝায় সর্দারকে, মাস্টারবাবু হয়তো খারাপ ভেবে বলে নি। সব জিনিস কি সবাই বোঝে?

সর্দার বলে, সো ঠিক বাত। লেকিন মাস্টরবাবু আচ্ছি আদমি নেহি বাবু। পড়ালিখা ভি ঠিক জানতা হামারা মালুম নেহি হোতা।
বিকাশও শুনেছে পুলকবাবুর লেখাপড়া ম্যাট্রিকও নয়. ম্যাট্রিক ফেল। ভাগ্য অন্বেষণে কত লোক যে চা-বাগানে আসে। পুলকবাবুও একদিন অপরিচয় নিয়েই এসেছিল। সত্যেনবাবুর ছেলেমেয়েদের পড়াতো। তারই কাছারিঘরে থাকতো। এ বাগানে লেখাপড়ার পাট নেই। যুগের দাবী অনুযায়ী তখন অন্ততঃ একটা লোক দেখানো প্রাথমিক বিদ্যালয় সব চা-বাগানে প্রতিষ্ঠা দরকার। আশপাশের অনেক বাগানেই হয়ে গেছে। পুলকবাবুকে দায়িত্ব দেওয়া হল। প্রথমে ক্লাশ শুরু হল পুজো-ঘরে। তারপর স্কুলঘর হল, সাজসরঞ্জাম হল। পুলকবাবুর বাসা হল, বিয়ে হল, এখন তিন সন্তানের জনক। ধীরে ধীরে থিতিয়ে বসে এখন চা-বাগানের বাবুশ্রেণীভুক্ত। তার স্কুলের ছাত্রছাত্রী অবশ্য বিশেষ বাড়ে নি। শুরু করেছিল পঞ্চাশ-ষাটজন নিয়ে সেই কবে। আর এখন সত্তর-আশিজন। ব্যস!
সর্দারের দিকে তাকিয়ে বলে বিকাশ, তা এতদিন চালিয়ে আসছে, তখন ওসব ভেবে কি লাভ সর্দার!
হাঁ!—উঠে এসে টেবিলের ওপরের লণ্ঠনের শিখাটা একটু কমিয়ে দিয়ে সর্দার বলে, চিম্‌নি মে কালি ধর যায়েগা। হাম চলে বাবু। রাম রাম।
অর্জুন সর্দার বেরিয়ে গেল। কিন্তু সেই ম্যাজিকের কথাটা ঘুরেফিরে মনে আসছে। ম্যাজিশিয়ান ভদ্রলোক আর তার সাকরেদ এক কিশোর তার কাছারিঘরেই ঠাঁই নিয়েছিল তাদের লটবহর নিয়ে। খুব একটা আলাপ-পরিচয় হয় নি। কিন্তু মনে হয়েছে বেশ চৌকশ মানুষ। ম্যাজিক শো শেষ করে পরের দিন ভোর বেলাই তারা চলে গেছে। দু'জনের দুখানা সাইকেল বাহন। দুই সাইকেলের ক্যারিয়ারে মাঝারি সাইজের দুটো টিনের বাক্সে তাদের সব। যখন তারা গেল, বিকাশের মনে হচ্ছিল যেন যাযাবর। এভাবেই তারা এ চা-বাগান ও চা-বাগানে ঘুরে ঘুরে ম্যাজিক দেখিয়ে রোজগার করে। একেবারে অনির্দেশ্য সব। ভাবতে অদ্ভুত লাগে।
ভদ্রলোক ম্যাজিক দেখায় ভাল। সুপরিচিত পুরোনো খেলাগুলোকে নিজের উদ্ভাবন বুদ্ধি দিয়ে নতুনত্বের ছোঁয়া লাগিয়ে আকর্ষণীয় করে তোলার কুশলতা আছে তার। 'রবীন্দ্রনাথ' খেলাটি তো বিকাশকে বেশ মুগ্ধই করেছিল। অথচ তেমন একটা তাজ্জবের কিছু না। তিনটে ছোট তেপায়ার ওপরে দুমুখ খোলা টিনের মোটা চোঙা তিনটে

বসানো। চোঙাগুলোর প্রথমটার গায়ে লেখা 'গ্রাম'। দ্বিতীয়টির গায়ে লেখা 'শহর'। তৃতীয়টির গায়ে লেখা 'চা-বাগান'। তিনটে চোঙাই দর্শকদের ভাল করে দেখালে ম্যাজিশিয়ান, একেবারে ফাঁকা। এবার তেপায়া তিনটের ওপরে চোঙা তিনটে রেখে ম্যাজিশিয়ান তার জাদু-টেবিল থেকে পোস্টকার্ড সাইজের তিনখানা রবীন্দ্রনাথের ছবি হাতে নিয়ে দর্শকদের দেখিয়ে তিনটে চোঙাতে একটা করে ছবি রেখে দিয়ে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে এক বক্তৃতা করলে কিছুক্ষণ। তার সার কথা হল, আমরা বাঙ্গালীরা বিশ্বাস করি রবীন্দ্রনাথের আসন আজ সর্বত্র। গ্রাম, শহর বা চা-বাগান যেখানেই হোক রবীন্দ্রনাথ আছেনই। কিন্তু ম্যাজিশিয়ানের সন্দেহ বিশ্বাসটা আংশিক সত্য, পুরোপুরি নয়। ম্যাজিশিয়ান একজন সর্দারকে স্টেজে ডেকে নিয়ে এক এক করে চোঙা তিনটেতে হাত ঢুকিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছবি তুলে দেখাতে বললে। আগে গ্রাম। গ্রাম লেখা চোঙা থেকে ছবি তুলে দেখালে সর্দার। ঠিক আছে, ছবি যেমন ছিল তেমনি রেখে দিতে বললে ম্যাজিশিয়ান। তারপর শহর। সেখান থেকেও ছবি তুলে দেখালে সর্দার। এবার চা-বাগানে হাত ঢুকিয়ে শূন্য হাত তুলে আনলে। ম্যাজিশিয়ান আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে, ছবি? রবীন্দ্রনাথ? নেই! সর্দার হেসে বললে, নেই। ম্যাজি-শিয়ান 'চা-বাগান' চোঙাটি উলটে পালটে দেখে হতাশ ভঙ্গিতে বললে, নাঃ! চা-বাগানে রবীন্দ্রনাথ নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না। আর কেউ আসুন না, দেখুন না, দেখুন একবার। মাস্টার পুলকবাবু উঠে গেল স্টেজে। 'চা-বাগান' চোঙায় হাত ঢুকিয়ে দেখলে চোঙা শূন্য। 'শহর' আর 'গ্রাম' চোঙাতে ছবি ঠিক আছে। এবার ম্যাজিশিয়ান বিকাশকে ডাকলে। বিকাশ হাসতে হাসতে উঠে গিয়ে হাত ঢোকালে 'গ্রাম' চোঙায়। রবীন্দ্রনাথের ছবি তুলে দিলে ম্যাজিশিয়ানের হাতে। 'শহর' চোঙাতেও ছবি পেয়ে দিলে ম্যাজিশিয়ানকে। এবার বেশ কৌতুকের মন নিয়েই হাত ঢোকালে 'চা-বাগান' চোঙাতে। রবীন্দ্রনাথ আছে। বিকাশের হাতে রবীন্দ্রনাথের ছবি। ম্যাজিশিয়ান ফের এক ছোট বক্তৃতা দিলে। তার বক্তব্য হল, ভাগ্যিস বিকাশ এ চা-বাগানে আছে। নইলে রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যেত না। বিকাশ কলকাতার মানুষ, আবার কবিও। হয়তো সে জন্যেই রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া গেল। ভদ্রলোকের ম্যাজিক দেখানোর কায়দা, বলার ভঙ্গি বেশ মনে ধরার মতো। বিকাশের খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু অর্জুন সর্দারের কথার পরে এখন মনে হচ্ছে, হয়তো সে ম্যাজিকের মজাটা সত্যি অনেকে বোঝে নি। মির্জাসাহেব অবশ্য বলেছিল, তার আর তার বিবির

'রবীন্দ্রনাথ' খেলাটা বেশ ইঙ্গিতের মনে হয়েছে।

এসব সাত-পাঁচ ভাবনায় যখন বিকাশ কিছুটা অন্যমনা তখন অমর, মির্জা আর ডাক্তারবাবু এল একসঙ্গে।

বিকাশ লজ্জা পেল। একদিন অফিসে না যাওয়ার পরিণাম যে সারাদিন এভাবে দেখতে হবে, কল্পনাও করে নি।

মির্জা বললে, ডাক্তার লইয়া আইলাম। অখন করেন কি হইছে আপনের।

সবাই হাসছে। বিকাশ সকলের হাসি দেখে নিজেও না হেসে পারে না। একটা জিনিস এখন বার বার মন ছুঁয়ে যাচ্ছে তার। এই মানুষগুলো যে যেমনই হোক, একটা সহজ সহযোগিতার মন আছে সবারই। একটা সাধারণ মমতা এদের স্বভাবগত যেন। এসব স্পষ্ট হচ্ছে, বিকাশের অনুভবে এসব ফল্গু স্রোতের মত বয়ে যেতে চাইছে।

সবাইকে বসতে বললে বিকাশ। সুকুমারকে ডেকে চায়ের কথা বললে। কিন্তু তার লজ্জাটা দূর হতে চায় না। কথা খুঁজে পায় না। তার জন্যে যে এরা কেউ কিছু মনে করছে তাও বোঝা যাচ্ছে না।

অমর বললে, দীপেনবাবু বলেছে, ভাল না লাগলে কালও বাসায় থাকতে পারিস।

মির্জা বললে, ডাক্তার লইয়া আইলাম, আগে তাইন রোগী দেইখ্যা কউক কি বিধান।

ভবতোষবাবু হেসে বলে, হোম সিকনেস নয়তো বিকাশবাবু! যান না, ঘুরে আসুন একবার। মা-বাবা বন্ধুবান্ধবদের দেখে আসুন।

অমর বলে, ওসব কিছু নয়। ও ঐরকম। খেয়ালের ব্যাপার। ঠিক কিনা বল বিকাশ?

কি বলবে ভেবে পায় না বিকাশ। কিন্তু সব মিলিয়ে তার মন বার বার যেন হারিয়ে যাচ্ছে।

চা নিয়ে এল সুকুমার। সবাই গল্প করে চা খেয়ে উঠল। যাবার সময় মির্জা বললে, বড়বাবুর কথা শুইনবেন নি কাইল?

বিকাশ মাথা দুলিয়ে বললে, দূর। কাল যাবো অফিসে।

মনে মনে বললে, আর না। এভাবে আর কখনও সে অফিস না গিয়ে বাসায় বসে থাকবে না। অফিস যদি কখনো কামাই করে, কাউকে কিছু না জানিয়ে সারা দিনের মনে বেরিয়ে পড়বে। সেই যে মেডলি চা-বাগান, যাত্রা পালা শুনতে ট্রাকে করে গেছিল পুজার পরে, সেখানে ঘুরে আসবে। সেখানে কয়েকজন অল্পবয়েসী বাবুর সঙ্গে বেশ আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। এখানে যেদিন ম্যাজিক শো হয়, তারাও

সবাই ট্রাকে করেই এসেছিল। কয়েকজন তার বাসাতেও এসেছিল। মাঝে-সাজে এভাবে অনেকে একা বা ছেলেমেয়ে বৌ নিয়ে বা দল বেঁধে আসে বেড়াতে। কোনও উপলক্ষ থাকলে তো কথাই সেই। উপলক্ষ দেখা দেয় পুজোর মাসেই বেশি। পুজো থেকে কালী পুজোর পরও কিছু দিন প্রায় সব বাগানেই হয় যাত্রা, নয় নাটক, না হয় তো ম্যাজিক, একটা না একটা লেগেই থাকে। সারা বছরে চা-বাগানের জীবনে পুজোর মাসটাই আনন্দের মরশুম।

সবাই চলে যাবার পরে খেতে বসে সুকুমারের মুখে শুনলে বিকাশ জঙ্গল থেকে হাতি নেমেছে এদিকে। হাতির পাল। প্রতিবছরই এ সময়ে পাহাড় থেকে নেমে আসে সমতলে। ধান ক্ষেতে নেমে শেষ করে সব। তাদের কেউ ঘাটায় না। চটে গেলে হাতি নাকি ভয়ঙ্কর। তাই নিরাপদে তাড়াবার চেষ্টা করে। দু'চার দিন কিছু ক্ষয়ক্ষতি করে তারা অন্য দিকে পাড়ি দেয়। বুনো হাতির এই স্বভাব। খেতে খেতে সুকুমারকে জিজ্ঞেস করলে, কোথায় হাতি নেমেছে?
শুইনলাম বালুরবন্দ-মেডলির কাছত্। কাইল ভোরে গাড়ির লাইনে খাড়া আছিল্ হাতির দল। সরে না। ধর্মনগর থাকি করিমগঞ্জ যাওনের গাড়ি সকালে আর ছাড়ে নাই। দুপইরে হাতিরা গেল্ তারপরত্ লাইন ক্লিয়ার।
বিকাশ বলে, বাঘও তো আছে শুনেছি।
হয়। তারা আছইন বারো মাস, হাতিরা খালি এই সময়। —সুকুমার বলে, জঙ্গলে জানোয়ারের অভাব আছে নাকি?
খেয়ে উঠে বিকাশ যখন শুতে যাচ্ছে, দেখলে সাড়ে এগারোটা হয়ে গেছে। সুকুমারকে ডেকে বললে, কাল সকালে আমাকে ডেকে তুলে দেবেন।

তেইশ

সন্ধ্যেবেলা বাসায় ফিরে অমর শুনলে দীপেনবাবুর স্ত্রী চারুবালা এসেছিল। কথাটা শুনে একটা অনুমান এসেই গেল। তাই অমর খুব অবাক হয় নি। মালার সঙ্গে দুপুরবেলা গালগল্প করতে আসা, তাও অস্বাভাবিক কিছু না। অস্বাভাবিক কেবল এইটুকু যে, চারুবালা নিজে যেচে এখানে কারো বাসায় যায় অমর আজ পর্যন্ত শোনে নি।
মালা বললে, আমি তো প্রথমে বেশ অস্বস্তিতে পড়েছিলাম। এতকাল

আছি কখনো আসে না, তার বাসায় যেতেও বলে না। হঠাৎ কী এমন ব্যাপার! ভাবলাম নেমন্তন্ন-টন্ন হবে বা। পরে বুঝলাম তা নয়। এসেছিল বিকাশবাবুর কথা জানতে।
কি কথা?
এই, তার কে আছে না আছে, কে কি করে না করে এইসব।
এসব কেন জানতে চায়?
তাও বলেছে। কিন্তু আর কাউকে জানাতে বারণ করেছে।
তুমি তো সে বারণ মানলে না।
কেন? আমি কাকে বলতে গেছি?
আমি কি কেউ নই? এই যে আমাকে বললে!
ওঃ! আমি কি তাই বলেছি? তোমাকে বলব না তা চারুদেবীও ভাববে না।
বিকাশের কথা তুমি কি বললে?
কী বলবো? আমি কি জানি ভালো? যা জানি তাই বললাম।
কি জানো?
তোমার কাছে যা শুনেছি—
বিকাশ যে কবি, বলেছ?
তা জানে।
বিকাশের কয়েকজন মেয়ে বন্ধু আছে কলকাতায়।
তাই নাকি! আমাকে তুমি বলো নি।
বিকাশ তার বোনেদের বিয়ে না হতে নিজের বিয়ের কথা ভাববে না। নিজেদের বাড়ি না হতে বিয়ে করবে না। বিয়ে করলে মাকে নিয়ে আসবে নিজের কাছে।
আমি ওসব জানবো কি করে? আমি যে বলে দিলাম বিকাশবাবুর বাবাকে চিঠি দিতে।
তা দিক। কিছু আসবে-যাবে না।

সন্ধ্যার পরে অফিসে এসেই বিকাশকে বলেছিল অমর, 'কথা আছে। অফিস থেকে অন্য সবাই চলে গেলে বলব। থাকবি।' একে একে দীপেন-বাবু, সত্যেনবাবু, অরুণবাবু বেরিয়ে যাবার পরে বিকাশ বললে, বল, কি কথা!
অমর বললে, দুপুরে বড়বাবুর বৌ গেছিল মালার কাছে তোর খবর জানতে।
বিকাশ অবাক হয়। বলে, আমার খবর! কী খবর?

তুই কেমন ছেলে। তোর কে আছে, না আছে। তোদের পারিবারিক অবস্থা আর্থিক অবস্থা এসব তো ওদের জানা দরকার। —বলে, বিকাশের পিঠে টোকা মেরে উঠে দাঁড়ায় অমর।

উঠলি কেন? বোস্। —বিকাশের মেজাজ বিগড়ে যায়।

অমর বলে, দশটা বেজে গেছে। শীতের রাত। বাইরে তাকিয়ে দ্যাখ কী ভীষণ কুয়াশা পড়েছে। কিছু নজরে আসে না। আলো পর্যন্ত না।

অমরের কথাগুলো বিকাশের মনে দ্ব্যর্থক হয়ে ওঠে। সত্যি, তার নিজের চারদিকে ঘন কুয়াশা জমে উঠছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না। দীপেনবাবুর স্ত্রী পর্যন্ত তার খোঁজ-খবর নিচ্ছে সে তো ভাল কথা না। বিকাশ বলে, মালা কী বলেছে?

কী বলবে? ও তো তোর কিছুই জানে না। বলেছে তোর বাবাকে চিঠি লিখতে। ভালই হল, তোর ভাগ্য খুলে যাচ্ছে। —বলে, খুব হাসলে অমর।

তুই হাসছিস? আমার পিত্ত জ্বলে যাচ্ছে। এখানে বোধ হয় আমার থাকা চলবে না রে অমর। —বেশ কিছুটা নিস্তেজ লাগে বিকাশের স্বর।

দূর! তুই একটা হাবা চণ্ডীদাস। অতো ভাবার কী আছে। দ্যাখ না কী হয়। তুই তোর মতো থাক। কিছু হবে না দেখবি। আমি মালাকে বলেছি, তোর অনেক মেয়ে বন্ধু কলকাতায়। তোর বোনেদের বিয়ে না হতে এখন তোর বিয়ের কথা তোদের বাড়িতে কেউ তুলবে না। তারপরও যদি ওরা না পেছোয় তো তোর পছন্দ-অপছন্দের মুখ্যম ওষুধটা তোর হাতেই থেকে যাচ্ছে। ভাববার কী আছে!

মালা যাবে দীপেনবাবুর স্ত্রীর কাছে?

দরকার হলে নিশ্চয় যাবে।

ওসব বলবে গিয়ে?

তোর আপত্তি আছে?

না, সবই তো সত্যি। আপত্তি হবে কেন?

একটু স্বস্তি লাগে বিকাশের মনে। কিন্তু ব্যাপারটা কী রকম বিশ্রী মনে হয়। এ ব্যাপারটা জানার পর থেকে দীপেনবাবুকে এড়িয়ে যাচ্ছে বিকাশ। পারতপক্ষে তার ধার ঘেঁষে না। মনে হয়, লোকটা বাইরে যত ভদ্র অমায়িক ভেতরে ততই বিপরীত। নয়তো হেনার চিঠিটা সে তাকে দেবে না কেন? আসলে, বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, ভেবেছিল হেনার সঙ্গে তার একটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। পত্রটা বোধ হয় প্রেমপত্র। কি লিখেছিল হেনা কে জানে! কিন্তু প্রেমের উপাখ্যান যে হতেই পারে

না বিকাশ তা জানে।
দুজনে বেরিয়ে এল অফিস থেকে।

পরের দিন সকালে অফিসে এসেই ছুটির জন্যে একটা দরখাস্ত লিখে ম্যানেজারের হাতেই দিলে বিকাশ। ম্যানেজার মেহরা দরখাস্তে চোখ বুলিয়ে বললে, কলকাতা যাবেন? এ মাসে?
বিকাশ বললে, যত তাড়াতাড়ি হয়। কলকাতাই যাবো।
ঠিক আছে, দেখছি। —বলে মেহ্‌রা দরখাস্তটা রাখলে।
বিকাশ বেরিয়ে এল মেহরার ঘর থেকে। অফিসের সবাই লক্ষ্য করেছে বিকাশ ম্যানেজারের ঘরে ঢুকলে, বেরোলে। কিন্তু কেন, তা-ই কৌতূহল। অরুণবাবু জিজ্ঞেস করলে, সাতসকালে বড়সাহেবের ঘরে, কী ব্যাপার?
বিকাশ মুখে একটু হাসি টেনে বলে, ছুটির দরখাস্ত দিয়ে এলাম।
ছুটি? কেন, বেড়াতে যাবেন?
না, বেড়াতে নয়। কলকাতা—
ঠিক! ভাল কথা। ম্যানেজার কি বললে?
কিছু বলে নি। দরখাস্ত রেখে দিয়েছে।
ঐ হল। কবে যাচ্ছেন?
যে দিন থেকে ছুটি মঞ্জুর হবে।
খুব ভাল। তৈরি হতে থাকুন।
তৈরির আর কী আছে!
এবার অরুণবাবু অবাক হয়ে তাকায়। বলে, বলেন কি? বাসা, রাঁধুনী, ঘরের জিনিসপত্র।
ওঃ!—বিকাশ হেসে বলে, সুকুমার আর চমরু তো থাকবে।
পাগল! চাকর-বাকরের হাতে সব দিয়ে ছুটিতে যাবেন?—অরুণবাবু ঘোর আপত্তির স্বর তোলে।
অমর আছে, আপনারা আছেন। ক'দিন বা! একমাস তো দেখতে না দেখতে শেষ হবে।
তা ঠিক। তবু! যাক গে, আপনার রাঁধুনী অবশ্য ভাল মানুষ, বিশ্বাসী। তা তাকে বলেছেন তো?
না। আগে ছুটি পেয়ে নি!
ওদের কথাবার্তা অফিসের সকলেরই কানে যাচ্ছে। অমর এগিয়ে এল। বললে, হঠাৎ ছুটি চেয়ে বসলি?
একটু কলকাতা ঘুরে আসা দরকার মনে হচ্ছে।

হেরম্ববাবু এগিয়ে এসে বললে, যদি যায়েন, যাইবার আগৎ আমারে কইবেন। কইলকাতা থাকি একটা জিনিস আনতে দিমু।
বিকাশ হেসে বলে, নিশ্চয়।

রাতে যখন সাতটায় অফিসে এল বিকাশ, দেখলে দীপেনবাবু তার আগেই এসে গেছে। অমর, সত্যেনবাবু, অরুণবাবু তখনও আসে নি। দীপেনবাবু তার ঘরে ডাকলে বিকাশকে। বিকাশ জানে কোনও কাজে ডাকছে না, তার কলকাতা যাবার ব্যাপারটা হয়তো জানতে চাইবে। তাই বেশ একটু শক্ত মনেই দীপেনবাবুর ঘরে ঢুকলে।
হাসি হাসি মুখ করে বিকাশকে বলে দীপেনবাবু, এই যে, আপনার ছুটি স্যাঙসান্‌ড্‌। ডিসেম্বরের পনেরো তারিখ থেকে জানুয়ারীর তেরো তারিখ পর্যন্ত ত্রিশ দিন। যাতায়াত খরচাটা—প্লেনে যাবেন?
বিকাশ বলে, সে তো অনেক টাকা!
ট্রেনে সময় অনেক, তিন দিন। যাক্‌ গে, যেভাবে খুশি যাবেন। প্লেনের খরচাই পাবেন। এবার তৈরি হতে থাকুন।—বলে, বেশ খুশি মুখেই বিকাশের দিকে তাকালে দীপেনবাবু।
দীপেনবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখে মির্জা বসে আছে। তাকে দেখেই বলে, আপনে নাকি ছুটি নিছেন? কইলকাতা যাইবেন!
আপনি শুনলেন কার কাছে?
বিকালে কামজারিৎ ছোট হাজিরাবাবু কইল। জিগাইলাম অমর-বাবুরে। কইল, হঃ, ছুটি চাইছেন। যদি যায়েন আমার কিন্তু একটা অর্ডার থাকব।
সকালে হেরম্ববাবু বলেছে কলকাতা গেলে তার জন্যে কি জিনিস আনতে হবে। এখন মির্জা বলছ তার অর্ডার আছে। বেশ মজাদার মনে হয় এসব। বলে, আমাকে অর্ডার সাপ্লাইয়ার ভাবছেন নাকি?
ঐ হইল। দুইখান বই আনতে কইমু—যদি পারেন।
কি বই?
একখান মাইকেল সমগ্র, আর একখান বনৌষধি।
মাইকেল বুঝতে পারছি, কিন্তু বনৌষধি? সে তো কবরেজদের ব্যাপার।
হঃ! শুনছি বইখান কাজর। আমার বিবির দরকার। হরুতার অসুখ-বিসুখে গাছপালা শিকড়-বাকড়ের রস-বড়ি খুব কাম দেয়।
বিকাশ হাসলে। বললে, যদি যাই লিখে-টিকে দেবেন। পারলে নিশ্চয় নিয়ে আসব।

দিন কয়েক পরে বিকেলে বড় চা-ঘরবাবু জনার্দনবাবু চা-ঘরের একজন শ্রমিককে দিয়ে চিরকুট পাঠালে বিকাশকে। লিখেছে, 'একবার সময় করে আসবে বিকাশবাবু ?' বিকাশ ভাবলে, বড় চা-ঘরবাবুরও কলকাতা থেকে একটা কিছু আনার অর্ডার হবে হয়তো। সে যাবে ছুটিতে সকলের সঙ্গে দেখা করতে, না বাবুদের সব ফরমাস খাটতে ? এ বেশ রগুড়ে কাণ্ড তো! যাক্ গে, কাউকেই কথা দেবে না। সম্ভব হলে যে যা আনতে বলবে নিয়ে আসবে, নয়তো না।
ইতিমধ্যে ছোট সাহেব মিঃ মালিক তাকে ডেকে বলে দিয়েছে, 'দেশে যাচ্ছেন, দেখবেন, দেরি না হয়। জানুয়ারীর শেষে কোম্পানীর ডাইরেক্টর আসবে বাগান দেখতে।' বড় সাহেব কিছু বলে নি। কিন্তু বলতে আর কতক্ষণ! দু'-চারদিনের মধ্যে তার কাছ থেকেও কিছু নির্দেশ পেয়ে যাবে হয়তো। তারপরে দীপেনবাবু। সেও কিছু একটা বলবে নিশ্চয়।
এসব ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যের সময় বাসায় না গিয়ে চা-ঘরেই চলে এল অমর। বড় চা-ঘরবাবু বেলা দুটো থেকে রাত দশটা অবধি চা-ঘরে থাকে। রাত দশটা থেকে ছোট চা-ঘরবাবুর ডিউটি সকাল ছয়টা পর্যন্ত। সকাল ছয়টায় বড় চা-ঘরবাবু চা-ঘরে আসে। একটায় বাসায় ফেরে। ছোট চা-ঘরবাবু তখন এসে যায়। রাত সাতটা পর্যন্ত দু'জনেই থাকে। মাসের প্রথম পনেরো দিন রাতের ডিউটি বড় চা-ঘরবাবুর আর শেষের পনেরো দিন ছোট চা-ঘরবাবুর। মরশুমের সময় এভাবে দিন-রাত চা তৈরির কাজ চলে। চা-ঘরের শ্রমিক নারী-পুরুষের অবশ্য তিন দফায় কাজ। একদল সকাল ছয়টা থেকে বেলা দুটো, আর একদল বেলা দুটো থেকে রাত দশটা। অন্য দল রাত দশটা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত কাজ করে। রাতের দফায় মেয়েরা কাজ করে না। বিকাশ এসব জেনেছে। কিন্তু আশ্চর্য ! এত দিনে চা-ঘর, মানে চা তৈরির কারখানা —কলঘরটা দেখা হয়ে ওঠে নি তার। তত খেয়ালও হয় নি।
অফিস থেকে চা-ঘর পাঁচ মিনিটের পথ। যত এগুচ্ছে তত কারখানার শব্দ স্পষ্ট হচ্ছে। একটা ঘড়র ঘড়র আওয়াজ—ছন্দপতন নেই, টানা কানে ফুটছে। তা ভাল না লাগলেও, যত চা-ঘরের কাছাকাছি হচ্ছে তত চায়ের একটা সুঘ্রাণ লাগছে। এটা সত্যি মনমাতানো ঘ্রাণ। কৌতূহলেরও। এমন ঘ্রাণ উঠছে কি করে ?
চা-ঘরের দরজায় আসতেই চৌকিদার দু'হাত জোড় করে নমস্কার করে বললে, গোড় লাগি বাবু।
মাথা একটু ঝুঁকিয়ে প্রতিনমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞেস করে বিকাশ,

বড় চা-ঘরবাবু হ্যায় ?
হাঁ বাবু, ধুপঘরমে।
ধুপঘর কাঁহা ?
চৌকিদার বললে, চলিয়ে।
এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চৌকিদারের পিছু পিছু যাচ্ছিল বিকাশ। দেখছিল, চা-ঘরের লাগোয়া উচু বেশ লম্বা বড় মাপের একটা শেড। এ মাথা ও মাথা লম্বালম্বি হাত তিনেক চওড়া তারের জালের বেড। ডাইনে-বাঁয়ে দুলাইনে তাকের মতো পর পর ওপরের দিকে উঠেছে পাঁচ-ছয়টা। মাঝখানে হাত দুয়েক ফাঁক। ওপাশে এপাশে সিঁড়ি। জনা দশ-বারো লোক টিনের জালের বেড়ে বাগিচা থেকে তোলা সারা দিনের কাঁচা সবুজ চা-পাতা বড় বড় বাঁশের ঝুড়িতে করে এনে ঢেলে বিছিয়ে দিচ্ছে। নিচের ধাপ থেকে শুরু করে পর পর সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। পাশের ব্যালকনি মতো দাঁড়াবার জায়গায় প্রত্যেক ধাপে দু'একজন, তারা চা-পাতার ঝুড়ি উপুর করে ঢালছে, বিছিয়ে দিচ্ছে। অপর দিকের বেড থেকে কয়েক জন মেঝেতে ফেলছে চা-পাতা। চা-ঘর থেকে জনাকয়েক এসে ঝুড়িতে তুলে সে চা-পাতা ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে—কলে ফেলবে।
বড় চা-ঘরবাবুকে দেখতে না পেয়ে চৌকিদারকে বলে বিকাশ, এখানে তো নেই দেখছি !
আয়া থা। চলা গিয়া হোগা। —বিকাশের কথার জবাব দিয়ে যারা চা-পাতা কলঘরে নিয়ে যাচ্ছে তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করে চৌকিদার, হেই ! চা-ঘরবাবু কাঁহা ?
জবাব না দিয়ে সে লোক হাতের ইঙ্গিতেদেখালে, ঐ যে। ধুপঘরের সে মাথায় কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলছে বড় চা-ঘরবাবু। চৌকিদার আর বিকাশ দু'জনেই দেখেছে। বিকাশ হন্ হন্ করে এগিয়ে যায় সে দিকে।
ধুপঘরে মিটমিটে বিজলি আলো। ভাল করে না তাকালে দূর থেকে স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না। বড় চা-ঘরবাবু তাকে দেখে সে কথা বললে। বিকাশ হাসলে। বললে, চা-ঘরটা ঘুরে দেখা যাবে ?
নিশ্চয়। —বড় চা-ঘরবাবু বলে, চা-বাগানে চাকরি করছ বিকাশবাবু, আসল জিনিসটাই দেখবা না ? এতদিনে দেখার কথা মনে হইল ?
বড় চা-ঘরবাবুর কথার ধরনটা এমন যে, বিকাশের লজ্জা লাগে। ঠিক তো ! চা-তৈরির সব না দেখলে তো চ-বাগানের বারো আনাই বাকি থেকে যায়। বিকাশ বেশ সলজ্জ হাসে। বড় চা-ঘরবাবুর

সঙ্গে তাঁর বিশেষ কথাবার্তা বা মেলামেশা নেই। তবুও ভদ্রলোককে তার ভালই লাগে। এখানে একমাত্র এই জনার্দনবাবুই তাকে তুমি বলে। অমর ছাড়া আর সবাই আপনি বলে। সে জন্যেও বোধ হয় জনার্দনবাবুকে অন্যান্যদের তুলনায় সহজ মনে হয়। কিন্তু এখন একটা খট্‌কা লেগে আছে। কলকাতা থেকে কিছু একটা আনতে বলবে সে ধারণাটা তাকে কিছুটা শক্ত করে তুলেছে। বিকাশ মুখে সামান্য হাসি টেনে বলে, চলুন।

হঃ! চলো, আগে দেখ, পরে কথা হইব। —বলে, জনার্দনবাবু তাকে নিয়ে কলঘরের ভেতরে চলে এল।

একটা যন্ত্রের সামনে নিয়ে এল বিকাশকে। চা-ঘরবাবু বললে, ধুপঘর দেখলা তো! ঐ খানে চা-পাতা ছায়ায় ছায়ায় থাকে চার-পাঁচ ঘণ্টা। একটু যখন নরম হইয়া যায় তখন, এই যন্ত্রে ঢালে। এখানে ডলে ডলে যন্ত্র তারে কি করে দ্যাখো, একেবারে তুম্বা, যেন ছেঁচা ছেঁচা মনে হয় না? এই ছ্যাঁচন ঠিক ঠিক হওনের পর—চলো, ঐ দিকে চল।

একটা বিরাট হলঘরের মধ্যে নিয়ে এল বিকাশকে। চা-ঘরবাবু বলে, এই হইল রংঘর। দ্যাখো, মেঝেতে সব ছ্যাঁচা চা-পাতা বিছাইয়া রাখছে। ছ্যাঁচনের কল থেইকা এঘরে আইন্যা এই ভাবে রাখতে হয় কয়েক ঘণ্টা। এইখানে ঐ ছ্যাঁচা চায়ে রং ধরে। এই রং ধরার বেশকম হইলে চায়ের কোয়ালিটির হেরফের হইব।

বিকাশ জিজ্ঞেস করে, রং লাগাতে হয়?

আরে না!—বড় চা-ঘরবাবু বলে, আপনা-আপনি রং হয়। এই দেখো। একমুঠো ছেঁচা চা-পাতা তুলে দেখায় বড় চা-ঘরবাবু। বলে, দ্যাখো, গন্ধ দ্যাখো। দ্যাখছ না, সারা চা-ঘরে যে চায়ের গন্ধ ম ম করছে তা এই ছ্যাঁচা চায়ের। বুঝলা? চলো।

এবার আবার আর এক যন্ত্রের সামনে নিয়ে এল। এখানে রংঘর থেকে ছ্যাঁচা চা-পাতা তুলে এনে যন্ত্রে ভাজা হয়ে গেলে আরেক যন্ত্রে চলে যায় কোটা হতে। কোটার যন্ত্র থেকে পর পর কয়েকটা যন্ত্রচালিত বড় বড় চালুনিতে চালান হতে থাকে চা-পাতা। সেখানে, নানা গ্রেডের চা আলাদা হয়ে যায়। গুঁড়া চা, পাতা চা, ফেনিংস—নানা ধরনের, নানা নামের।

গুঁড়া, পাতা, ফেনিংস্ এসব চায়ের লিকার, কালার, ফ্লেবার সব টেস্ট করে গ্রেড ঠিক করতে হয়। তারপর প্যাকিং। ব্যস, প্যাক করে করে চালান। মোটামুটি সব দেখলা তো?—চা-ঘরবাবু তাকায় বিকাশের দিকে। বলে, পরে ভাল কইরা দেখবা। অখন চলো, কথা আছে।

এতক্ষণ ভুলেই ছিল আসল কথা। এবার বড় চা-ঘরবাবুর কথা শুনে সজাগ হল। বলবে নাকি, কি আনতে হবে বলুন! কিন্তু সেটা বড় ছ্যাবলামির মত হয়ে যাবে। বিকাশ চুপচাপ বড় চা-ঘরবাবুর পেছনে হাঁটতে থাকেন।

কলকাতা রওনা হবার দুদিন আগে অমরের বাসায় এল বিকাশ। রাত তখন সাড়ে নয়টা। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। বিকাশের মুখ-ঠোঁট, হাত-পা শিল-পাথর হয়ে গেছে মনে হয়। মিমি ঘুমিয়ে পড়েছে। মালা রান্না ঘরে। অমর শোবার ঘরে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে তামাক টানছে। দরজা-জানালা সব বন্ধ। নগেন সুতির চাদর মুড়ি দিয়ে রান্নাঘরের কোনে চুপচাপ বসে আছে।

বিকাশ দরজায় টোকা দিয়ে ডাকলে, অমর।

অমর উঠে এসে দরজা খুলে বললে, ভেতরে আয়। তোর কথা ভাবছিলাম।

আমার কথা?

ঠিক তোর কথা নয়, সব মিলিয়ে আর কি!

বিকাশ কিছুই বুঝলে না। চেয়ার টেনে বসলে। গরম কোট তার গায়ে। বললে, কি বলছিস?

অমর বিকাশের কোটের দিকে তাকিয়ে বলে, চমৎকার তো! দামী জিনিস।

বাবার।—হাসে বিকাশ। বলে, বাড়ি থেকে কেউ সুটকেসে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। না দিলে এই শীতে—

অমর বলে, বোঝ তবে, সংসারটা একা কাটানো শক্ত।

এই রে! তুই আবার সংসার নিয়ে পড়লি!

ভয় নেই। তোকে আমি বাঁধবোও না, ছাড়বোও না।

যেমন বেণী তেমনি রবে-র মতো?

দুজনেই হো হো করে হেসে ওঠে।

ওদের হাসির শব্দ শুনে মালা চলে এল এ ঘরে। বললে, মিমি জেগে উঠলে কান্না লাগাবে। আপনি কিছু মনে করবেন না বিকাশবাবু। ও এসব একদম বুঝতে চায় না।

তবে চল উঠোনে গিয়ে বসি।—অমর বলে।

আমি কি তাই বলছি? বিকাশবাবু, দেখুন আপনার বন্ধু কেমন!—বলে মালাও বসে পড়ে একটা চেয়ারে।

মালার গায়ে গরম চাদর। সেটা একটু টেনেটুনে ভাল করে বসে

বিকাশকেই ফের জিজ্ঞেস করে, শুনলাম প্লেনে যাচ্ছেন ?
সে জন্যেই তো এলাম। আমিও শুনেছি।—হাসতে হাসতে অমরের দিকে তাকিয়ে বলে, টিকিটটা দে !
শিলচরে লোক পাঠিয়ে বিকাশের জন্যে এয়ারের টিকিট আনিয়েছে অমর দু'দিন আগে। অমর মালাকে বলে, আমার সুটকেস থেকে টিকিটটা দাও না।
মালা উঠে গিয়ে টিকিটটা এনে বিকাশের হাতে দিয়ে বললে, প্লেনে যাওয়াই ভাল বাবা। ট্রেনে যেমন সময় তেমন ঝামেলা।
আমার কিন্তু ট্রেনই ভাল লাগে। কেবল সময়ের কথা ভেবেই প্লেনে যেতে হচ্ছে। প্লেনে যা খরচা, কোম্পানী দিচ্ছে বলে, নয়তো—
বিকাশের কথা শেষ না হতেই অমর বলে, মেয়েরা ওসব বুঝতে চায় না। তাদের কেবল ঝট্‌পট্‌ কাজ হাঁসিলের তাল।
কি জানি ! নারী-পাঠ তো নিই নি। তুই বুঝবি ভাল।—অমরকে বলে মালার দিকে তাকায় বিকাশ। ভেবেছিল মালা তাদের ছাড়বে না. ফোঁস করবেই।
মালা হাসলে. কিছু বললে না। অমর বলে, যাক গে। এখন কাজের কথা বল। বড় চা-ঘরবাবু কি বলল সেদিন ?
তার সন্দেহ. আমি ফিরে আসব কিনা বাগানে।
সে তো অনেকেরই মনে হয়েছে।
তোরও ?
আরে না। আমি তোকে চিনি না ? তুই যে ভাঙ্‌বি কিন্তু মচকাবি না তা আমি জানি। ওসব রাখ। আর কিছু বলে নি ?
একটা টোট্‌কা। —একটু হাসে বিকাশ। বলে, দীপেনবাবু নাকি বাবাকে চিঠি লিখতে পারে। তাই যদি হয়, বাবা সোজা যেন লিখে দেয় মেয়েদের বিয়ে না হতে বিকাশের বিয়ের কথা ওঠে না।
তা তো আমিও বলি। তো টোট্‌কা বলছিস কেন ?
তা ছাড়া কি বল ? ওসবে তো ঝামেলা মিটবে না। তা ছাড়া, আমার খুব খারাপ লাগে। এমন একটা ব্যাপার চলতে থাকুক এটা ভাবলে সব ছেড়ে-ছুঁড়ে পালাতে ইচ্ছে হয়।
মালা বলে, আমি একটা কথা বলব ?
বলো।—বলে বিকাশ তাকায় মালার দিকে।
মালা বলে, বড় চা-ঘরবাবুই ঠিক বলেছে। আপনার বাবা যদি ওভাবে লেখেন তাতে বড়বাবুর আর বলার কিছু থাকবে না।
তা না হয় হল। আমাকে তো এখানে চাকরি করতে হবে।

অমর তেতে উঠে বলে, তোর চাকরির ভয় কিসের? জানিস, মেহরা সাহেবকে জনার্দনবাবু কি বলেছে?
বিকাশ অবাক হয়। তার হয়ে মেহরাকে জনার্দনবাবু আবার কী বললে, কোন্ স্বার্থে! জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকায় অমরের দিকে।
অমর বলে, জনার্দনবাবু তোর খুব প্রশংসা করেছে সাহেবের কাছে। এমন কাজের লোক কোথায় পাবে? সব তো ফাঁকিবাজ আজকাল!
বাব্বা! এমন সার্টিফিকেট! জনার্দনবাবুর কোন মতলব নেই তো!
ঐ তোর দোষ, মানুষ চিনতে ভুল করিস।
অমরের কথা শুনে ভেতরে কোথায় চোট লাগে বিকাশের। সত্যি হয়তো। মানুষকে চেনার মতো চেতনা হয়তো তার আজও হয় নি।
বিকাশ একটুক্ষণ চুপ থেকে বলে, ঠিক আছে, উঠি।
বিকাশ বেরিয়ে গেল। মালা বললে, বিকাশবাবু যেন কী, কোন্ জগতে বাস করে! কিছু বোঝেই না।
ও তুমি কী বুঝবে! তুমি কেন, আমরা কেউ-ই বিশেষ বুঝি না। জনার্দনবাবু বোধ হয় একটু ধরতে পেরেছে। ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে বলেছে, বড়বাবুর ওপর বিরক্ত হয়ে বা রাগ করে লাভ নেই। তার কাজ সে করছে। মেয়ের বাপ তো! উপযুক্ত পাত্র মনে করলে একটু চেষ্টা করবে না! বিকাশ ভেবেছে এও এক ধরনের সুযোগান্বেষী চালাক মানুষের স্বভাব। তাই জনার্দনবাবুকেও ওর সহজভাবে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। —বলে, মালার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে অমর।
মালা বলে, বড় চা-ঘরবাবু ঠিকই বলেছে। দীপেনবাবু চাইলেই তো বিকাশবাবু তার মেয়েকে বিয়ে করে বসবে না। সে কথা কে না বুঝবে, দীপেনবাবুও বুঝবে।
হেনার চিঠিটা নিয়ে যত গোল। বিকাশ ক্ষেপে গেছে।
তাও এমন কি আর। বিকাশবাবুর তো তাতে কিছু যায় আসে না।
তোমাকে তো বলেছি, বিকাশ অন্যরকম। ওর বোধবুদ্ধি বাইরে থেকে যত সোজা মনে হয়, তা ঠিক নয়। আমি তো জানি ওকে। অন্য দশ জনের মতো ভাবনা-চিন্তা ওর নয়।
কি জানি বাবা! আমি অতোশত বুঝি না। রাত হয়েছে। খাবে চলো।

দুদিনের মধ্যে বিকাশকে সব গুছিয়ে নিতে হবে। প্রথম কথা কলকাতা গিয়েই যে কাজটা আগে করবে, একগুচ্ছ কবিতার পাণ্ডুলিপি প্রেসে দেওয়া। আর একবার সেগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিতে পারলে ভাল হয়। অমরের বাসা থেকে ফিরে তাই করবে ভেবেছিল। কিন্তু এখন কী রকম

অন্যমনা লাগছে। তার নিজের ওপরে খুব রাগ হচ্ছে। অন্য সকলের বিচারে না গিয়ে আগে নিজের বিচারটা করে দেখলে যা দাঁড়ায় তা তাকে লজ্জা দিচ্ছে।

হুট্ করে সে ঠিক করে ফেললে কলকাতা যাবে। দরখাস্ত হয়ে গেল। ছুটি হয়ে গেল। কিন্তু কয়েকদিন আগেও ঠিক এতটা ভাবে নি। কাল হল কলকাতা থেকে আসা চিঠিগুলো ? না, এখানকার ওপরে সব কিছু মিলিয়ে একটা বিরাগ ! খুব ভাল করে গভীরে গিয়ে দেখলে অবশ্য এগুলোকে নেহাৎ আনুষঙ্গিক মনে হবে। ঠিক তাই। আসলে এক বছর ধরে তার যত বিচিত্র অভিজ্ঞতাই হয়ে থাক না কেন, কলকাতার জন্যে তলে তলে একটা যন্ত্রণা বেড়েই চলছিল। এখন বাইরের প্রতিকূলতায় সে যন্ত্রণা ছটফটানি তুলছে। নয়তো, দীপেনবাবুর ব্যবহার তাকে তত তিক্ত করতে পারতো না হয়তো।

যাক গে ! খেয়েদেয়ে সুকুমার আর চমরুকে ঘুমোতে বলে বিকাশ বসলে কবিতার পাণ্ডুলিপি নিয়ে। ফাঁকে ফাঁকে কম লেখা হয় নি। পঁয়ত্রিশটা কবিতা ! কবিতার বই যদি হয়—ঝাঁ করে মাথায় এসে গেল, বইয়ের নাম হবে 'ত্রিশ-পঁয়ত্রিশে'। তার নিজের বয়সের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থেকে যাবে বইয়ের নামের সঙ্গে। খুব মনে ধরে গেল এই নাম। নিজের কবিতার ভালমন্দ নিজে বোঝা যায় না। কিন্তু পড়তে গিয়ে কাঁচা বা অপাঠ্য মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, এখন তার নিজের কবিতার বই একটা ভীষণ দরকার। নইলে আর লেখা হবে না। কবিতা যদি আর না লিখতে পারে—এটা বিকাশ ভাবতেই পারে না। কবিতা না লিখতে পারলে এই এমন করে বেঁচে থাকার কোনও অর্থ হয় না। বেঁচে থাকার সে সাধারণ অনুভব তার কবিতা। মুখে বলে বোঝান যায় না যে কথা সে কথাই তার কবিতা। সে জিনিসটা ঠিক হয়েছে কিনা তা দেখতেই একটা বই—সকলের হাতে দিয়ে চেয়ে দেখবে সে মুখ-গুলোতে অনুভবের রং লাগে কি না-লাগে। কলকাতা গিয়ে সে তাই সবচেয়ে আগে কবিতার বই ছাপায় মন দেবে। এক মাসের মধ্যে দু'-আড়াই ফর্মার বই ছাপতে খুব কিছু অসুবিধা হবার কথা নয়। টাকা-পয়সা তো নিয়েই যাচ্ছে। এক বছরে প্রতি মাসে কিছু করে জমানো হাজার খানেক, কম কি ! হয়ে যাবে।

পাণ্ডুলিপির সব কবিতা পড়ে একটু রাত হলেও বেশ কিছুটা স্বস্তিতে শুয়ে পড়লে বিকাশ। শীতের এক বিপরীত অনুভূতি তাকে আশ্চর্য করে। ঠিক গরম নয়, উষ্ণতা। দৈহিক নয়, চেতনার উষ্ণতা। লেপের তলায় ঘুমিয়ে পড়ে বিকাশ।

পুনশ্চ

এক

উজ্জ্বল আর মণি স্কুল থেকে ফিরছিল। দূর থেকে দেখলে তাদের বিল্ডিং-এর গেট-এ একটা ট্যাক্সি থেকে নামছে বিকাশ। দু'জনেই এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলে, মেজদা! মেজদা এসেছে।

ছুটতে ছুটতে তারা বিকাশের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ফের বললে, মেঁজদা!

বিকাশ দু'জনকে জড়িয়ে ধরে বলে, স্কুল থেকে ফিরছিস? মা ভাল আছে? বাবা, বৌদি, দাদা, রমা, উমা ভাল আছে রে?

হ্যাঁ!—দু'জনেই সলজ্জ আনন্দে মাথা দুলিয়ে নেচে উঠল।

বিকাশের সঙ্গে একটা চামড়ার নতুন সুটকেস আর একটা মাঝারি মাপের প্যাকেট। ট্যাক্সির ক্যারিয়ার থেকে সে দুটো বার করে নিয়ে রাখতে যাবে, উজ্জ্বল আর মণি দু'জনে তা তুলে নিয়ে দিলে ছুট।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বিকাশ চেঁচিয়ে বললে, তোরা পারবি?

কে শোনে! ততক্ষণে ওরা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। এদিক ওদিক তাকালে বিকাশ। নতুন কিছু নজরে এল না। একই আছে সব। কিন্তু দমদম এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সিতে আসতে আসতে ভি. আই. পি. রোড বেশ নতুন মনে হচ্ছিল। দু'পাশে কিছু জনবসতিও যেন এক বছরে দ্যাখ্ দ্যাখ্ করে অনেক বেড়েছে। ট্যাক্সি থেকে যতটা নজরে এসেছে, মনে হয়েছে সল্টলেকও আর তেমন নেই। সে নিজেও কি আর তেমন আছে! মনে একটা হাসি ধরে, সে হাসি মুখে ফোটানো যায় না।

উজ্জ্বল আর মণি যত দ্রুত পারে প্যাকেট আর সুটকেস টানতে টানতে বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়েছে। মা ঘুমুচ্ছিল, ধড়ফড় করে উঠেছে। বৌদি মিনা কি সব গোছগাছ করছিল, সব ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। রমা শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ছিল, তা রেখে তড়াক্ করে উঠে বসলে। উমা বিছানায় বসে সিনেমা-পত্রিকার ছবি দেখছিল, তা ছুঁড়ে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুট লাগিয়েছে। আর তার পেছনে মা, বৌদি, রমাও ত্রস্ত ছুটেছে। হঠাৎ কিছু না জানিয়ে এমন আসা! আনন্দ-উত্তেজনায় কেউ যেন আর স্থির নেই। চারতলার সিঁড়ির

কাছে এসে দাঁড়ায় তারা। সকলের মুখে নীরব আনন্দ আর কৌতূহলের দৃষ্টি। তরতর করে উঠতে উঠতে চারতলার কাছাকাছি উঠে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলে ওদের। নাঃ, সব ঠিক আছে। মন ভরে যায় বিকাশের।

মাকে প্রণাম, বৌদিকে একটু হাসি, রমা উমা উজ্জ্বল আর মণির দিকে একটু আদরের ভঙ্গি, ব্যস, তাতেই কী খুশি সব! খুশির উৎসব। সে উৎসবে বিকাশও আজ পারছে অনায়াসে নিজেকে মিশিয়ে দিতে। এক বছর আগে যেমন সে, তেমনি ওরা কেউ এ কল্পনাও করতে পারতো না।

আরও দু'ঘণ্টা আগে আসার কথা। প্লেন দেরি করল। শীতকাল, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কিন্তু কলকাতার শীত আর আসামের শীত? শীতের তুলনা দিয়েই বিকাশ নিজেকে ধরে ফেলে, সে এখন কলকাতায় অতিথি। কিছু অস্বস্তি লাগছিল, একটা গরম ভাব। ঘরে ঢুকে আগে গায়ের কোট ছাড়লে।

রমা দেখে বললে, বাবার কোট তোকে বেশ মানিয়েছে তো মেজদা!

উমা মুচকি হেসে বলে, ঐ কোটই, আর কিছু না।

উমার কথা শুনে বৌদি আর মা-ও হাসলে। বিকাশ হাসতে হাসতে বলে, আগে তো কথাই বলতি না। কথা শিখেছিস্!

বৌদি বললে, এমন না জানিয়ে হঠাৎ চলে এলে? কী ব্যাপার?

এলাম, ইচ্ছে হল। তোমার অবশ্য অসুবিধে হবে। তবে, বেশি দিন না, একমাস মাত্র। —বলে জুতোর ফিতে খুলতে মন দিলে বিকাশ।

আহা! আমার কী অসুবিধে? স্বভাব তোমার একই আছে দেখছি। —বলে রান্নাঘরে ঢোকে মিনা। চায়ের জল চাপাবে, একটু খাবার করতে হবে। উজ্জ্বলের হাতে দুটো টাকা দিয়ে বলে, দুটো ডিম আর একটা মাঝারি পাউরুটি আনবে। দেরি করো না।

বিকাশ বলে, এই মাত্র স্কুল থেকে এল। এখন যেতে হবে না। পরে দেখা যাবে। বাবা আর দাদা আসুক। এখন শুধু চা।

মা বলে, ওদের তো আসতে এখনও অনেক দেরি। না, যা রে উজ্জ্বল, নিয়ে আয়। কবে রওনা হয়েছিস, খাওয়া হয়েছে কি হয় নি—

এক সঙ্গে সবাই হেসে উঠল। রমা বলে, মেজদা তো প্লেনে এসেছে।

তাই? তা কখন খেয়ে এসেছিস না এসেছিস! —একটা উদ্বেগ আর খুশির ভাব মিলেমিশে একাকার মায়ের মুখে।

তোমাকে ভাবতে হবে না। বৌদি, চা। রমা, একটা লুঙি দে। উমা, জুতো বাইরের ঘরে রেখে দে। মা, আমার খেয়াল হয় নি, জুতো নিয়েই

ঘরে ঢুকে গেছি। তোমার ঠাকুর-দেবতা—কথা শেষ না করে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে বিকাশ।
বিকাশের সুটকেস আর প্যাকেটে এয়ারের লেবেল হাতে ধরে দেখতে দেখতে মনে মনে উচ্চারণ করে মণি, এম আর বি আচারিয়া। মনের অবাক ভাবটা প্রকাশ করে না। বার বার বিকাশের দিকে তাকায়। দাদা নতুন হয়ে গেছে। নামে পর্যন্ত নতুনত্ব। কালই স্কুলে ক্লাশের বন্ধুদের বলবে।

অফিস ফেরত ঘরে ঢুকেই বিকাশকে দেখে তার বাবা হতভম্ব। বলে, তুই? হঠাৎ চলে এলি!
বৌদির সঙ্গে হাসি-গল্প করছিল বিকাশ। বাবার গলা শুনেই উঠে এসে প্রণাম করে বলে, হঠাৎই ইচ্ছে হল, ছুটিও পেয়ে গেলাম।
শরীর ভাল আছে তো!
ভাল।
বৌমা, এটা রাখো। —মিনার দিকে তাকিয়ে হাতের বাজার-ব্যাগটা এগিয়ে ধরেছে বাবা। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাজার করে আসা তার দীর্ঘ কালের অভ্যাস। ছেলে-মেয়েরা অবশ্য আপত্তি করে। বলে, ও তোমার স্বভাব। কেন যে অমন বোঝা টানতে যাও!
বিকাশ দেখছে। খুব একটা শক্ত-সমর্থ আর মনে হচ্ছে না বাবাকে। ইচ্ছে হল বলে, তুমি এবার চাকরি ছাড়ো। কিন্তু এখনই সে কথা বলা ঠিক হবে না ভেবে চুপ করেই থাকল। লক্ষ্য করলে, বাবার মধ্যেও একটা প্রচ্ছন্ন চাঞ্চল্য লেগে গেছে যেন। তাকে দেখে? হবে বা!
কিছুক্ষণ বাদে দাদা প্রকাশও এল। তাকে দেখে হৈ হৈ করে উঠল। কখন এলি, কী ব্যাপার, খবর দিস নি কেন, প্লেনে এলি তো রওনা হলি কখন? এক নিঃশ্বাসে হাজারটা প্রশ্ন। একটারও জবাব দেবার সময় দিচ্ছে না দাদা। যেন জবাব শোনার কথা নয়, কেবল প্রশ্ন করারই কথা। দাদার এই ভাবটা বিকাশকে আচ্ছন্ন করে। হৃদয়ের এমন প্রকাশ সে দাদার মধ্যে আগেও কয়েকবার দেখেছে। তার নিজের কেন কখনও এমন হয় না? দাদার মতো এমন একখানা খোলা দিল পেলে সে তো সংসারের আর সব কিছুকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারতো।
প্লেনে উড়তে উড়তে ভেবেছিল, বাড়ি এসেই বেরিয়ে পড়বে। এক নিমেষ সময়ও সে নষ্ট হতে দেবে না। সব কাজে লাগাবে। কিন্তু এখন দেখছে সময়ের হিসেব ওভাবে করতে গেলে অনেক কিছু হারাতে হয়, অনেক কিছুর মূল্যও বোধের অগম্য থেকে যায়। সত্যি যদি বাড়ি এসেই

বেরিয়ে পড়তো, বাবার এই চেহারাটা হয়তো নজরেই আসতো না, দাদার ভালবাসার চিহ্নও হয়তো খুঁজে পেত না। একটা আক্ষেপ প্রায় লেগে গেছিল মনে—বৃথা অনেকটা সময়, একদিনের ছুটি কমে গেল! কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওভাবে হিসেব ধরাটা ঠিক নয়।

চা-টা খেয়ে একটু সুস্থির হয়ে বসে বাবা ডাকলে, বিকাশ! আয় দেখি, শোন।

বিকাশ সুটকেস থেকে টাকা বার করছিল। বাবার হাতে দেবে। প্যাকেটটা খুলতে হবে। তাতে পাঁচ কেজি ভাল চা। দুদিন আগে সন্ধ্যায় তার বাসায় পাঠিয়েছিল জনার্দনবাবু। একটা শিলপে লিখে দিয়েছিল, 'বিকাশবাবু, তোমার বাড়ি আর বন্ধুবান্ধবদের জন্যে উপহার। ভয় নেই, চোরাই মাল না। ম্যানেজারের ছাড়পত্র সঙ্গে দিলাম। তোমার মঙ্গল কামনা করি। ইতি—জনার্দন মুখোপাধ্যায়।' খুব অবাক হয়েছিল বিকাশ। কিছু চা নিয়ে যাবার কথা মনে হয়েছিল ঠিক! লজ্জায় তা কাউকে বলেও নি তাও ঠিক। একেবারে খালি হাতে এসে উঠবে তা ভাবতে খারাপ লেগেছিল। সবাই বলবে কি? তুই যে চা-বাগানে চাকরি করিস তার একটা নজির রাখবি তো! কিছু চা আনতে পারতিস! এভাবে সে কলকাতার কথা ভেবেছে। সত্যি, কী লজ্জা! চা-বাগানের বাবু, অন্তত এক কেজি চা-ও তো আনে সকলের জন্যে!

কিন্তু এক কেজি নয়, পাঁচ কেজি ভাল চা। জনার্দনবাবু একটা সুন্দর রঙের ছোপ লাগিয়ে দিয়েছে তার মনে। ফিরে গিয়ে সেই রং যাতে জ্বলে না যায় তাই দেখবে। এসব ভাবনা রেখে সে বাবার ডাকে সাড়া দিয়ে বললে, আসছি।

টাকা-পয়সা সব যেমনকার তেমন রেখে সুটকেসের ডালা বন্ধ করে চলে এল বিকাশ ভেতরের ঘরে। ভেতরের ঘরে তখন বাবা, দাদা, মা, রমা, উমা, বৌদি, উজ্জ্বল, মণি মেঝেতে শতরঞ্জি পেতে বসেছে। দেখে মনে হয় যেন ছোট্ট একটি সভা বসেছে আচার্য বাড়িতে। বিকাশ এসে মায়ের পাশে বসলে। বাবা যখন উপস্থিত, বাবাই প্রধান বক্তা। বাবার দিকেই তাকালে সে।

বাবা ধীরে ধীরে বলে, চিঠিপত্র একদম লিখিস না, উদ্বেগ লাগে। কেমন লাগছে ও জায়গা?

বিকাশ বলে, ভাল।

চা-বাগান, তোর ভাল লাগছে?

অমার তো খারাপ কিছু মনে হচ্ছে না।

লিখেছিলি পার্মানেণ্ট হয়ে গেছিস। মাইনে-পত্র তো এখন ভালই দেবে।

উন্নতির সম্ভাবনা আছে ?
উন্নতি আর কি, ক্লার্ক থেকে অ্যাসিস্টেন্ট হেড ক্লার্ক, তারপরে হেড ক্লার্ক। অন্য কোনও চা-বাগানে হয়তো অ্যাসিস্টেন্ট বা হেড-এর পোস্ট খালি হল, চেষ্টা করলে সেখানে চলে যাওয়া যায়। মাইনে কিছু বেশি হবে।
বাবা একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে আসে। বলে, রাঁধুনী রেখেছিস লিখেছিলি। ভাল রাঁধে, আমাদের মতো ?
বিকাশ হেসে বলে, আমাদের মতো হবে কেন, ওরা ওদের মতো রাঁধে। আমার খারাপ লাগে না।
তরিতরকারি, মাছ-মাংস সব পাওয়া যায় তো !
সবই মেলে। তরিতরকারি তো একবারে টাটকা।
তাই ? ভাল।—বাবাও হাসে। মনে হয় এসব শুনে খুব খুশি। মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে, এবার মেজো ছেলের কাছে গিয়ে থেকে এসো।
বাবার কথাটা ঠাট্টার না সত্যি করে, কেউ-ই বুঝতে পারে না।
রমা-উমা দু'জনেই বলে, মায়ের সঙ্গে আমরাও যাবো।
বৌদি বলে, আমাদের জন্যে কী আনলে ?
তোমাদের জন্যে কেবল চা।
চা !—বৌদির সঙ্গে প্রায় সবাই হেসে ওঠে।
এবার বিকাশ বলে, আর যা পাওয়া যায় তোমাদের তা চলবে না। শুনবে ?
রমা-উমা-বৌদি এক সঙ্গে বলে ওঠে, কী !
গরমের সময় কাঁঠাল, বর্ষার সময় আনারস, পেয়ারা, শরতে পেঁপে, হেমন্তে কমলা, বসন্তে চিনার আর বারো মাস কলা।—বলে মুচকি মুচকি হাসতে থাকে বিকাশ। লক্ষ্য করলে, বাবা দাদা, আর মায়ের মুখেও হাসি।
বাবা বলে, আম পাওয়া যায় না ওখানে ?
চালানি। খুব কম। আম আর পটল কাছের শহর মেলে, চা-বাগানে দেখি নি।
জায়গা কেমন ?—দাদা জিজ্ঞেস করে।
বিকাশ বলে, কেমন আর, শহর তো নয়, টিলা, পাহাড়, জঙ্গল। বাঘ-সাপ-হাতি সব আছে।
বাবা বলে, হাঁ, এসব শুনেছি। সাহেবদের আমলে নাকি খুবই ভাল ছিল, এখন তেমন নেই অনেকে বলে।
হবে হয়তো।—বিকাশ বলে, যা দেখেছি তা তো আমার খারাপ লাগে নি।

এখানে নানা চরিত্রের মানুষ, ওখানেও তাই। এখানেও যেমন মানুষের নানা সমস্যা, ওখানেও তাই। এখানে এখানকার মতো, ওখানে ওখানকার মতো।

বাবা বলে, তা তো হবেই। তোর যে খারাপ লাগছে না তাই হলো আসল কথা। স্বাস্থ্য কেমন ওখানকার ?

খারাপ না। এত দিনে আমার তো কিছু হয় নি। —বলে বাবার দিকে তাকায় বিকাশ। বাবার চেহারাটা অনেকটা ভেঙ্গে গেছে। খুব খারাপ লাগে।

হঠাৎ উজ্জ্বল আর মণির দিকে তাকিয়ে বলে বাবা, এবার যা, পড়তে বোস গে।

বাবাকে খুব ভয় পায় ওরা। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে বাইরের ঘরে গিয়ে আলো জ্বালিয়ে পড়তে বসে গেল। মা-ও উঠল। এবার বৌদি জিজ্ঞেস করে, তোমার ঐ বড় প্যাকেটটা কিসেব ?

বিকাশ একবার দাদা আর একবার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, দেখবেখন পরে।

রমা আর উমা অধৈর্য। বলে, বল্ না কী ওতে ?

খুব ভাল চা। আমি যে চা-বাগানে চাকরি করি সে বাগানের চা। —বলে বিকাশও উঠতে যাবে, বাবা বললে, বোস।

দাদার মুখের দিকে তাকায় বিকাশ। দাদা সে দিকে খেয়াল না করে বৌদিকে বলে, রাত হচ্ছে। রান্নার পাটটা এবার সেরে ফেল গিয়ে।

রমা উমা আর বৌদিও উঠে গেল। বাবা উঠে গিয়ে তার কাঠের হাতবাক্স থেকে কী একটা কাগজ হাতে নিয়ে এসে ফের বসলে।

দাদা বলে, এক মাসের ছুটি। সবে তো কনফার্ম হয়েছিস। দিলে ?

দিলে। এক বছরে মাত্র এক দিন অফিস কামাই করেছি। কেন দেবে না বল ? ম্যানেজার অবাঙ্গালী। খারাপ না। —বলে বিকাশ বাবার দিকে তাকায়।

বাবা বলে, রমা উমা দু'জনেরই সম্বন্ধ দেখছি। দরকার হলে টাকা-পয়সার যোগাড় করতে পারবি তো !

কত ?

তা ধর, হাজার পাঁচেক তুই দিবি।

আমাকে একটু আগে জানাবে।

তা তো নিশ্চয়। সময় হাতে রেখেই জানাবো। তুই যে মাসে মাসে দুশো টাকা পাঠাচ্ছিস আমি তা তোর মায়ের নামে ডাকঘরে রেখে দিচ্ছি।

বিকাশ চুপ করে ভাবছিল। বাবা বলে, দীপেন ভট্টাচার্য, তোদের

হেডক্লার্ক ক'দিন আগে আমাকে চিঠি লিখেছিল। আমি জবাব দিয়েছি। দিন দুই আগে। তুই আসবি সে তো ভাবি নি। জানা থাকলে তুই এলে পরে জবাব দিতাম। এই সেই চিঠি আর আমার জবাবের কপি, দ্যাখ।
দীপেনবাবুর চিঠি আর তার নকল বিকাশের হাতে দিয়ে উঠে গেল বাবা।
দুটো চিঠিই পড়লে বিকাশ। বাবা ঠিক জনার্দনবাবুর টোটকাটাই ছেড়েছে। ভাবতে গিয়েই আড়ষ্ট হয়ে যায়। টোটকা শব্দটা এখন তাকে বিঁধছে। বাবা স্পষ্ট লিখেছে, 'আমার দুই কন্যা বিবাহযোগ্যা। তাহাদের বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত শ্রীমান বিকাশের বিবাহের কথা ভাবিতে পারি না। মনে হয় এই ব্যাপারে বিকাশেরও মত একই হইবে। তথাপি তাহার বৌদি তাহাকে চিঠি লিখিয়া তাহার মতামত জানিবে। আশা করি আপনি ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন না।'
চিঠি দুটো পড়ে বিকাশ কিছু বলছে না দেখে দাদা বললে, বাবা ঠিকই লিখেছে, কী বলিস!
আর কি লিখবে!
না, তোর কি মতামত—
এ ব্যাপারে আমার আবার মতামতের কি থাকছে। কোনো মেয়ের বাপ তার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিলেই আমি ঘাড় নেড়ে দাঁড়াব?
ঠিক। তবু, দীপেনবাবু যে লিখলে, তুই কিছু জানিস কি না-জানিস এসব তো আমাদের বুঝতে হবে।
এবার বিকাশ দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ ভাবলে। ঠিক তো! এখানে সবাই ভাবতেই পারে, দীপেনবাবুর প্রস্তাবের আগে কিছু একটা ঘটে থাকবে বা। খুব হাসি পেল বিকাশের। দাদার দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকল।
দাদা বললে হাসছিস যে!
হাসব না! একটা বছরেই যেন আমার সব পালটে গেছে এরকম ভাববি কেন?
না, তা নয়। তবে, ভদ্রলোক হঠাৎ ওরকম লিখছে। কারণ কিছু আছে তা ভাবা কি দোষের?
দোষের নয়, অনুচিত। কেন ভাববি ওরকম!
যাক যাক! সব তো বুঝলাম।
কি বুঝলি?
তোর মত নেই।
না, নেই। বিয়েতেই মত নেই আমার।

দুই

খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস হয়ে গেছে। কমলাফুল টি এস্টেটে চাকরির অবদান এটা। পাঁচটার আগেই ঘুম ভেঙ্গে গেছে। একবছর আগে পর্যন্ত যেমন ঘুমুতো, সেই বাইরের ঘরের চৌকিতেই তার বিছানা করে দিয়েছে মা। লেপের তলা থেকে মাথা বার করে বুঝলে আসাম আর কলকাতার শীতের তারতম্য কতটা। চৌকি থেকে নেমে মেঝেতে উজ্জ্বল আর মণিকে টপকে বাইরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালে। উজ্জ্বল আর মণি বড় একটা লেপের তলায় বিড়ে পাকানোর মতো হয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বিকাশ দরজা খুলতে যাচ্ছে, মা পেছন থেকে বললে, বাইরে কোথায় যাচ্ছিস ? আর একটু শুয়ে নে। কী শীত দেখছিস না !

বিকাশ হাসে। বলে, এখন এ শীত আমার কাছে কিছু না মা। ওখানে যা শীত না, তুমি ভাবতেই পারবে না।

হোক্ ! তুই আর একটু ঘুমিয়ে নে।

এতদিন বাদে এসেছি। একটু দেখি বাইরেটা। —বাইরের বেলকনিতে এসে দাঁড়ায় বিকাশ। অন্ধকার ঠিক কাটে নি। আকাশে এখনও রাতের আভাস। কলকাতার কাক এখনও জাগে নি। আকাশের পুব দিকটায় অন্ধকার সবে একটু ফিকে হচ্ছে।

পেছন থেকে বৌদির স্বর কানে এল, বেড টি চাই নাকি ?

একে একে সব জাগছে। ভাবলে বিকাশ। হয়তো তার সাড়া পেয়েই। পেছন ফিরে বৌদিকে বললে, ওসব শহুরে সখ। আমি এখন চা-বাগিচার মানুষ। হাত-মুখ ধোব। জামা-কাপড় গায়ে চাপাব। তারপর আরাম করে বসে মুড়িটুড়ি কিছু পেটে দেব। সব শেষে ধূমায়িত এককাপ চা। ব্যস, চা শেষ করে সোজা বাইরে।

বিকাশের বলার ভঙ্গিতে মিনা হেসে ফেলে। বলে, খুব চালু হয়েছ দেখছি। তা হলে একটু পরেই চা করি, সবাই উঠুক।

বিকাশ মাথা দুলিয়ে সায় দিয়ে সামনের দিকে ঘুরে দাঁড়ালে।

তিনতলার বেলকনি থেকে একটা হাঁক উঠল, আরে বিকাশ ! কখন এলে ?

বিকাশ দেখলে। রায়বাবু। দাদার বয়েসী। এক মিনিটের মধ্যে ভদ্রলোক তর তর করে চারতলায় উঠে এসে তার মুখোমুখি দাঁড়াল। পায়ে ধরে প্রণাম করতে যাচ্ছিল, ভদ্রলোক বাধা দিলে, আরে দেখ ! থাক থাক।

তা, কেমন আছ? কতদিন থাকবে?
ভাল। কুড়ি-পঁচিশ দিন তো থাকবোই। —কথা বলতে বলতে লক্ষ্য করে, চারতলা থেকে একতলা অবধি একটা-দুটো ফ্ল্যাটের দরজা-জানালা খুলছে। একজন-দুজন নারী বা পুরুষ ওপরে তাকিয়ে তাকে লক্ষ্য করছে। বোধহয় রায়বাবুর হাঁকেই জেগে উঠছে সবাই।
খুব শীত পড়েছে হে! পরে কথাবার্তা হবে। এখন ভেতরে যাও। ঠাণ্ডা লেগে যাবে। —বলে রায়বাবু যেমন এসেছিল তেমনি আবার চলেও গেল।
বিকাশ হাসলে মনে মনে। শীতের সময় শীত শীত বাইয়ে ধরে কলকাতার মানুষকে। যদি সে আসামে না যেত তারও হয়তো শীতের নামে কাঁপুনি লেগে যেতো। বছর খানেক আগে তারও এ বাই ছিল কিনা একবার ভাবলে। মনে হল, শীত-ফিত নিয়ে তার ততো আদিখ্যেতা ছিল না কোনও দিন। ফর্সা হয়ে আসছে। আর দাঁড়াল না। ভেতরে এসে দেখে সবাই জেগেছে। উজ্জ্বল আর মণি চায়ের প্যাকেটে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কি বলাবলি করছে ফিস্‌ফিস্ করে। ভেতরের মেঝের বিছানাতে দাদা বসে আছে চাদর মুড়ি দিয়ে। বাবা গেঞ্জির ওপরে ফুল হাতা সুয়েটার গায়ে দিয়ে চোখ বুজে বসে আছে খাটের ওপরের বিছানায়। রমা উমা বৌদি মা ওদের কেউ নেই এ ঘরে। ওরা কেউ হয়তো বাথরুমে, কেউ রান্নাঘরে। রান্নাঘরে দাদা-বৌদির বিছানা তুলে পাট করে এনে রাখা হয়ে গেছে এ ঘরের খাটের নিচে। চিরাচরিত পরিচিত চিত্র। তবু এক বছরের ব্যবধানে কিছুটা অন্যরকম লাগে, আবার ভালও লাগে।
তোরা মুখ-টুক ধুবি, না কী! চায়ের জল ফুটছে কিন্তু! —রমা হাঁক পাড়লে রান্নাঘর থেকে।
দাদা বললে, উঠছি। উজ্জ্বল, শুনে যা।
উজ্জ্বল যেন তৈরি ছিল। সঙ্গে সঙ্গে চলে এল।
মিনা, উজ্জ্বলকে পাঁচটা টাকা দিয়ে যাও আমার মানিব্যাগ থেকে। জিলিপি আর কচুরি আনবে। —দাদার গলা বেশ দেরাজ।
সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘর থেকে মিনার গলা ভেসে আসে, আমি দাঁত মাজছি। তুমি দাও না।
দ্যাখ, আমার প্যান্টের পকেটে মানিব্যাগ আছে। পাঁচটাকা নিয়ে যা। জিলিপি দু টাকার, কচুরি তিন টাকার, বুঝলি। —উজ্জ্বলকে বুঝিয়ে বলে দাদা।
দাদার প্যান্টের পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে পাঁচ টাকা নিয়ে পা বাড়াচ্ছিল উজ্জ্বল। বাবা বলে, গরম জামা পরে যা।

বিকাশ দেখলে উজ্জ্বল আর মণির গায়ে পাতলা হাফসার্ট। রমা উমা বা বৌদির শীত নেই মনে হচ্ছে। তারা কেউ বাড়তি কিছু গায়ে চাপায় নি। মা একটা উলের ব্লাউজ পরেছে। বিকাশ নিজে পরেছে গেঞ্জির ওপরে মোটা গেঞ্জি। এসবও নতুন কিছু না। তাদের বাড়িতে এখন নতুন বুঝি বা সে নিজে। জিলিপি আর কচুরি সে ভালবাসে। দাদা জানে। তাই আনতে পাঠালে। এই বোধটা তার নতুন।

উজ্জ্বল বেরিয়ে গেল। দাদা জিজ্ঞেস করে. জিলিপি-টিলিপি পাওয়া যায় চা-বাগানে ?

পাওয়া যায়—সপ্তাহে একদিন বিকেলে বাজার. সেই বাজারে। কচুরি-টচুরি হয় না।

মিষ্টির দোকান নেই ? —বাবা জানতে চায়।

না। কে কিনবে ? খাবার-টাবার সবই বাড়িতে নিজেদের করে নিতে হয়। শহরে সব পাওয়া যায়। শহর অনেক দূর। সাতেপাঁচে এক-আধবার যাওয়া হয়। তখন মিষ্টি-টিষ্টি নিয়ে আসা যায়।—বলে বিকাশ।

খুব দাম ?—বাবা জিজ্ঞেস করে।

বিকাশ বলে, এখানকার মতই। সামান্য এদিক ওদিক হতে পারে। তা বেশি বলা যায় না।

মা এ-ঘরে এসে তাড়া দিলে, বাথরুম খালি, কে যাবে যাও।

বাবা বলে, তোরা সার। আমার সময় লাগবে, পরে যাব।

দাদা উঠল। বাবা জিজ্ঞেস করে, তোর থাকার কোয়ার্টার কেমন ? জল, বাথরুম সব ভাল আছে তো !

একটা আস্ত বাড়ি। আলাদা কাছারিঘর অতিথি-অভ্যাগতের জন্যে। তিনটে রুম একটা পর্টিকো সমেত থাকার ঘর। আলাদা রান্নাঘর, আলাদা বাথরুম। জলটা কলকাতার মতো সময় মাফিক। আমাদের সি. আই. টি. বিল্ডিং-এর মতো চব্বিশ ঘণ্টা জল নয়।

আলো ?—বাবা তাকায়।

বিকাশ বলে, কারখানা, অফিস, সাহেবের বাংলো, রাস্তায় বিজলি বাতি। বাবু-কুলিদের ঘরে কেরোসিনের আলো।

তিন

চা-টা খেয়ে বিকাশ বেরিয়ে পড়ল। আটটা বেজে গেছে। বাবা বা দাদার গল্পগুজবের সময় শেষ। চান, খাওয়া, অফিস যাওয়া এসবের জন্যে বাড়িশুদ্ধ আর সবারও তাড়া। উজ্জ্বল আর মণি কেবল বাইরের ঘরের টেবিলে বই সামনে খুলে বসে, কী পড়াশোনা তা ওরাই জানে। মা বলে দিলে, দেরি করবি না।

এ বেলা দেরি হবার কথা নয়। এখন যাবে দু নম্বর বিল্ডিং-এ নিহালের সঙ্গে দেখা করতে। তারপরে হারুর স্টল। পরে ভাবা যাবে বিকেলে কোথায় যাবে। দুপুরে অবশ্য একবার ট্যামার লেন-এ 'হালচাল' পত্রিকার অফিসে যাবেই। কবিতার বই ছাপার ব্যাপারে ওখানে ছাড়া ঠিক খোঁজখবর আর কোথায় পাবে! তারপর কলকাতার কাজ একটা ছকে নেবে মনে মনে। জানুয়ারীর দশ তারিখের এয়ার টিকিট দু'এক দিনের মধ্যেই কেটে ফেলতে হবে। দেরি হলে তারিখ মতো না-ও মিলতে পারে। শংকরের সঙ্গে দেখা আগে হলে—কাল রবিবার, সল্ট লেক ঘুরে আসবে। ওর সঙ্গে দেখা হলে হয়তো অনেকের খবর জানা যাবে। এক বছরের খবর, কম হবে না।

নিহালদের ফ্ল্যাটে এসে দেখে সেখানে অচেনা বাঙ্গালী পরিবার। নিহালরা পাঞ্জাবী। তার দাদা, বৌদি, ভাইপো-ভাইঝি, ছোট ভাই মিলে ছ'-সাতজন ছিল। এখন যারা, মনে হয় ছোট পরিবার—হাম দো, হামারা দো-এর সামিল। তারা বললে, নিহালরা ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়েছে। আর কিছু জানে না। বিকাশকে দেখে অন্য ফ্ল্যাটের অল্প বয়েসী একটি মেয়ে এগিয়ে এসেছে। মুখচেনা লাগছে। ঠিক ধরতে পারছে না কে, কি নাম। কিন্তু মেয়েটি তাকে চেনে। বললে, আপনি বিকাশ দা, তিন নম্বরের।

বিকাশ হেসে বলে, হাঁ। তুমি চেন আমাকে?

হ্যাঁ। —সলজ্জ মুখে তাকালে মেয়েটি।

বিকাশ জিজ্ঞেস করে, এ ফ্ল্যাটে যে পাঞ্জাবীরা ছিল—

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি বলে, ওরা পাটনা চলে গেছে অনেক দিন হল।

ওঃ! ঠিক আছে। —বলে আর দাঁড়ায় না বিকাশ। খুব দমে যায় মনে মনে। নিহালের সঙ্গে হয়তো আর কোনদিন দেখাই হবে না।

সি. আই. টি. বিল্ডিং চত্বর থেকে থ্রি-এ বাস স্ট্যান্ডের দিকে যেতে যেতে ভাল করে লক্ষ্য করছিল সব। যেমন দেখে গিয়েছে প্রায় সে রকমই

আছে। একটু-আধটু এদিক-ওদিক হয়েছে বটে। যে বাড়ির ভিত্ তুলতে দেখে গেছে সে বাড়ি এখন মাথা উঁচু করে উঠছে। কদ্দূর উঠবে কে জানে! পথঘাট একই রকম। মোড়ে এসে রাস্তা পার হতে গিয়ে দেখলে ট্রাফিক পুলিশ। আগে ছিল মনে পড়ছে না। গাড়ি, বাসের যাতায়াত এসবও এ পথে বেশ বেড়েছে মনে হচ্ছে। রাস্তা পার হতে দু' মিনিট দাঁড়াতে হল। মোড়টায় নতুন কিছু দোকানপাট হয়েছে। মিষ্টির দোকান, ওষুধের দোকান, স্টেশনারি, কনফেক্শনারি, কাপড়-জামা, জুতো, নার্সিং হোম, পার্লোয়ার আর ফুটপাথে ফলের দোকান—এসব এলাকায় নতুন, বিকাশ দেখে যায় নি। ওদিকটাতেও হয়েছে, ফুটপাথ দখল করে ঢাউস বাক্সের মতো ক্যাসেটের দোকান, রোল-চাউ-এর দোকান। এলাকার লোকজনও বেড়েছে তুলনায় অনেক নিশ্চয়। এমুখো ওমুখো সব বাস স্টপেই লোক গিজগিজ করছে।

মোড়ে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে এধার ওধার দেখে নেয় বিকাশ। না, অচেনা নেই বিশেষ, খালি নতুন কিছু মাথা তুলছে। মন্দ কি! ভালই লাগছে। পরিবর্তনের একটা মৃদু হাওয়া লেগেছে. তাতে মন ভরে না উঠুক, খুশি হওয়া যায়। রাস্তা পার হয়ে এবার উত্তরমুখো হাঁটছে। কিছুটা গেলেই হারুর চায়ের স্টল পেয়ে যাবার কথা। কিন্তু কই? তাজ্জব লাগে। আর সবই আছে, নতুনও হয়েছে অনেক। কিন্তু হারুর স্টল নেই। চায়ের স্টলের ঘরে 'কেশায়ন' হেয়ার কাটিং সেলুন। বাইরে থেকে বেশ সাজানো-গোছানো মনে হচ্ছে। আর দশটা চুল কাটার দোকান যেমন হয়, এও তেমনি। সাইন বোর্ডটা বাহারে। 'কেশায়ন' নামটা বেশ সুন্দর করে লেখা। কাছে এসে বিকাশ থমকে গেল। এদিক ওদিক তাকিয়ে সেলুনের পাশের দোকানে এসে জিজ্ঞেস করলে, এখানে চায়ের স্টল ছিল, উঠে গেছে?

দোকানের মধ্যবয়েসী লোকটি একটু এগিয়ে এসে বিকাশকে দেখে চিনলে। বললে, আপনি কলকাতায় ছিলেন না? হারু তো তার ঘর বিক্রি করে চলে গেছে।

চলে গেছে? কেন?

কী সব ঝামেলায় আর রাখতে পারলে না।

এখন কোথায় থাকে জানেন?

তা তো জানি নে!

হতাশ মনে বিকাশ পেছন ফিরলে। তা হলে কি করা যায়! নয়টা বেজে গেছে। রাস্তায় এখন কাজের লোকজনের ভিড় বাড়ছে। এখন ট্যামার লেন যাওয়া যায় না। ওখানে বেলা এগারোটার আগে কাউকে পাওয়া

যাবে আশা করা যায় না। শংকরদের বাড়ি? কিন্তু যেতে যেতে সাড়ে নয়-দশ হয়ে যাবে। পাবে না শংকরকে। রবীনের বাড়ি? তাও একই কথা, পাবে না। অফিসে বেরিয়ে গেছে নিশ্চিত। উল্টো দিকে হাঁটা ধরলে। ভি. আই. পি. রোড ছেড়ে মানিকতলা মেন রোড ধরে এবার পশ্চিম মুখো।

হাঁটা তো ধরলে। গিয়ে কী দেখবে কে জানে! সুমিতার অবশ্য এ সময়ে বেরুবার কথা নয়। তবু, এক বছরে তারও ব্যতিক্রম হয়ে যায় নি তা আর ভাবা যায় না। এদিকটায় রাস্তার দু'ধারে অনেক নতুন বাড়ি উঠেছে। ভি. আই. পি. রোডের মতো এদিকটাতেও রাস্তাটা দু'ভাগ—আসা আর যাওয়ার চেড়া পথ। রেলব্রিজের কাছটায় এসে একটু ভাল করে দেখলে। এখানে আবার তিন ভাগ হয়ে গেছে রাস্তাটা। দেখে গিয়েছিল ভাগাভাগির কাজ চলছে। এখনও শেষ না হলেও, শিগগির হবে বোঝা যাচ্ছে। উল্টাডাঙ্গা থেকে নতুন ট্রাম লাইন হবে মানিকতলা পর্যন্ত, শুনে গিয়েছিল। ভি. আই. পি. রোডের বুকের মাঝখানে সে লাইন পাতার তোড়জোর নজরে আসে। এখানে রাস্তার মাঝখানটা দুদিক থেকে ক্রমশ নাবাল করে রেল ব্রিজের তলায় এনে সবচেয়ে নিচু করা হয়েছে। ট্রাম চলবে রেলের তলা দিয়ে, তারই প্রযুক্তি কৌশল। সভ্যতা তার প্রয়োজনে ভাঙ্গে, গড়ে, লোপাট করে, নতুন সৃজন করে—ভাবতেই হঠাৎ খেয়াল হল, আরে! এও তো সেই কবিতা লেখার সামিল। তবে, এ কবিতার কথা মানুষ ভাবে কেবল প্রয়োজনের মুখ চেয়ে। আর কবিতা? কে যেন বলেছেন না, হৃদয় ছেনে কবিতা, সেই রকম, কোন প্রয়োজনের মুখ চেয়ে নয়। কী জানি, সে জন্যেই হয়তো অনেকে কবিতা বোঝে না।

এই এক জ্বালা। কী ভাবতে যে কী ভেবে বসে! নিহালকে পেলে না। ভাবে নি পাবে না। কলকাতা এসে সে হল পয়লা ধাক্কা। দ্বিতীয়, ধাক্কা নয়, ঠেলা। হারুর কী হয়েছে কে জানে। কিন্তু ওর চায়ের স্টলের জায়গায় চুলকাটার সেলুন ওকে ঠেলে এ মুখো করলে, একেবারে সুমিতাদের বাড়ির দিকনির্দেশ! অদ্ভুত। সুমিতার সঙ্গে দেখা করতে যাবে ভেবেছিল বেশ কিছুটা সময় নিয়ে অন্য এক দিন। আজ এ সময়ে যেতে হবে মনে আসে নি। সময়ের কথা ভেবে যাচ্ছে। নিহাল, হারু দুজনের জন্যে বরাদ্দ সময়টা নষ্ট করা যায় না। সেটা কাজে লাগাতে পারলে এখন কিছুটা ভাল লাগবে। সুমিতাদের বাড়ি কাছে। তাই সেমুখো হওয়াটাই ঠিক, ভেবেছে বিকাশ। আশংকাও আছে। এখন সেটাই বেশি করে মনে আসছে। নিহালকে পেলে না, হারুকে না। যদি

সুমিতাকেও না পায় ?
ভাবতে ভাবতে রেলব্রিজ পেরিয়ে সুমিতাদের বস্তিবাড়ির গলিতে এসে পড়ল বিকাশ। তার পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবী, গায়ে গরম চাদর। গলিতে ঢুকে তার পোশাকের এ পরিবর্তনটা মনে এল। বলা যায় না, সুমিতার হয়তো এটাই প্রথমে নজরে আসবে। কমলাফুল টি এস্টেটে তার বাসার পোশাক এটা। কলকাতাতে আগে কখনো পায়জামা পরে নি, এমন গরম চাদর গায়ে দিয়ে বেরোয় নি। ফুলপ্যান্ট-পাঞ্জাবী, শীত-কালে সুয়েটার, বেশি শীত হলে রমা উমা বৌদি—হাতের কাছে যার র‍্যাপার পেতো গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়তো। তার জন্যে বেশ কথা শুনতে হতো। এখন সে সব মনে পড়ে বেশ লাগছে। উমাটা খুব মুখরা। বলতো, 'তুই তো বেশ, আমার র‍্যাপার গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলি। আমি যে শীতে মরবো তা ভেবেছিস ?' নির্বিকার ভাবে বিকাশ বলতো, 'ঘরে আর র‍্যাপার নেই কারো ?' 'আছে, থাকবে না কেন ? তাদের শীত নেই বুঝি।' এর পর জবাব খুঁজে পেত না বিকাশ। আলগোছে চুপচাপ সরে পরতো।
গলিপথে যেতে যেতে লক্ষ্য করলে, বস্তি এলাকাতে কিছুটা পরিবর্তন লেগেছে। আগে এতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল না। নালা-নর্দমার দুর্গন্ধ উঠছে না। বাড়িঘরে যেন কিছুটা শ্রীছাঁদ এসেছে। সুমিতাদের বাড়ির কাছাকাছি পথের ওপর দাঁড়িয়ে কয়েকটি ছেলে জটলা করছে। বিকাশ তাদের পাশ কাটিয়ে সুমিতাদের বাড়ির দরজা পেরোতে যাচ্ছে, তখন কানে এল, একজন বলছে, 'চিনিস ?' আর একজন বললে, 'না তো ! কে রে !' 'বিকাশদা। আসামে বড় চাকরি করে।' আর একজন বললে, 'যাচেছ কাদের বাড়ি ?' 'জানিস না ! সুমিদির সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে ভাব।' 'ওঃ ! তাই বল।' 'বিয়ে করবে ?'
বিভিন্ন স্বরের কথাগুলো কানে যেতেই বিকাশ একবার পেছন ফিরে ছেলেগুলোর দিকে তাকালে। না, তারা বিকাশের দিকে তাকিয়ে নেই। ইতিমধ্যে হয়তো তাদের গুলতানির বিষয়ও পালটে গেছে। দূরে পথ চলতি একটি বালিকাকে দেখে ওরা দুবার সিটি দিলে। বিকাশের মনে হল, এলাকাটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন লাগছে বাইরে, ভেতরে যেমন কে তেমনই আছে। সেই একই চরিত্র।
সুমিতাদের ঘরের দরজায় এসে বিকাশ সাড়া দিলে, মাসীমা !
রান্নাঘর থেকে স্বর উঠল, কে ?
সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল সুমিতার মা। বিকাশকে দেখে খুব খুশি হয়ে বললে, বিকাশ ! কবে এলে ? ভেতরে এসো !

সুমিতাও বেরিয়ে এসেছে। তাকে দেখে অবাক। বললে, আরে, তুই!
আয়, ভেতরে আয়। কবে এলি?
কাল বিকেলে।—বলে, সুমিতার পেছনে ভেতর-ঘরে ঢুকলে বিকাশ। সেখানে বিস্ময়। চৌকির ওপরে বসে আছে সুধা। সুধার কপালে বড় করে সিঁদুরের ফোঁটা। ডগডগে। সেটাই প্রথম নজরে পড়ল। বিকাশকে দেখে সুধা দুহাত জোড় করে নমস্কার করছে, তখন সুমিতা বিকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, চিনেছিস? সুধা।
চৌকির একটা ধার ঘেঁষে বসে পড়ল বিকাশ। সুধা বসেছে চৌকির একেবারে ওধারে। সুমিতা সুধার কাছাকাছি হয়ে মেঝেতে দাঁড়াল। বিকাশ জিজ্ঞেস করে সুধাকে, আপনারা ভাল আছেন তো? রবীন তো অফিসে গেছে এখন। নয়তো আপনাদের বাড়িই যেতাম—
সুধা মাথা দুলিয়ে বিকাশের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে। সুমিতা বলে, আমার চিঠি পেয়েছিস?
সুধাও বলে, আপনার বন্ধুও তো আপনাকে চিঠি লিখেছে বলেছিল, পেয়েছেন?
সবার চিঠি পেয়েছি। এখন এক এক করে জবাব দিয়ে যাবো। অতো চিঠি লেখা যায়?—বলে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলে বিকাশ।
বুঝেছি। যে অকর্মা সে অকর্মাই রয়ে গেছিস।—সুমিতা বলে।
তোর বুদ্ধিশুদ্ধির ওপরে আমার শ্রদ্ধাভক্তি ছিল না কোনদিনই। ভেবেছিলাম, হয়তো এত দিনে একটু হয়েছে। আমাকে হতাশ করলি।
—এবার সুধার দিকে তাকিয়ে বলে বিকাশ, বলুন, কাজের মানুষ হলে এখন এখানে আসবো কেন? আগে তো কাজকর্ম, পরে অন্যসব।
সুমিতার মা এ ঘরে এল। তাকে দেখে বিকাশ বলে, মেসো অফিসে?
হ্যাঁ বাবা। তার তো ন'টার মধ্যে বেরুতে হয়। ছেলেমেয়ে দুটোর সকালে স্কুল। এখনই এসে পড়বে হয়তো। দশটায় ছুটি। না আসা পর্যন্ত চিন্তা। সুমি সকালে তো বেরোয় না। তাই পারি। নয়তো, বয়েস হয়েছে না!—এবার সুমিতার দিকে তাকিয়ে বলে, এতদিন বাদে এল বিকাশ, একটু মিষ্টি নিয়ে আয়।
ওঃ বাবা! আজ না মাসীমা। আর একদিন হবে। কুড়ি-পঁচিশ দিন আছি। আরো দু'-একদিন তো আসবই।—বলে তাকায় সুমিতার দিকে।
সুমিতা বলে, আর একদিন যখন আসবি কিছু হবে না। কেবল আজই চা-মিষ্টি, কী বলো সুধা? রোজ রোজ তোকে কে খাওয়াবে!

খুব দ্রুত বেরিয়ে পড়ে সুমিতা। বিকাশকে বলার আর সুযোগই দিলে না।

সুমিতার মা জিজ্ঞেস করে, চা-বাগান ভাল লাগছে তো? জায়গা ভাল? কোন কষ্ট নেই তো?

বিকাশ বলে, আমার কিছু খারাপ লাগছে না।

তা হলে ওখানেই থেকে যাচ্ছ?

কোথায় আর যাবো মাসীমা! চাকরি-বাকরির যা অবস্থা। যা পেয়েছি তাই নিয়ে তুষ্ট থাকতে হবে।

মা-বাপ আত্মীয়-বন্ধু সব রইল কলকাতা, তুমি থাকবে সেই কোথায় আসামে, একা। ভাল লাগে না।

বিকাশ হাসে। বলে, কি করি বলুন?

সুধা বলে, কলকাতাতে হয় না কিছু?

হলেও এখন আর আমি পেছন ফিরব না।

চা-বাগানেই পড়ে থাকবেন?—খুব অবাক হয় সুধা।

বিকাশ বলে, যেভাবে বলছেন, ব্যাপার তো তা নয়। ওখানেও মানুষ আছে। রুজি-রোজগার আছে। মানুষের সমাজ আছে। সেখানে যাদের নিয়ে সব, তাদের একজন হতে না পারা তো অযোগ্যতা।

রান্নাঘর থেকে সুমিতার ডাক এল, মা, এসো।

সুমিতার মা বেরিয়ে গেল। সুধা জিজ্ঞেস করে, আমাদের বাড়ি কবে যাবেন?

সে ঠিক বলতে পারছি না। এর মধ্যে একদিন চলে যাব। আপনার সঙ্গে তো দেখা হয়ে গেল! রবীন জেনে যাবে আমি এসেছি। আমি যে কোন দিন যাব বলবেন। —বলে, সুধার দিকে তাকালে বিকাশ।

সুধা বলে, আমি তো বলবই। আজই বিকেলে আসুন না! নয়তো কাল সকালে। রবিবার আছে।

কথা না রাখতে পারলে যা খুশি মনে করবেন, সে বিপদে যাচ্ছি না। তবে যেতে পারি কালও। ঠিক নেই কিছু। —আর একবার সুধাকে ভাল করে দেখলে বিকাশ। তার মনে এখন সুমিতা আর রবীনের চিঠির বয়ান ভাসছে। চিঠি পড়ে সুধা সম্পর্কে যে ভাবনাটা এসেছিল, তার সঙ্গে সুধার অমিল তাকে ভেতরে ভেতরে বড় বিষণ্ণ করে ফেলে। সুধাকে যেমন দেখেছিল তেমন এখন নেই, থাকার কথাও নয়। কিন্তু অসাধারণ কিছু লাগছে না। সুধার রূপ আরো বেড়েছে। এক বছরেই সে যেন এক যুগ পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। রূপের সঙ্গে যা থাকলে মন ভরে যায়, সে লাবণ্য হারিয়েছে সুধা। মনে হচ্ছে এ রূপ কাছে টানে

না, দূরে ঠেলে দেয়। তা দিক, কিন্তু কি একটা গোলমেলে লাগছে। অবশ্য এখানে সুধার উপস্থিতিটা কল্পনার বাইরে। তাই হয়তো সঠিক সব কিছু ধরতে পারছে না। জিজ্ঞেস করলে, এখন সুমির সঙ্গে বুঝি খুব ভাব আপনার?
তা বলতে পারেন। তবে, বিনা স্বার্থে নয়। সুমিদির কাছে গিটার বাজনা শিখছি। —হেসে বলে সুধা।
গিটার বুঝি ভাল লাগে আপনার?
কি জানি! ভাল লাগালাগির জন্যে নয়। একটা কিছু নিয়ে থাকতে চাই—যাতে মনে হবে, হ্যাঁ কিছু করছি।
সে কি! ঘর-সংসার—তার মাঝে, কিছু করছেন না?
না।
না! বলেন কি? মেয়েরা তো বিয়ে-থার পরে ঘর-সংসার নিয়ে থাকতেই ভালবাসে।
আপনারা তা ভাবেন। মেয়েরা কখনও ভেবে দেখার সুযোগ পায় না। প্রেম-ভালবাসা, বিয়ে, ঘর-সংসার, ছেলেপুলে এসবের মধ্যে কেমন হারিয়ে যায় সবাই। আমি হারিয়ে যেতে চাচ্ছি না।
সুধার এসব কথার উত্তরে অনেক কিছু বলা যায়। কিন্তু বিকাশ কিছু বললে না। তার ভাবনাটা ঘুরপাক খাচ্ছে। সুধাকে ঠিক বুঝতে পারছে না। হয়তো রবীনও বোঝে নি, সুমিতাও বোঝে নি। বিকাশ বলে, মেয়েরা নিজস্বতায় কিছু হয়ে উঠুক সে তো আজকের মানুষের বড় চিন্তা। অবলম্বন যাই হোক।
আমিও তাই ভাবি। সুমিদিকে দেখে সে বোধ হয়েছে। গিটারটা উপলক্ষ মাত্র। ঐ উপলক্ষে নিজে কিছু হয়ে ওঠার জোর বাড়ে—এরকমই মনে হয় আমার। আপনি নিশ্চয় আমার কথা সব জানেন। আপনার বন্ধুর অপরিণত বুদ্ধির কথাও জানেন হয়তো। অতো সব ঘটনা থেকে আমিও শিক্ষা নিয়েছি। এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় নি যে, একমাত্র মেয়ে বলেই আমাকে আমার স্বভাব, প্রবণতা, নিজস্বতা থেকে সরিয়ে এনে একটা স্বার্থপর প্রচলনের আশ্রয় নিতে অদৃশ্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি তা মানবো কেন?—এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে, সুধা বেশ বুঝলে, তার ভেতরে একটা উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। সেটা ঢাকতেই সে হাসলে। হাসতে হাসতে ফের বললে, আমি এত মুখর ছিলাম না। এখন হয়েছি। হয়তো আরো হতে হবে।
এবার ভয়ানক দুর্বোধ্য লাগছে সুধাকে। ভেতরে একটা অস্বস্তিও লাগছে। মনে হচ্ছে সুধা যেন কী এক অনড় পাথরে চাড়া দিতে চাইছে। নড়াতে

পারবে কি ?

দুখানা প্লেটে করে মিষ্টি নিয়ে এ ঘরে এল সুমিতা। হাত বাড়িয়ে একটা প্লেট নিয়ে বিকাশ বললে, এক বছর বাদে এসব খাবো, জানিস ? ওখানে এসব পাওয়া যায় না।

সে কি রে !—সুমিতা হেসে ওঠে।

বিকাশ বলে, হ্যাঁ ! চা-বাগান তো। মিষ্টি কে খাবে ! শহরে সবই মেলে। শহর থেকে দূরে চা-বাগান।

সুমিতা হাতের অন্য প্লেটটা সুধার দিকে বাড়াতেই সুধা বলে, সুমিদি, আমি না। কিছু মনে করো না, মিষ্টি ভাল লাগে না।

ঝালের ভক্ত ?—সুধার দিকে তাকিয়ে বলে, একটা রসগোল্লা মুখে পুরলে বিকাশ।

সুমিতা ছাড়বে না। সুধার হাতে মিষ্টির প্লেট জোর করে ধরিয়ে দিয়ে ছুটল রান্নাঘরে চা আনতে। তক্ষুণি বিকাশের মনে পড়ে গেল, জনার্দনবাবুর দেওয়া চায়ের প্যাকেটটা খোলা হয় নি। ভেবেছিল কিছু চা-উপহার হাতে করে যাবে একেক জনের বাড়ি। শুরুতেই সে ভাবনা পণ্ড।

সুমিতা চা নিয়ে এল। বিকাশ বললে, সুমি, চা-বাগানের এক ভদ্রলোক কিছু চা দিয়েছে কলকাতাতে আমার আত্মীয়-বন্ধুদের বিতরণের জন্যে। সে চায়ের প্যাকেট খোলাই হয় নি। ভেবেছিলাম, তোদের বাড়ি আসার সময় কিছুটা নিয়ে আসব, হল না।

ভালই হল। দেবার ইচ্ছে থাকলে আর একদিন যে আসবি তা নিশ্চিত হয়ে রইল।—বলে হাসে সুমিতা।

না এলে ?—সুধা জিজ্ঞেস করে।

সুমির থিওরি অনুসারে প্রমাণ হয়ে যাবে আমার চা দেবার ইচ্ছে নেই। তাই তো ! —সুমিতার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে বিকাশ।

মিষ্টির প্লেটটা সুমিতার দিকে ধরে সুধা বলে, তুমি একটু নাও সুমিদি। সুমিতা আপত্তি করলে না। একটা মিষ্টি মুখে পুরে বললে, দ্যাখ, সুধা একা খাচ্ছে না। আর তুই গপ্‌গপ্‌ করে সাবার করে দিলি সব।

আমি তো ভেবেছি আমাকেই দিয়েছিস। এতে যে তোরও ভাগ আছে বুঝি নি। আর তোর চেয়ে কে বেশি জানে যে, আমার বুদ্ধি কোন কালেই প্রখর নয়, ভোঁতা। তা' বললেই পারতিস, আমাকে একটু দিস। —বিকাশ গম্ভীর মুখে মিষ্টি চিবুতে থাকে।

সুমিতা আর সুধা হেসে ওঠে। মিষ্টি শেষ করে চায়ে চুমুক দেয় বিকাশ। সুধা আর সুমিতার চা খাওয়া হয়ে গেছে। সুধা তার হাত-

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলে।
এবার আমি যাবো সুমিদি। কাল কিন্তু আসছি না। —বলে উঠে পড়ে সুধা। বিকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, কবে যাবেন আমাদের বাড়ি কিছু বললেন না যে ! চলি।
সুধা বেরিয়ে গেল। বিকাশ বললে, এবার আমিও উঠবো রে সুমি। সাড়ে দশটা প্রায় হয়ে গেছে। হ্যাঁ রে, সুধা রোজ আসে গিটার শিখতে ?
রোজ না। যেদিন ইচ্ছে হয় সময় পায়, আসে। আমিও যাই মাঝে মাঝে। তবে, মেয়েটা একরোখা। ঠিক শিখবে। —বলে, বিকাশকে জিজ্ঞেস করে, চা-বাগানেই থেকে যাবি ?
কলকাতাতে তো থাকতে পারলাম না। চা-বাগানেও না পারলে কয়লা-খনির দিকে ছুটবো। একটা স্থির জায়গা তো চাই ! কি বলিস ? —বলে উঠে পড়ে বিকাশ।
তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে যে ! কবে আসবি আবার ?
জানি না। আসবো।
বেরিয়ে পড়ে বিকাশ। বেরুনোর মুখে বাইরের দরজায় সুমিতার ছোট ভাই-বোনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওরা স্কুল থেকে ফিরছে। তাকে দেখে খুব খুশি। জিজ্ঞেস করে, কবে এসেছ বিকাশদা ? আবার আসবে না ?
হ্যাঁ রে, দু'চার দিন বাদেই আসবো আবার। পড়াশোনা হচ্ছে তো ভাল ?
হ্যাঁ ! —দু'জনেই এক সঙ্গে মাথা দোলালে।

চার

'হালচাল' পত্রিকার অফিস থেকে বেরিয়ে খেয়াল গেল বাসে না, আজ হেঁটেই বাড়ি ফিরবে। ট্যামার লেন থেকে হ্যারিসন রোড ধরে আমহার্স্ট স্ট্রিট ক্রশিং-এ এসে মন স্থির করতে পারছিল না আমহার্স্ট স্ট্রিট ধরে মানিকতলা হয়ে, না হ্যারিসন রোড ধরে শেয়ালদা ঘুরে সার্কুলার রোড ধরে রাজাবাজার হয়ে বাড়ির পথ ধরবে।
এদিক ওদিক যেদিকে তাকাচ্ছে সব একই রকম আছে। দোকান-পাটের সাজগোজ কিছু বেড়েছে। কিন্তু বাড়িঘর রাস্তাঘাট যে-কে সে-ই যেমন ছিল। মানুষজনের চলাফেরা একটু বেড়েছে ঠিক। লোক বেড়েছে। এসব দিকে এক বছরে বিশেষ দাগ পড়েছে মনে হচ্ছে না। তুলনায় তাদের কাঁকুড়গাছি মনে হচ্ছে ফন্ ফন্ করে বাড়ছে মাচার লাউডগার মতো। কিন্তু খাস কলকাতার লোকেরা কাঁকুড়গাছি বা ঐ রকম আশপাশের

অঞ্চলগুলোকে এখনও কলকাতার বাইরের এলাকা ভাবে। তা বিকাশ জানে। কেন ওরকম ভাবে তারা সে সব নিয়ে কখনো কিছু মনে হয় নি। আজ মনে হচ্ছে আদি কলকাতাকে ছাপিয়ে যে নয়া কলকাতা তার নবীনত্ব অপরিচিত। সহজে না যায় বোঝা, না যায় গ্রহণ করা। প্রাচীন আর নবীনের চিরাচরিত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। এখন এক বছর পরে কলকাতার দিকে তাকিয়ে তার মন দর্শকের ভূমিকায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। আজন্ম কলকাতার মানুষ সে। কলকাতার জন্যে টান, মোহ, আবেগ, মমতা সব আছে তার। তবু, কমলাফুল চা-বাগান তাকে সরাসরি প্রত্যক্ষ এমন একটা চেতনা দিয়েছে যাতে আজ আর কলকাতা ছাড়া আর কিছু নেই ভাবটা একেবারেই আসে না। মনে হচ্ছে, কলকাতা আছে, কমলাফুল টি এস্টেটও আছে। একমাত্র একামাত্র কোন কিছু নেই কোথাও। তা ভাবাই ভুল।
আমহার্স্ট স্ট্রিটই ধরলে বিকাশ। এ রাস্তাটা ভাল লাগে। লোকজন, গাড়ি-ট্যাক্সির তত ভিড়-ভাট্টা নেই। দু'পাশের ফুটপাথে কিছুটা পর পর একটা দুটো গাছ। অনেকটা নিরিবিলি। এ পথে কত হেঁটেছে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে। সে তো ইতিহাস। সিটি কলেজে পড়তো। বাড়ি থেকে হেঁটে এসে কলেজে, আবার কলেজ থেকে বইপাড়া, কফি হাউস—তাও হেঁটে এই আমহার্স্ট স্ট্রিটের ফুটপাথ ধরে।
'হালচাল' পত্রিকার পরিকল্পনা সে যে বছর বি-এ পরীক্ষা দেবে সে বছর। তার সঙ্গে পড়তো ভবেন্দু। সেই ভবেন্দুই মধ্যমণি। বিকাশকে টানলে। কারণ বিকাশ কবিতা লেখে। ভবেন্দু প্রবন্ধকার। কলেজের ম্যাগাজিনে ভাল প্রবন্ধ লিখেছিল কবিতা নিয়ে। কবিতাও পড়ে, ভালবাসে। কিন্তু লিখে না। ওর ইচ্ছে একটা ভাল লিট্‌ল ম্যাগাজিন বার করবে। তাতে লিখবে যারা নতুন, যারা নতুন চিন্তাভাবনা নতুন ভাবে ফোটাতে পারে। তা কবিতাতে হোক, প্রবন্ধে হোক বা গল্পে হোক—যে ভাবেই হোক, তাদের পত্রিকা তা নেবে, তুলে ধরবে পাঠকের চোখের ওপর। কেন কে জানে, বিকাশ তাতে খুব একটা উৎসাহ পায় নি। তবু কিছু দিন সঙ্গে ছিল। ভবেন্দু লিখতে বলতো। বিকাশ লেখা দিতে ভর্সা পেত না। যদি না ছাপে ?
ভবেন্দুরা কাগজ নিয়ে মেতে উঠল। অনেকে জুটে গেল ওদের সঙ্গে। ভবেন্দুদের ট্যামার লেনের বাড়ির নীচের তলায় বসার ঘরে 'হালচাল'-এর অফিস হল। সেখানে রোজ বিকেলে হবু কবি-সাহিত্যিকদের আড্ডা। প্রতি শনিবার নিয়মিত আলোচনা সভা। বিকাশ যেত মাঝে মাঝে। কখনো ভাল লাগত, কখনো লাগত না। ভবেন্দু পত্রিকা দাঁড় করেছে। এখন নিয়মিত বেরুচ্ছে, বিজ্ঞাপন পাচ্ছে, লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সমাজে

তার এখন কৌলিন্য। অতোসব বোঝে নি বিকাশ আগে। কমলাফুল টি এস্টেটে তাকে কাগজ পাঠিয়েছে নিহাল। সে যে কলকাতা ছাড়া, তা ভবেন্দু জানতোই না। নিহালই সে খবর দিয়েছে তাকে। তার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়েই ভবেন্দু তাকে পত্রিকা পাঠায়।

বিকাশকে দেখে ভবেন্দু খুব আগ্রহ নিয়ে বললে, তুমি তো ভাল কবিতা লেখ। পাঠাও না কেন? চিঠিপত্র লিখে যোগাযোগটা তো রাখা যায়।

বিকাশ হেসেছে। বলেছে, তা যায়। ইচ্ছে হয় না তাও নয়। কিন্তু—

কিন্তু টিন্তু নয়, স্বভাব। কবিতা যারা লেখে তাদের ঐ স্বভাবই তাদের নষ্ট করে। হাঁ! অনেককেই দেখছি তো। বড় গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চায়। আরে, তোমাদের জন্যেই কাগজ করছি তো তোমরাই সামনে একপা এগুচ্ছ তো পেছনে তিন পা জুড়ে থাকবে। তাতে কিছু হয়? তুমি তো এখন চাকরি করছো। নতুন জায়গা। নতুন সৃষ্টির কথা তো তোমাকে ভাবতে হবে! কেবল কলকাতায় হবে না। পৃথিবীটা ছোট না। কলকাতার বাইরে থেকেই এখন আমরা নতুন কিছু পেতে চাই।—বেশ একখানা বক্তৃতা শেষ করে ভবেন্দু বলে, ক'দিন থাকবে? লেখাটেকা এনেছ কিছু?

ভবেন্দুকে সব বললে। এক বছরে যে ক'টা কবিতা লিখেছে তা নিয়ে একটা ছোট কবিতার বই ছাপাতে চায়। পনেরো-বিশ দিনের মধ্যে হলে সে নিয়ে যেতে পারে। ভবেন্দু কি পারবে ব্যবস্থা করতে?

ভবেন্দু উৎসাহ দেখালে। বললে, ক' ফর্মা হবে? ক'টা কবিতা?

ফর্মা আড়াই ধরো। পঁয়ত্রিশটা কবিতা।

বইয়ের নাম?

'ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ'।—বলে ভবেন্দুর মুখের দিকে তাকালে বিকাশ। লক্ষ্য করলে তার কোনও ভাবান্তর হচ্ছে কিনা। না, তেমন কিছু মনে হয় নি।

ভবেন্দু বললে, নামটা বেশ তো! এমন নাম তো ভাবা যায় না। তা টাকা-পয়সা এনেছ?

কত লাগতে পারে?

হাজার খানেক তো লেগে যাবে। ছাপবে কত?

তুমি বলো।

আড়াইশোর বেশি কী দরকার? সবাই তাই ছাপে। আমাদের হালচাল প্রকাশনার নামেই হবে। তুমি জানো না হয়তো। পরীক্ষামূলক বইপত্র প্রকাশও করছি আমরা। ইচ্ছে, ধীরে-সুস্থে একটা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান করবো। সোমবার দিয়ে যাও সব। তুমি যাচ্ছো কবে?

দশ জানুয়ারী, নয়তো এগারো তারিখ যেতেই হবে।

হয়ে যাবে।
বিকাশ বেশ সংকোচের সঙ্গে বলে, স্ক্রিপ্ট আমি নিয়ে এসেছি। তুমি যদি একবার দেখ, ভাল হয়। ছাপার মতো কিনা তা তুমি ভাল বুঝবে।
ভবেন্দু খুশি হল, দেখবে কথাও দিল। স্ক্রিপ্ট ভবেন্দুর হাতে দিয়ে বিকাশ বললে, সোমবার আসবো?
হ্যাঁ! আমি সব দেখে রাখব। টাকা-পয়সাও চাই সোমবার।
সব?
নাঃ। কিছু এনো। কাগজের জন্যে লাগবে।
সোমবার কখন?
ভবেন্দু বললে, আমি এগারোটায় থাকব। দুপুরে থাকব না। বিকেলে চারটের পরে পাবে।
বিকাশ উঠবে, ভবেন্দু বললে, আরে বসো। চা খাবে না? এক্ষুণি এসে যাবে।
আরও কয়েকজন বসে ছিল ভবেন্দুর টেবিলের এপাশে ওপাশে। এবার তাদের সঙ্গে বিকাশের পরিচয় করিয়ে দিলে, বিকাশ আচার্য, কবি। আসামের চা-বাগানের চাকুরে। এর কবিতা তোমরা পড়েছ।
সবাই নমস্কার জানালে। বিকাশ তাকিয়ে দেখলে, ওরা সবাই তার বা ভবেন্দুর কাছে ছেলে-ছোকরা ছাড়া কিছু না। সবাই কিছু না কিছু লেখে। কাজেই সগোত্র। ভাবতে গিয়ে বেশ মজা লাগে। ভবেন্দুর দৌলতে বিকাশও কবি হয়ে যাচ্ছে।
চা এল, চা খেল, তারপর বেরুল। বেরিয়ে মনে হয়েছিল কফি হাউসটা একবার দেখে এলে হয়। কিন্তু একা? পারলে ভবেন্দুকে নিয়েই যাবে একদিন।
হাঁটতে হাঁটতে কেশব সেন স্ট্রিট ছাড়িয়ে সিটি কলেজের সামনে আসছে যখন, ছাত্রজীবনটা এগিয়ে এসে তার সঙ্গে হ্যান্ড-শেক করছে যেন। কলেজ বাড়ির নয়া কোনও পরিবর্তন হয় নি। কেবল হোস্টেল ঘেঁষে ফুটপাথের বাসিন্দাদের আস্তানা আগে ছিল মনে পড়ছে না। এটা বোধ হয় নতুন। তা হোক, কিন্তু চার বছরের কলেজ জীবন তার মনের ওপর হুড়মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। ইভ্‌নিং কলেজের ছাত্র-ছাত্রী দেখা যাচ্ছে গেটের সামনে, কলেজ বাড়ির দোতলার বারান্দায়। ঢুকে পড়বে নাকি? দেখে নেবে, ভেতরটা সাবেকী আছে কিনা! কেউ চিনবে না। সে হয়তো দু'-একজন অধ্যাপক, অফিসকর্মী, বেয়ারারকে চিনবে। তাকে কেউ চিনবে আশা করা যায় না।

ট্যামার লেন থেকে এতদূর হাঁটিতে হাঁটিতে এল, একটা পরিচিত মুখ সে দেখতে পেল না। তার দিকে কেউ ফিরে তাকাল না। বিষম এ অপরিচয়, ভীষণ এ একাকীত্ব। এ শহরে এত মানুষ। গায়ে গা ঠেকিয়ে চলাফেরা করতে হয়। কেউ কাউকে চেনে না, কারও দিকে কেউ তাকায় না, সব একা। এই পথঘাট, গাছপালা, গাড়িঘোড়া, বাড়িঘর, পার্ক-ময়দান, অলিগলি মানুষ তার একাকীত্ব মোচনের উপলক্ষে ভাঙছে-গড়ছে, দুমড়ে মুচড়ে একাকার করছে, গোছগাছ করে ভরে তুলছে, ক্ষয় করে সঞ্চয়ের দিকে হাত বাড়াছে—এ এক অভাবিত বিচ্ছিন্নতা। এ থেকে যেন আর মুক্তি নেই, মুক্ত হতে পারা যায় না।

তার চেয়ে বৌদির গল্পে সকলের সঙ্গে একটা অদেখা যোগসূত্রের ভাবনা এসে যায়। তখন ঠিক একা বা বিচ্ছিন্ন মনে হয় না নিজেকে। কোন্‌টা ঠিক?

সুস্মিতাদের বাড়ি থেকে যখন ফিরেছে, বেলা সাড়ে এগারো। বৌদি বললে, কী ব্যাপার? এত তাড়াতাড়ি! আমরা তো ভেবেছি এতদিন বাদে, কলকাতা চষে বেড়াবে।

আমি চাইলেই হবে? কলকাতাতে এখন আমি ভূমিহীন চাষি।

ফিক্ করে হেসে বৌদি বললে, তোমার নয়া জমিদারির খবর তো কিছু বলছো না। ঐ যে, দীপেনবাবুর চিঠি পেয়ে আমরা খুব ধাঁধায় পড়েছিলাম।

কেন? ধাঁধা কিসের?

আমরা ভেবেছি সেই ডাক্তার মেয়ের বাবা দীপেনবাবু। বাবা বললে, বোধ হয় না। লিখেছে না, মেয়ে বি. এ. পড়ছে। এ অন্য মেয়ে। আমাদের তো আরো সমস্যা। আমরা ভাবলাম তবে ব্যাপারটা কি? ডাক্তারের কি হল!

ঐ সব ভাবো। সময় বেশ কাটবে।

তা তুমি সব বলবে তো!

কি বলবো? হেনা কে? দীপেনবাবুর মেয়ে কে?

বলবে না? আমরা বুঝবো কী করে?

বাঃ! তুমি যে খুকিটি হয়ে গেলে। হেনা আমাদের চা-বাগানের এক বাবুর মেয়ে। এবার ডাক্তার হয়ে বেরুবে। দীপেনবাবু আমাদের বড়বাবু, দণ্ড-মুণ্ডের প্রতিনিধি। তার মেয়ে সোনালী। একই মেয়ে। এক ছেলে। সোনালীর কথাই লিখেছিল। কাল বাবা দীপেনবাবুর চিঠি আর বাবার দেওয়া জবাব, সব আমাকে দেখিয়েছে। বাবা ঠিক লিখেছে।

তোমার দাদাকে বলেছ বিয়ে করবে না। কেন ?
দূর ! বিয়ে করার মতো কাউকে পাচ্ছি না যে !
ওঃ ! এতগুলো মেয়ে—কাউকে তোমার পছন্দ না ? সুস্মিতা ? সুস্মিতা-কে—
সুস্মিতা আমাকে বিয়ে করবে কেন ? ও তো বিয়েই করবে না বলেছে।
তুমি বিয়ের কথা বলেছিলে ?
না ! ওর মা-বাবা চেয়েছিল। ও নাকচ করে দিয়েছে।
সে জন্যে তুমিও তোমার বিয়ে নাকচ করছো !
তোমাদের মেয়েদের ঐ দোষ। কিছু বুঝবে না, খালি ঘুরেফিরে এক চিন্তা, এক কথা আওড়াবে।
যাক ! বুঝেছি। তোমরা ছেলেরা প্যাঁচ পছন্দ করো, প্যাঁচ লাগাবে। আমাদের অতো সয় না। যা বোঝার সোজাসুজি বুঝবো।
সোজাসুজি বুঝতে গিয়েই তো যতো প্যাঁচে ফেলে দাও। নইলে—
কথা শেষ করতে পারলে না বিকাশ। পাশের ফ্ল্যাটের এক মহিলা এসে ঢুকলে। বিকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, কাল এসেছ শুনলাম। ভাল আছো ?
বিকাশ মাসী বলে ডাকতো। বললে, হ্যাঁ মাসী।
শুনেছি ভাল চাকরি হয়েছে। এবার মাকে নিয়ে যাও। থাকবে তোমার কাছে।
মিনা বলে, বাবাকে এখানে ফেলে মা যাবে ?
তা ঠিক। সব দায় কি তোমার ঘাড়ে ফেলা যায় ! রমা উমার বিয়েটা হলে তবু কথা ছিল।
বিকাশ বলে, রমা উমাকে বিদায় করতে পারলেই মাকে নিয়ে যাব মাসী।
হ্যাঁ, তখন তুমিও বে-থা করে সংসার গুছিয়ে নিতে পারবে।
যাঃ বাবা। বিয়ে-থা ছাড়া এরা আর কিছু ভাবে না নাকি ! ছেলে-মেয়ে বড় হলেই যেন একমাত্র কর্তব্য বিয়ে। কিন্তু কী করা যাবে। মায়ের বয়েসী মহিলা। তাকে নিজের কথা বলে বোঝানো যাবে না। বৌদিই যখন বোঝে না। হেনা এসেছিল, ভেবে বসে আছে বুঝি তার সঙ্গে প্রেম-ট্রেম হয়ে আছে। দীপেনবাবু তার মেয়ের কথা লিখেছে, ভাবছে হয়তো সোনালীর সঙ্গেও একটা 'কিন্তু' ব্যাপার ঘটে গেছে। অথচ কলকাতাতে এতকাল তার কত মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা দেখেছে এরা। সুস্মিতার সঙ্গে তো মাখামাখিটা ছেলেবেলা থেকে। এমন কিছু কি ঘটেছে যাতে মনে হতে পারে এদের কাউকে বিয়ে না করলে সে মরে যাবে ? তবে হেনা বা সোনালীকে নিয়ে কিসের অতো কৌতূহল ?

মহিলার দিকে তাকিয়ে হাসলে বিকাশ। কিছু বলতে ইচ্ছে হল না। কি বুঝে মহিলাই বললে, এখন যাই। সময় করে আমাদের ঘরে এসো একবার।
হ্যাঁ মাসী, নিশ্চয়। —বিকাশ বাঁচলে।
হাঁটতে হাঁটতে এসব কথা মনে করে বেশ লাগছে এখন। সে যদি এতই একা, এতই বিচ্ছিন্ন তা হলে তো এই মানুষগুলোর কথাবার্তা সান্নিধ্য এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু পারে কই!
সিটি কলেজ ছাড়িয়ে ঋষিকেশ পার্কের পাশ দিয়ে বাদুড়বাগানে ঢুকে লক্ষ্য করলে, কিছুই পাল্টায় নি। যে-কে সে-ই সব। সময়ের ধুলো গায়ে মেখে পুরোনো কলকাতা জীর্ণ হচ্ছে। অন্ধকার হয়ে আছে ওপাশটা। লোডশেডিং। এটা তবে আছে এখনও! বেশ একটু জোরে হেঁটে এসে সার্কুলার রোডে পড়ল। কিছুটা ক্লান্ত লাগছে। আর হাঁটবে না ভাবলে। বাসস্টপে এসে দাঁড়ালে। যত বাস আসছে ভেতরে একেবারে ঠাসা। দরজায় ঝুলে নির্বিকার কলকাতার যাত্রীমুখ একই আছে। এও পুরোনো চিত্র। বিকাশ আর দাঁড়ালে না। যদি বাসে যায় তো মানিকতলা গিয়ে সাট্‌ল বাস ধরবে। অবশ্য ঠিক জানে না, এক বছরে সাট্‌ল বাসের কোনও বিবর্তন ঘটেছে কিনা।
মানিকতলা পর্যন্ত হেঁটে এসে দেখলে সাট্‌ল বাস ঠিক আগের মতই আছে। নতুনত্ব কিছু নেই। স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে একটা। কিন্তু ভেতরে সেই সাবেক চিত্র—দাঁড়ানোর জায়গাও হয়তো মিলবে না। তবু গিয়ে উঠলে সাট্‌ল বাসে। এক বছর বাদে কলকাতার বাসের ভিড়ের স্বাদটা নতুন করে চেখে নেওয়া, মন্দ কি! বাসে উঠে একটু সুবিধে মত দাঁড়াতে যাবে, না, ঠেলাঠেলি। বিকাশ বুঝলে, কলকাতার ধাত তার জানা থাকলেও এখন সইবে না। এক বছরে অভ্যাস পালটেছে। চা-বাগানের মানুষেরা তো এসব কল্পনাই করতে পারবে না। ভিড়ের মাঝে একঠায় দাঁড়িয়ে তার ঘাম ছুটছে। এটাও তার অজানা কিছু নয়! কিন্তু এমন শীতে ঘামের অস্বস্তিটা এখন যেন দুঃসহ লাগছে। তবে কি সে কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে?
বাস ছেড়েছে। কিন্তু চিন্তাটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। সাত-আট মিনিটের মধ্যে কাঁকুড়গাছি চলে এল। বাস থেকে নেমে কলকাতার রাত অনুভূতিটা তাকে সজাগ করে তুলল। মনে হল, ধর্মতলা বা কলেজ স্ট্রিট এলাকা অথবা শ্যামবাজার এলাকাটা একটু দেখে এলে বোধ হয় ভাল হত। যদিও মনে হচ্ছে, দেখার আর এমন কি নতুন কিছু হবে! তবুও এক বছরের ফাঁকটা হয়তো তাতে কিছুটা ভরাট হতো।

বাড়ি এসে দেখলে বাবা আর দাদা দু'জনেই আছে। শনিবার দু'জনেরই হাফ-ডে অফিস। কিন্তু সন্ধ্যার আগে কেউ বাড়ি আসে না। বাবা অফিস থেকে বেরিয়ে তার চিরাচরিত হাট-বাজার টুকিটাকি কেনাকাটা সেরে ফিরতে সন্ধ্যা করবেই। দাদা হয় সিনেমা, নয় বন্ধুর বাড়ি, না হয়তো এদিক-সেদিক কিছুটা ঘুরেফিরে বাড়ি ফিরবে। এসব তার জানা। কিন্তু আজ তা হয় নি। দু'জনেই সে অভ্যাস আজ বাতিল করেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছে। কারণটা বিকাশ বুঝলে। সেই জন্যেই তার মনে হল সে-ই দেরি করে এসেছে। রাত হয়েছে। তার অপেক্ষায় বসে আছে বাবা দাদা, আর সবাই।

বিকাশকে দেখে বাবা বললে, কোথায় গেছিলি ? তোর জন্যে বসে আছি।

কেন ?

এমনি। কথাবার্তা আছে।

হ্যাঁ রে ! চা এনেছিস নাকি, তোদের বাগানের চা ?

বিকাশ বললে, হ্যাঁ।

দাদা বললে, প্যাকেটটা কই ? আমি খুলি।

দাদা উঠে গেল চায়ের প্যাকেট খুলতে। বাবা বললে, কিছুটা আলাদা করে রাখবি। দু'চার জনকে তো দিতে হবে।

বিকাশের খেয়াল হল, টাকাটা বাবাকে দেওয়া হয় নি। সুটকেস খুলে, আলাদা করা টাকার বাণ্ডিলটা বাবাকে দিয়ে বললে, দু'হাজার আছে। তুমি খরচ করবে।

তোর খরচার টাকা আছে তো !—বিকাশের দিকে তাকায় বাবা। বলে, আমি আর কী খরচা করবো। তোর মাকে দে। রেখে দিক।

বিকাশ মাকে ডেকে টাকাটা দিয়ে বাবাকে বললে, আমার খরচার টাকা আছে। দরকার হলে চেয়ে নেবো কিছু। এখন তো থাক।

টাকাটা দিয়ে অনেকটা হাল্কা হল বিকাশ। ভালও লাগছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভুল হয়েছে মনে হল। ভেবে রেখেছিল হালচাল পত্রিকার গ্রাহক হয়ে আসবে। মির্জাকেও এক বছরের গ্রাহক করে দেবে। ভবেন্দুর সঙ্গে কথা বলার সময় ওসব মনে আসে নি। আর এই সূত্রে কমলাফুল চা-বাগানের অনেকের ফরমাসের লিস্টের কথা মনে এল। টাকাও দিয়ে দিয়েছে সবাই। মির্জার বই, হেরম্ববাবুর খাম্বিরা তামাক, অরুণবাবুর গরম শাল, সত্যেনবাবুর বানারসী জর্দা, ডাক্তারবাবুর ভাল তোয়ালে হাফডজন। আর কারো কোনও ফরমাস নেই। মনে মনে ঠিক করলে, এ কাজগুলো সোমবারই সেরে ফেলবে যখন ট্যামার লেনে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে

নিজের কথাও মনে হল। তার নিজেরও তো কয়েকটা জিনিস কিনে নিতে হবে। কিছু বইপত্র, কিছু জামা-কাপড় এসব তো তার দরকার। ভাবতে ভাবতে টাকা-পয়সা সব গুনেগেঁথে ঠিক করে রাখলে। দাদা বলেছে এয়ার টিকিট কেটে আনবে। টিকিটের টাকাটা দিয়ে দিলে দাদাকে।
বাবা বললে, মাসখানেক আগে রমাকে দেখে গেছিল। আজ অফিসে ছেলের দাদা বলে গেছে তাদের পছন্দ। এখন আমাদের গিয়ে কথাবার্তা বলতে হবে। তুই আর প্রকাশ কাল যা। কি বলে শুনে আয়।
ছেলে পছন্দ হয়েছে তোমাদের ?
ছেলে ভাল। রমার সঙ্গে মানাবে। রেলে চাকরি। ক্লার্ক। গ্র্যাজুয়েট। দু'ভাই, মা, বাবা। এই সংসার। পাত্রই বড়। ছোট ভাইও চাকুরে। বেসরকারী. কোথায় যেন কাজ করে। বাবা রিটায়ার করেছে হালে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকুরে ছিল। সোনারপুরে নিজেদের বাড়ি। দেশ ছিল যশোরে। তুই যা। দেখে আয়।
সোনারপুরে ?
হ্যাঁ। সকালের দিকে চলে যাবি। ছেলেকেও দেখে আসতে পারবি।
বিকাশ বললে, ঠিক আছে।

পাঁচ

বিকাশ ভেবেছিল এক মাস ছুটি মানে অঢেল সময়। এক বছরের কলকাতা অদর্শন সে চুটিয়ে উসুল করে নেবে। কিন্তু হল না। দেখতে দেখতে সময় হাতছাড়া, কাজে লাগল না। দশ তারিখের টিকিট কাটা হয়েছে কবে। দাদা দেরি করে নি। নির্দিষ্ট দিনেই কেটে এনেছে। আর সব এখনও আগোছাল। মনের দিক থেকে তো বটেই, কাজের দিক থেকেও। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বাসনা-বিদ্বেষ সব যেন ওলটপালট হয়ে গেছে। ভবেন্দু কথা দিয়েছে, নয় তারিখে তার কবিতার বই হাতে তুলে দেবেই। পাঁচশো টাকা দিয়েছে। আরো পাঁচ-ছয়শো দিতে হবে। রবীনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সুধার কাছে তার কথা শুনে সেই রবিবারই সকালে এসেছিল। তখন সে দাদার সঙ্গে বেরিয়ে গেছে সোনারপুর যাবে বলে। তারা সোনারপুর থেকে ফিরেছে দুপুরে। বিকেলে রবীন আবার এসেছে। কিন্তু সে বেরুতে পারে নি। কথা দিয়েছিল সে যাবে তাদের বাড়ি। যাওয়া হয়ে ওঠে নি। সুমিতার সঙ্গে দেখা হয়েছে আর একবার। সে-ই গিয়েছিল। সুমিতা তখন ব্যস্ত। একটি মেয়েকে গিটার শেখায় বাড়িতে। সে অবস্থায় একটুক্ষণ থেকে

বেরিয়ে এসেছে। বলে এসেছিল আর একদিন যাবে। এখনও যাওয়া হয় নি। শংকরদের বাড়ি তো আজ নয় কাল করে যাওয়া হচ্ছেই না। সব মিলিয়ে কলকাতা এসে এখন কেবল হল না হল না মন নিয়ে সে প্রায় দিশাহারা। তখনই এসেছে অমরের চিঠি। চিঠিটা পড়ে সে ঠিক বুঝতে পারছে না, কেবল তার বেলাতেই এমন একটা জড়ানো অবস্থা দেখা দিল কেন?
অমর লিখেছে, 'পারলে তুই দু'-একদিন আগেই চলে আয়। দীপেনবাবু ছুটি নেবে। তার মেয়ে সোনালী কাউকে না জানিয়ে করিমগঞ্জে একটি ছেলেকে বিয়ে করে কোথায় চলে গেছে। খবরটা জানার পরে দীপেনবাবুর অবস্থাটা কল্পনা করতে পারবি। এসে তো দেখবিই সব। দীপেনবাবু আমাকে অনুরোধ করেছে তোকে লিখতে, দেরী না হয়, তাড়াতাড়ি আসবি। আপাতত এ খবরটা নিশ্চয় তোকে ভাবাবে। অবশ্য দীপেনবাবুর কথাই তোর ভাবনার ব্যাপার হবে আমি জানি।
সময় মত চিঠি পাবি, কি পাবি না, তাই এক্সপ্রেস করলাম। আর একটা খবরও আছে। অর্জুন সর্দার হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে মারা গেছে কয়েক দিন হল। তুই ছুটিতে চলে যাবার পরে কয়েক দিনের মধ্যেই এসব ঘটনা ঘটে গেছে।
হেরম্ববাবুর মেয়ে হেনা এসেছিল দিন দুয়েকের জন্যে। আমাদের বাসায় এসে তোর খবর নিয়ে গেছে। মনে হয় তোর ওপরে ও খুব চটে আছে। তুই ওর চিঠির জবাব দিস নি। এতে ওর সেন্টিমেন্টে লেগেছে, সে কথা স্পষ্ট বলে গেছে মালাকে। মালা অবশ্য এ সম্পর্কে কিছু উচ্চবাচ্য করে নি। ওর চিঠির ব্যাপারটা জানলে কি বলতো কে জানে। কিন্তু তাতো বলা যায় না, বলার মতোও নয়।'
অর্জুন সর্দারের মৃত্যু! অর্জুন সর্দার তার মনে গেঁথে থাকবে আজীবন। মৃত্যু তাকে আরও জীবন্ত করে তুলছে বিকাশের মনে। তবু কষ্ট হয়। আর কোন দিন অর্জুন সর্দার তার পার্টিকোতে এসে বসবে না, কথা বলবে না এমন তো সে ভাবতে পারে না। সর্দারের স্বরটা যে স্পষ্ট, 'বাগানমে ক্যা নেহি হোতা বাবু! কুছ সোচেগা, কুছ নেহি সোচেগা।' ঠিক, সর্দারের মৃত্যুটাও যেন অস্পষ্ট, কিছু বুঝতে পারছে না।
সে যাচ্ছে দশ তারিখে। চৌদ্দ তারিখ জয়েনিং। ভেবেছিল, শিলচরটা দেখা হয় নি, দু' দিন কোনও হোটেলে থেকে শহরটা দেখে ফিরবে। অমরের চিঠির পরে তা আর ভাবা যায় না।
হেনা? হেনা তো ভুল বুঝবেই। সে ভুল কোনদিন বিকাশ শুধরাতে পারবে না। হেনা হয়তো তার বন্ধু-বান্ধবদের বলবে, কলকাতার

ছেলেরা বড় দেমাকী, বড় অভদ্র। ঠিক, এটা হেনা বলতে পারে। যদি বলে বা এরকম ভেবে থাকে, বিকাশের মনে হচ্ছে, সে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ হেনার সঙ্গেও বিচ্ছিন্নতা। বোধ হয় দরকার। সবে মিলে বিকাশের মনে হয়, এমন সব বিপরীতমুখীনতায় সে তার ভারসাম্য রাখবে কি করে ?

রমার বিয়েটা প্রায় পাকা হয়ে গেছে। সোনারপুর থেকে ফিরে এসে নিজেদের মধ্যে যা বোঝাপড়ার ছিল, তা হয়ে গেছে। অন্য সব ঠিক আছে। কিন্তু দশ হাজার টাকা নগদ দিতে হবে। পনেরো হাজার দাবী ছিল। দশ হাজারে নেমেছে। বাবা প্রথমে রাজি হয় নি। শেষে হয়তো মনের যন্ত্রণাটা চেপে গিয়েই মত দিয়েছে। বিকাশ কথা দিয়েছে সে যত তাড়াতাড়ি পারে পাঁচ হাজার টাকা পাঠাবে। সে অবশ্য জানে, চাঁদখিরার রামব্রীজ মহাজনের কাছ থেকে মোটা সুদে ছাড়া তার পক্ষে অতো টাকা জোগাড় করা অসম্ভব। সেসব এখানে কাউকে বলা যাবে না। মা বলেছে, রমার বিয়েতে তাকে আসতেই হবে। মাস ছয়েক বাদে হলে হয়তো আসতে পারবে ভেবেছিল। কিন্তু অমরের চিঠি পেয়ে এখন সে কথা ভাবতেই পারছে না। সেখানে গিয়ে কি অবস্থায় পড়তে হবে সে জানে না। একমাস ছুটি পেয়েছে দীপেনবাবুর সম্মতিতে। কিন্তু এখনও দীপেনবাবু তাকে তেমন সুযোগ করে দেবে ভাবা যায় না। তাই মাকে বলেছে বিকাশ, এক বছরের মধ্যে আর তো ছুটি পাওয়া যাবে না মা। ধরে নাও, আমি আসতে পারব না। তোমরা রমার বিয়েটা যত তাড়াতাড়ি পারো সেরে ফেলবে।
এসব কথাও যে দ্ব্যর্থক হতে পারে, তার মাথায় আসে নি। বুঝলে, বৌদি যখন এক ফাঁকে ফিক্‌ করে হেসে বললে, রমার পরে লাইনে কে ? তুমি, না উমা !
বিকাশ হতবাক। তবু জবাব দিয়েছে, তোমাদের লাইনটা বড্ড সোজা। বেঁকে যে যাবে না ভাবলে কি করে ?
ও হরি ! আমরা ভাবছিলাম—
তোমাদের ভাবনার কি শেষ আছে ? কত কিছুই তো ভাবছো !—বলে, ওসবে ওখানেই ইতি টেনেছে বিকাশ। কিন্তু মনের স্থির ভাবটার নাগাল পাচ্ছে না কিছুতেই। গল্প শুনেছে, আজকালকার চাকুরে ছেলে দশ-বিশ হাজার নগদে ছাড়া বিয়ে করে না। ছেলের মা-বাবা না হয় প্রচলনের দাস, কিন্তু ছেলেগুলো কি ? ছিঃ! তবু দায় বুঝে সব মেনে নিতে হচ্ছে। সে এক অভাবিত অসহায় অবস্থা। বাবার

মুখের দিকে এখন তাকাতে কষ্ট হয়। বাবার এখন একমাত্র চিন্তা টাকার। রমার বিয়ে দিতে কম করে হলেও চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকার জোগাড় চাই। বিকাশ ততো ভেবেচিন্তে কিছু করে নি। এখন খুব খারাপ লাগছে। কবিতার বই এখন না ছাপলে এক হাজার টাকা বাবার হাতে দিতে পারতো। সে আর এখন সম্ভব নয়। কিন্তু লজ্জাও লাগছে। সবাই ভাববে কি? টাকার এমন সমস্যার মাঝে সে কবিতার বইয়ের সখে মেতে আছে!

বিয়েতে দিতে হবে সব কিছু! খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, গয়না-গাঁটি, থালা-বাসন, কাপড়-চোপড়—সব!—বাবা মাঝে মাঝে চটে যাচ্ছে। বলছে, কথা তো কেউ শুনল না। অন্ততঃ মাধ্যমিকটাও যদি পাশ করতি—দাবী-দাওয়ার বহর এমন হতো না।

বাবার এ যুক্তি ঠিক কিনা বিকাশ জানে না। কিন্তু রমা আর উমা দুজনেই যে ক্লাশ নাইনে উঠে পড়াশোনা ছেড়ে দিলে কেন তা বোঝে না। মা বলে, 'কী করবে? পড়াশোনায় মাথা নেই তো পন্ডশ্রম।' দাদা বলে, 'সেই তো হাঁড়ি ঠেলা। আমাদের ঘরের মেয়েদের আবার লেখাপড়া!' বৌদি বলে, 'তোমরা হাল ছেড়ে বসে আছো। কেন, মেয়েরা ফেলনা হলো? আমার বাবা আমাকে লেখাপড়া শেখায় নি! আমাদের অবস্থা তো তোমাদের তুলনায় ঢের খারাপ। আজকাল কি ছেলে, কি মেয়ে—লেখাপড়া না জানলে চলে?' বৌদির যুক্তিটা তবু মানা যায়। কিন্তু লেখাপড়া ব্যাপারটা যে নেহাৎ একটা কার্যসিদ্ধিরই পথ নয় সে কথাটা এরা বোঝে না কেন? রমা-উমা ফেল না পাশ, তার চেয়ে বড়ো কথা ওদের জ্ঞানগাম্য বুদ্ধিবৃত্তি কতদূর তার নিরিখ নেওয়া। তা নয়, ব্যক্তিসত্তাটা কিছু নয়, অস্তিত্বটা ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। প্রয়োজন আর প্রচলন, ব্যস, তার জন্যে যা দরকার তা না হলেই অযোগ্য। ভাবতে ভয় হয়। কিন্তু এ ভয়ংকর অবস্থাটা বড় সত্য। সে সত্যের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বিকাশ যেন সব কিছু হারিয়ে ফেলছে।

সে যে কী করতে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। আজ সাত তারিখ। আর মাত্র দু'দিন। দশ তারিখ সকালে যাত্রা। তার নিজের দরকারের কিছু আজ পর্যন্ত কেনা হয় নি। এখন আর কেনা যাবেও না। মির্জার বই থেকে শুরু করে অন্যান্য যারা যা ফরমাস করেছিল সেগুলো সব হয়ে গেছে। সেটাই রক্ষে। নয়তো না নিয়ে যেতে পারলে লজ্জার একশেষ। লজ্জাটা তো এখানেও। যাদের সঙ্গে দেখা হল তাদের সঙ্গে সে ভাবে কথা হল না। আর যাদের সঙ্গে দেখা হল না, তারা যখন জানবে সে এসেছিল, ভাববে, এখন দিনের সীমা পেয়েছে তাই দেখা করার দরকারও

শেষ !
ভাবতে ভাবতে ঝট্ করে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লে বিকাশ। দেখা না হোক্, শংকর জানবে না যে সে এসেছিল, তা হয় না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে সকাল আটটা। তাই সই। গিয়ে পাক বা না পাক, বাড়িতে তো বলে আসতে পারবে আমি এসেছিলাম।
নয় নম্বর সাট্ল বাসে চেপে মিনিট পনেরোর পথ। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা বাস এল। ভিড় নেই ততো। বসার জায়গা পেলে বিকাশ। যেতে যেতে যতটা দেখা যায় দেখছিল। আগের চেয়ে পথের দু'পাশে ঘরবাড়ি উঠেছে অনেক। উল্টাডাঙ্গার মোড়টায় একটা কিছু হয়ে ওঠার ইশারা। দোকান-টোকান হয়েছে কিছু। তার মানে এদিকে মানুষজন বেড়েছে। এটা দ্বিতীয় বার শংকরদের বাড়ি যাওয়া। সল্টলেকে যাওয়াও এই দ্বিতীয় বার। সেবার প্রথম সেই ঝড়জলে, সেই তনিমার সঙ্গে দেখা। তনিমা এখন আমেরিকায় কোথাও মিসেস তনিমা হাওয়ার্ড বা সিম্পসন বা অন্য কিছু নিশ্চয় কিন্তু সেদিনের পরিচয়টা বা তার পরের ঘটনা কী উজ্জ্বল ! স্পষ্ট মনে পড়ছে। সুমিতা যা-ই লিখে থাক তাকে সে সব ছাপিয়ে তনিমা বলে একটি বেপরোয়া আর আন্তরিক মেয়ে তার স্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরদিন। এরকমই হয় হয়তো। একেক সময় একেকটা মানুষের আশ্চর্য ছোঁয়া লেগে থাকে মনে। কোন কিছু দিয়েই তা ঘষে তোলা যায় না। তাই তনিমার কথা মনে এলেও সুমিতার কাছে জানতে চায় নি কিছু। শংকরকেও সে জিজ্ঞেস করবে না তনিমার কথা।
সল্টলেকে ঢুকে বাসটা যেন উড়ে যেতে চাইছে এমন স্পীড। পথের দু'দিকে ঘরবাড়িগুলো কী সুন্দর ! কিন্তু লোকজন তেমন নজরে আসছে না। এখনও বেশ ফাঁকা ফাঁকাই। আবার খানে খানে বেশ কিছু কিছু বাড়ি যেন দেখ দেখ করে উঠে গেছে। বাস থেকে নেমে বিকাশ বুঝতে পারলে না শংকরদের বাড়িটা ঠিক কোথায়। আগে বেশ ফাঁকা ছিল। এখন এত ঘরবাড়ি উঠে গেছে, নতুন নতুন বাড়ির কাজ চলছে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখে নিতে হল। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে নম্বরটা পেয়ে গেল। ঠিকানাটা লিখে নিয়ে এসেছিল। কাছে এসেও নম্বর ছাড়া আর কিছু যেন মেলাতেই পারছে না। এক বছরে বাড়িটা যেন অন্যরকম হয়ে গেছে।
বার বার কলিং বেল টিপেও অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হল। ভেতরে বেল বাজছে। কেউ সাড়া দিচ্ছে না। খুব দমে যায় বিকাশ। কেউ নেই নাকি ? নাঃ, একটা শব্দ উঠছে। দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে শংকরের মা।

জিজ্ঞেস করছে, কাকে চাই ?
শংকরের মাকে বিকাশ চিনলেও বিকাশকে শংকরের মা নাও চিনতে পারে। তাই ভেবে বললে, আমি শংকরের বন্ধু বিকাশ। শংকর বাড়ি নেই ?
না। ওতো কিছু আগে বেরিয়ে গেল।
কখন ফিরবে ?
তার কি ঠিক আছে ? রাতের আগে তো নয়। কিছু বলতে হবে ?
বলবেন, আমি দশ তারিখে চলে যাচ্ছি।
তুমি থাকো কোথায় ?
আসাম।
আসাম ! সেখানে চাক্‌রি ?
হ্যাঁ।
বসবে না ?
না। চলি।
বিকাশ চলে এল। দেখা হল না। কি করা যাবে ! কিন্তু শংকরের মা নাম বলাতেও তাকে চিনল না, এটা অদ্ভুত। অবশ্য জানে বিকাশ, ওরা এই স্বভাবের। শংকরের বন্ধু, তাই বলে গোষ্ঠীশুদ্ধ সবাই চিনবে নাকি ? কিন্তু তাদের বাড়ি, সুমিতাদের বাড়ি বা রবীনদের বাড়ি—অন্যরকম। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন তাদের কারো সঙ্গে কারো অপরিচয় নেই। প্রায় নাড়িনক্ষত্র জানে তারা তাদের পরিচিতদের।
বাস স্টপে এসে দাঁড়িয়ে সে বুঝলে এখন অফিস টাইম। বাসে যদি বা উঠতে পারে কিন্তু জাগয়া মতো নামতেই পারবে না। কী খেয়াল হল, হাঁটা ধরলে। ভালই লাগে। বাড়ি-ঘর লোকজন সব কী রকম আলাদা আলাদা মনে হয়। কিন্তু এখানে এখন যারা আছে তারা তো অনেকেই খাস কলকাতার লোক। তবু মনে হয় এদের সঙ্গে যেন কলকাতার কোনও সম্পর্ক নেই। নাকি, কলকাতার বিবর্তিত রূপটাই সল্টলেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ? ভাবতে ভাবতে পরখ করতে করতে হাঁটে বিকাশ।

বাড়ি ফিরে এসে মনে হল সুমিতাদের বাড়ি গেলে পারতো। একবার তো যেতেই হবে। কিন্তু কখন ? সুমিতা এত ব্যস্ত থাকে যে যেতে একটা সংকোচ পেয়ে বসে। সুমিতাদের বাড়ি যেতে হলে আগে কিছু মনেই হত না। যখন তখন গিয়ে হাজির হত। এখন সব অন্য রকম,

যেমন তার তেমনি সুমিতার। সুধাও বলেছিল, 'চা উপহার দিয়ে গেলেন। যাবার আগে আসবেন তো একবার? আপনার চা-ই একটু মনের মত করে দেব। আজ যা তাড়াহুড়া আপনার।' রবীনও বলেছে, 'ঠিক আসবি তো?' বিকাশ বলেছে, 'আসার ইচ্ছা তো আছেই। সময় পাবো কিনা বুঝতে পারছি না।' সময় আর কই? সেই হল না হল না আক্ষেপ থেকে সে বুঝি আর মুক্ত হতে পারছে না।

সুমিতাদেরও চা দিয়েছে বিকাশ। সবাই কী খুশি! সুমিতা বলেছে, তুই কবে আসবি বল? সেদিন আমি তোকে এই চা করে দেব। তার আগে আমরা কেউ ছোঁব না এই চা। মনে থাকবে তো?

এসবের জন্যেই মনটা আরো নরম হয়ে যায়। না যেতে পারলে কি মনে করবে সে কথা নয়, আবার করে আসবে, কবে দেখা হবে, তখন কে কি অবস্থায় থাকবে কে জানে! তার নিজেরও তো কত পরিবর্তন হবে। এক বছর আগে-পরে সব কেমন হয়ে গেছে। সময় যত যাবে সময়ের দাগে ঢাকা পড়বে সব—যেমন তার, তেমনি সকলের। তার চেয়ে যতটা পারা যায়, গ্রহণ করে যাওয়াই তো ভাল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর বৌদি বললে, এতদিন থাকলে, আমাদের একটা সিনেমা দেখালে না, কিছু একটা দিতেও মন গেল না। তুমি ঠিক পর হয়ে গেলে ঠাকুরপো?

উমা বৌদিকে সমর্থন করে বললে, ঠিক বৌদি। মেজদা, তুই সত্যি কী হয়ে গেছিস।

বিকাশ অবশ্য ভেবেই রেখেছে, যাবার আগে বৌদির হাতে কিছু টাকা দিয়ে বলবে, তুমি, রমা-উমা আর উজ্জ্বল-মণি যা খুশি করবে। কত দেবে তাও হিসেব করে রেখেছে। সে সব কিছু বলবে না এখন। তাই একটু হেসে বললে, আমি আবার ওসব কি করবো। সিনেমা দেখ না তোমরা?

বৌদি বললে, তুমি কিন্তু ঠিক পালটে গেছ। আগের মতো নেই।

হবে। তাই তো স্বাভাবিক।—বলে, বৌদিকে চুপ করিয়েছে কিন্তু সে মনে মনে চুপ থাকতে পারে নি। ভেবেছে, অনেক ভেবেছে। সে ভাবনা নিয়েই বিকেলে সুমিতাদের বাড়ি গিয়ে সুমিতাকে জিজ্ঞেস করেছে, তুই ঠিক করে বল তো, তোর কি মনে হয় আমি পালটে গেছি?

সুমিতা হাসে। বলে, কি জানি! মাত্র তো আজ নিয়ে তিন দিন পলকের জন্যে তোকে দেখা। তোর জামা-কাপড় ছাড়া আর তো কিছু নজরে এল না। আগে পায়জামা পরতে দেখি নি, শীতে চাদর কখনও গায়ে তুলেছিস মনে পড়ছে না। কে বললে তুই পালটেছিস?

আমার মনে হচ্ছে।
ওঃ! তা মনে হওয়ার ব্যাপারে তো আর কারো হাত নেই।
আজ তোর সময় আছে তো?
কেন?
না, তুই তো ব্যস্ত থাকিস। সময় না থাকলে—
ঠিক! পালটেছিস। আগে তো অতো ভাবনা-চিন্তা ছিল না তোর। বলে হেসে উঠল সুমিতা।
বিকাশও হাসে। বলে, হেসে যা। তোদের হাসির খোরাক হয়েই থাকলাম!
তোর কপাল। যাক গে, দশ তারিখ কখন তোর প্লেন?
সকাল সাড়ে ছটায়।
এলি, কিন্তু মন খুলে কথা বলা হল না।
চিঠিতে বলবি।
চিঠিতে সব বলা যায়? আমি পারি না।

নয় জানুয়ারি বিকেল চারটে থেকে হালচাল পত্রিকার অফিসে বসে আছে বিকাশ। ভবেন্দুর পাত্তা নেই। যারা অফিসে আছে বললে, এগারোটার সময় বেরিয়েছে। সে এলে যেন অপেক্ষা করে। তাই বসেই আছে। কিছুক্ষণ পর পর ঘড়ি দেখছে। ভবেন্দুর দেখা নেই। কথা ছিল তার কবিতার বই পাবেই নয় তারিখে। টাকাও নিয়ে এসেছে। কিন্তু এখানে কেউ কিছু বলতেই পারছে না। পাঁচটা হল, ছয়টাও গড়াল। সাতটার সময় উঠে দাঁড়াল বিকাশ। ভয়ানক দমে যায় সে। ভবেন্দু এমন করবে এটা ভাবাই যায় না। সে বেরিয়ে এল ট্যামার লেন থেকে। কি করবে একবার ভেবে নিলে। ফিরে গিয়ে কড়া করে চিঠি দেবে। এখন তার ভাবনা হচ্ছে, হয়তো টাকা আর কবিতার স্ক্রিপ্ট দুটোই গেল। পাঁচশো টাকা! বেশ গায়ে লাগার মতো। রাগ নয়, ক্ষোভ নয় —কেমন একটা বেদনায় সে হিম হয়ে যাচ্ছে। কবিতার বই ছাপার জন্যে ছুটির প্রায় পুরো সময় সে ব্যয় করেছে। রোজ এসেছে হালচাল অফিসে। দু' ঘণ্টা তিন ঘণ্টা ধরে প্রুফ দেখেছে। তখন কি তার মনের খুশি! কবিতার বই, প্রথম কবিতার বই। কবি বিকাশ আচার্যের প্রথম সাক্ষর। তার পরিণাম—ভেবে অস্থির হয়ে পড়ে।
বাড়ি ফিরলে সাড়ে আটটায়। ঘরে ঢুকতেই দাদা বললে, কাল সকালে চলে যাবি, আজও ফিরলি রাত করে। তোর বন্ধু শংকর এসে ফিরে

গেল।
তাই ? কখন এসেছিল ?—বিকাশের খুব খারাপ লাগে।
দাদা বলে, এই তো, সাতটা-সাড়ে সাতটা হবে।
এবার ভবেন্দুর উপরে বেশ রাগ হয় বিকাশের। শালা, তুমি এমন করবে এ তো স্বপ্নেও ভাবি নি। তোমার জন্যে শংকরের সঙ্গে দেখা হল না। সে কি কম ক্ষতি! মনে মনে খুব গাল পাড়ে বিকাশ ভবেন্দুকে।
দাদা বলে, যা, হাত-মুখ ধুয়ে তোর সব গুছিয়ে নে।
বেশ হতাশ সুরে বলে বিকাশ, গোছানোর আর কি আছে!
বৌদি এগিয়ে এসে বললে, তোমার যা যা সব এক জায়গায় করে রেখেছি। নতুন সুটকেসটা নেবে তো ?
নতুন ভি. আই. পি. সুটকেস দাদার। বেশ ভাল। পুজোর সময় কিনেছে।
অমরের সুটকেস দাদার পছন্দ নয়। তাই বলেছিল, আমার নতুন সুটকেসটা তুই নিবি। তোরটা আমি রাখবো। বিদেশে অমন সুটকেস দেখে হাসে না লোকে!
বিকাশের অবশ্য মজা লাগছিল। দাদাকে কিছু বলে নি। কিন্তু বৌদিকে বলেছে, ভি. আই. পি. সুটকেস দেখে চা-বাগানে সবাই কাঁদবে যে!
তবু দাদার ইচ্ছেতে বাধা দিতে তার মন সরে নি। দাদার সুটকেস বৌদি খালি করে রেখেছে।
তার সুটকেস থেকে দাদার নতুন সুটকেসে সব ভরে নিয়ে বৌদিকে ডেকে বললে, এই নাও তোমাদের সিনেমা দেখার খরচা।
বিকাশের হাতে দুটো একশো টাকার নোট। দেখে হেসে বলে মিনা, অতো! না, আমি নেব না। তখন দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ। রমা এসে বললে, মেজদা, তোকে কে ডাকছে।
কে ? —বলে দরজায় এসে দেখলে অচেনা কে একটি ছেলে।
বিকাশকে দেখে ছেলেটি বললে, আপনি বিকাশবাবু ? ভবেন্দুবাবু এই চিঠি আর প্যাকেট দিয়েছেন।
প্যাকেট আর চিঠি হাতে নিয়ে বিকাশ তাকালে ছেলেটির দিকে। বললে, কিছু বলেছে ?
না, চিঠিতে লিখেছে সব। দেখুন। —ছেলেটি দাঁড়িয়ে থাকল। ভবেন্দু লিখেছে, 'বিকাশ, তোর বইয়ের জন্যে আজ সারাদিন প্রেসে বসেছিলাম। কোনরকমে বিকেল নাগাদ সব ছেপে মাত্র দশখানা বই তোকে পাঠাতে পারছি। সঙ্গে এক বছরের এক সেট হালচালও আছে।

দেখবি, কাল তো চলে যাচ্ছিস। পরে তোকে ডাকে বই পাঠাব। বাকি শ' চারেক টাকা তুই গিয়ে পাঠাবি। এখন দিতে হবে না। বই কেমন লাগল তোর লিখবি। লেখা পাঠাবি। —ভবেন্দু।' ছেলেটিকে বললে, ঠিক আছে। ভবেন্দুকে বলবেন, আমি চিঠিতে সব জানাবো।

আচ্ছা। —বলে ছেলেটি চলে গেল। প্যাকেটটা খুলবে কি খুলবে না তা ভেবে অস্থির বিকাশ। কবিতার বই ছেপে নিয়ে যাচ্ছে, এদিকে বোনের বিয়ের টাকা জোগাড়ের কথা ভেবে বাবা-দাদা আকুল। ভাববে কি সবাই ? সব কথা তো বোঝানোও যাবে না। থাক, এখন খুলবে না। প্যাকেট শুধুই সুটকেসে ভর্তি করে রাখলে। খুলবে গিয়ে কমলা ফুল টি এস্টেটে পৌঁছে।

বাবা জিজ্ঞেস করলে, কিসের প্যাকেট ?

বিকাশ বললে, বই।

বাবা আর কিছু বললে না।

দাদা বললে, এবার খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়বি। কাল তো সাড়ে চারটে নাগাদ রওনা হতে হবে। যাবি কি করে ?

কেন ? ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না ?

যাবে। ভাড়া বেশি চাইবে।

দিতে হবে। কি আর করা যাবে।

আমি যাবো নাকি তোর সঙ্গে এয়ারপোর্টে ?

কি দরকার ? এসে আবার হন্তদন্ত হয়ে অফিস যাবে। দরকার নেই। তোর তো খালি একটা সুটকেস। ঝামেলা নেই। ঠিক আছে। সকালে একটা ট্যাক্সিই ধরা যাবে।

ভোর চারটের সময় ডেকে তুলে দিলে দাদা। বাবা, মা, রমা, উমা, বৌদি, উজ্জ্বল-মণি সবাই জেগে গেছে। বৌদি চায়ের জল চাপিয়েছে। বিকাশ ঝট্ করে বাথরুম সেরে তৈরি হয়ে গেল। রমা চা এনে দিলে। কয়েক চুমুকে চা শেষ করে সকলের মুখের দিকে চেয়ে কেমন লাগে। এই মুহূর্তে এদের এই নীরব অভিব্যক্তি বিকাশের ভেতরে মোচড় দেয়।

মা বললে, সাবধানে থাকবি।

বাবা বললে, চিঠিপত্র দিবি।

আর কারো মুখে কথা নেই। মা-বাবাকে প্রণাম করে সুটকেসটা হাতে তুলে দরজার বাইরে এল বিকাশ। সঙ্গে দাদা। বিকাশ আর পেছনে তাকালে না। এখন তার পেছনে তাকাতে ভয় করছে। কার মুখে কি দেখবে কে জানে। না তাকানোই ভালো।

ঠিক ছটায় এসে পৌঁছল দমদম এয়ারপোর্টে। ট্যাক্সি পেয়ে গেছিল। ভাড়াও বেশি দিতে হয় নি। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে সুটকেসটা হাতে করে পোর্টের লন পেরিয়ে এগোচ্ছে, একটা ডাক, বিকাশ!
সামনে সুমিতা। বিকাশ অবাক! এই সাতসকালে এখানে সুমিতা?
সুমিতা খুব কাছে এসে বললে, তোকে ফেয়ারওয়েল দিতে এলাম।
বিকাশের ঘোর কাটে নি। তবু বললে, এত সকালে কষ্ট করতে গেলি কেন?
সুমিতা হাসে। বলে, ইচ্ছে হল।
বিকাশের চট করে মনে হল, তার প্রথম কবিতার বই এখন পর্যন্ত তার দেখা হয় নি, কাউকে দেওয়া হয় নি। এই সুযোগ। বিকাশ হাঁটু উঁচু করে তার ওপরে সুটকেসটা পেতে ডালা খুলে বইয়ের প্যাকেটটা বার করলে। প্যাকেট ছিঁড়ে একটা বই তুলে সুমিতাকে দিয়ে বললে, আমার প্রথম কবিতার বই। তোকেই প্রথম দিলাম।
বইটা হাতে নিয়ে বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে সুমিতার কী হয়ে গেল। দু'চোখ ঝাপসা, বাঁধ মানে না। কয়েক ফোঁটা জল দু'গাল বেয়ে পড়তে দেখলে বিকাশ।
অভাবিত এ ঘটনা। বিকাশ তার মায়ের চোখের জল দেখেছে, বোনের চোখের জল দেখেছে, বৌদির চোখের জল দেখেছে। কিন্তু তা এরকম নয়। সুমিতার চোখের জল যেন বড় বেশি গাঢ়। কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখে বিকাশ বললে, তুই কাঁদছিস সুমি। কেন?
সুমিতা চট করে হাতের রুমাল দিয়ে চোখমুখ মুছে ফেলে হাসলে। বললে, হ্যাঁ, কান্না এসে গেল। কিন্তু আমি কাঁদতে চাই নি। তোর কবিতার বই আমার হাতে। আমি যে কবিতা কিছু বুঝি না রে। তুই জানিস। তবু দিলি। আমার তো হাসাই উচিত ছিল।
বিকাশ কিছু বলতে পারে না। মনে হল সে যেন এভাবে অনন্ত কাল দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। ছ'টা পনেরো হয়ে গেছে। বিকাশ সুমিতাকে বললে, ভেতরে যাবি?
সুমিতা বললে, না।
সুটকেস হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে এয়ার পোর্টের ভেতরে চলে গেল বিকাশ। তার মনে তখন সমুদ্রের ঢেউ। কোথায় কলকাতা, কোথায় কমলাফুল টি এস্টেট—সব একাকার। সুমিতার চোখের জলে যেন সব ভেজা, ঝাপসা, অনির্দেশ্য হয়ে গেছে।